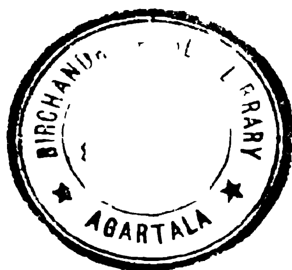

শ্রমিক-
বিজ্ঞান
ঞ্চানন
ঘোষাল



ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ বিধান সরণী • কলিকাতা-৬

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়—১৩৩৭

ভূমিকা

বর্ত্তমান শিল্পভিত্তিক যুগে শ্রমিক ও মালিকদের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে পাশ্চাত্যদেশে নানা আলোচনা এবং গবেষণা চলেছে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় শ্রমিকবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশেও শিল্পের যথেষ্ট সম্প্রসারণ হয়েছে। আমরাও শিল্পভিত্তিকযুগে এসে পৌঁচেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত কোন লেখকই এ বিষয়ে বাংলায় কোন বই লেখেন্নি। শ্রমিকবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মৌলিক গ্রন্থখানা লিখে ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল সমস্ত বাঙালী-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ডাঃ ঘোষালের বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। আট নয় বছর আগে আমি যখন বাংলা সরকারের দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিবপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম তখন ডাঃ ঘোষাল ছিলেন আমার প্রধান সহকর্ম্মী। সেই সময়ই তিনি অপরাধবিজ্ঞান নিয়ে মৌলিক গবেষণা স্থরু করেন এবং পবে গ্রন্থাকারে তা' প্রকাশিত হয়েছে। শ্রমিক মালিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা এব পরবর্ত্তী ধুগের। এই গ্রন্থে শ্রমিকবিজ্ঞানের গোড়া কথাগুলি ডাঃ ঘোষাল প্রাঞ্জল ভাষায় বলেছেন। তা' ছাড়া কয়েকটি শিল্পসংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে তিনি যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন এই বইএর নানা জায়গায় তা'ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুধীসমাজে এই বই-খানা উপযুক্ত সমাদর লাভ করবে।

কলিকাতা,

(ডাঃ) **নবগোপাল দাস**

আই. সি. এস্., প্রাক্তন সেক্রেটারি, ইন্‌ডাসট্রিজ.]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

প্রণীত

অপরাধ-বিজ্ঞান

১ম—৮ম খণ্ড।

১ম, ৫ম—৬৲ হিঃ, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ—৫৲ হিঃ,

অন্যান্য প্রতি খণ্ড—৪৲ হিঃ

হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান	৫৲
একটি অদ্ভুত মামলা	৫৲
অধস্তন পৃথিবী	৫৲
অন্ধকারের দেশে	৫৲
দুই পক্ষ	২·৫০
মুণ্ডহীন দেহ	৩·২৫
একটি নারী-হত্যা	৩৲
একটি নির্মম হত্যা	২·৫০
মেছুয়া মার্ডার	(যন্ত্রস্থ)

বিখ্যাত বিচার ও

তদন্ত-কাহিনী

১ম ও ২য়—৩৲ হিঃ, ৩য়—৩-৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, বিধান সরণী,

কলিকাতা ৬

শ্রমিক-বিজ্ঞান

১

শ্রমিক-বিজ্ঞান এক আধুনিকতম বিজ্ঞান। ইহা অপরাধ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, দেহ-বিজ্ঞান ও প্রশাসন-বিদ্যার সহযোগে সৃষ্ট হয়েছে। পূর্বে অপরাধ-বিজ্ঞানের মত ইহা মনোবিজ্ঞানের এক বিভাগ রূপে বিবেচিত হতো। এক্ষণে ইহা এক পৃথক বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পরিণত। বর্তমান-কালীন শিল্প-ভিত্তিক যুগে ইহার উপকারিতা অসীম।

আদিকালে শিল্প-দ্রব্য নির্মাণ পারিবারিক গণ্ডি ও প্রচেষ্টার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ঐ সময় গৃহকর্তার কর্তৃত্বাধীনে ঐ পরিবারের সকল ব্যক্তি স্ব স্ব গৃহে সামগ্রী উৎপাদনে ব্যাপৃত থেকেছে। পরে এই সব শিল্পের ব্যাপৃতি ঘটলে উহাদের সাহায্যের জন্য বাহিরের লোকের প্রয়োজন হয়। উন্নত যন্ত্রের সৃষ্টির পর এই গৃহ-শিল্প আর পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। উহার জন্যে বহু কর্মীর নিয়োগের ফলে দ্রব্যোৎপাদনার্থে বৃহৎ স্থানের প্রয়োজন হয়। এইভাবে কুটির-শিল্প হতে উদ্যোগ-শিল্প বা ইনডাস্ট্রির সৃষ্টি হয়।

এই বহিরাগত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রীতদাসদের সাথে সাথে বেতনভুক্ কর্মীরাও ছিল। তৎকালীন মালিকদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল প্রভু ও ভৃত্যের। ঐ সকল প্রভুরা মনে করতো যে অর্থের বিনিময়ে তারা ভৃত্যের মন ও দেহের অধিকারী। সুতরাং প্রভুব কোনও ন্যায় বা অন্যায় কাজে তারা প্রশ্ন করতে পারে না। কিন্তু বর্তমান যুগে এই ধারণা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। পূর্বেকার এই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক বর্তমানে মালিকের ও শ্রমিকের সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এই নূতন সম্পর্কের সঙ্গে ক্রেতা

ও বিক্রেতার তুলনা করা চলে। এখানে শ্রমিকরা তাদের দৈহিক শ্রম ও অভিজ্ঞতা পূর্ব শর্ত [terms] অনুযায়ী মালিকদের বিক্রয় করে। ইংরাজিতে ইহাকে এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়ীদের সম্পর্ক বলা যেতে পারে। ইহাতে লেন-দেনের সম্পর্ক থাকায় শ্রমিকদের মনে বশ্যতাব গ্লানি স্থান পায় নি। [আজকাল শ্রমদানের বিষয় ও শুনা যায়।]

প্রথমে এই শিল্পভিত্তিক সম্পর্ক মাত্র মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু উদ্যোগ-শিল্পের প্রসারের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিভর করে। উপরন্তু জনসাধারণ স্বল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সরবরাহ দাবী করে। এজন্যে জনতার প্রতিভূস্বরূপ রাষ্ট্রকে তৃতীয় পক্ষরূপে ইহাদের মধ্যে উপস্থিত হতে হয়েছে। অধুনাকালে শ্রম-শিল্পেব উন্নতিব জন্যে যন্ত্রবিদ পণ্ডিত ও শ্রম-বিজ্ঞানীরা চতুর্থ পক্ষ রূপে এদেব মধ্যে এসেছেন।

প্রতি দেশে দুই প্রকারের শ্রমশিল্প দেখা যায়, যথা, কুটির-শিল্প এবং উদ্যোগ-শিল্প। উভয়ের মধ্যবর্তী মাঝারি শিল্পেরও অস্তিত্ব আছে। কুটির-শিল্পসমূহে সাধারণত দশ হতে কুড়িটি শ্রমিক নিযুক্ত থাকে। মাঝারি শিল্পে সত্তর-আশি ব্যক্তি কর্মে নিরত থাকে। কিন্তু উদ্যোগ-শিল্পে শত শত শ্রমিক কর্মরত আছে। কুটির-শিল্পে মালিক বা ম্যানেজারের সঙ্গে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ ভাবে সংযোগ থাকে [মালিক বলতে এখানে ডিরেক্টারদেরও বুঝায়]। কিন্তু উদ্যোগ-শিল্পের শ্রমিক ও মালিক এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক বড়-মিস্ত্রি, ফোরম্যান, ওভারসিয়াব প্রভৃতি তদারকী কর্মীদের মাধ্যমে স্থাপিত হয়।

এই সকল মালিক, শ্রমিক ও বিভিন্ন পদের কর্মীদের স্বার্থ বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। এই সকল পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য সামঞ্জস্য আনা সুকঠিন কায। অথচ দেশ তথা রাষ্ট্রের সামগ্রিক মঙ্গলের

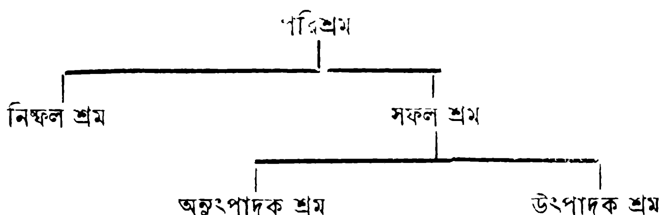
জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। একমাত্র শ্রমিক-বিজ্ঞান এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করে শিল্পের ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি আনতে পারে।

স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদন আধুনিক উদ্যোগ-শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। একমাত্র এইরূপে মালিকদের লভ্যাংশ স্ফীত করে বা উহা অব্যাহত রেখে জনসাধারণকে সুলভে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সরবরাহ করা যেতে পারে। এ' জন্য শিল্প-ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে 'সফল' পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে।

যে কোন শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি। বহু শিল্পপতি চাকুরি লোপের ভীতিপ্রদর্শন ও বোনাস এবং ওভারটাইমের প্রলোভন দ্বারা শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। বহু শ্রমিকও প্রমোশন, বোনাস ও বাড়তি ভাতার লোভে কিংবা চাকুরি যাবার ভয়ে অধিক পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস পায়। এই সকল মালিক এবং শ্রমিকদের ন্যায় শ্রম-বিজ্ঞানীরাও দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি কামনা করে। কিন্তু যে-ভাবে মালিক ও শ্রমিকরা উহা কামনা করে শ্রমিক-বিজ্ঞানীরা উহার বিরোধী। শ্রমিকদের দেহ ও মনের উপর অযথা চাপের সৃষ্টি না করে শ্রম-বিজ্ঞানীরা অন্য উপায়ে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন।

শ্রমিকদের কর্মকাল বহু শ্রমক্ষণের [work spell] সমষ্টি মাত্র। এই পরিশ্রমকে দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, সফল শ্রম ও নিষ্ফল শ্রম। অনুৎকৃষ্ট [স্পয়েলড্ ওআর্ক] বা অব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমকালকে বলা হয় নিষ্ফল শ্রম এবং যে শ্রম দ্বারা উৎকৃষ্ট ব্যবহার্য দ্রব্য নির্মিত হয় উহাকে বলা হয় সফল শ্রম। শ্রম-শিল্পে নিষ্ফল শ্রমের কোনও স্থান নেই। উহা বিদূরিত না করতে পারলেও উহা

কমানো প্রয়োজন। এই নিষ্ফল শ্রমকে ইংরাজিতে বলা হয় স্পয়েলড্ ওআর্ক। নিম্নমানের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনও নিষ্ফল শ্রমের সামিল। শ্রমিকদের কর্মকালের প্রতিটি শ্রমক্ষণ ফলপ্রসূ হওয়া চাই। এই সকল শ্রমকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। উহাদের যথাক্রমে বলা হয়ে থাকে, অনুৎপাদক শ্রম এবং উৎপাদক শ্রম।



দৈহিক শক্তি প্রয়োগে কিংবা মেসিন বা ক্ষুদ্রযন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ রূপে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমকে বলা হয় উৎপাদক শ্রম। কাঁচামালের যোগান দান এবং 'প্রত্যক্ষ রূপে দ্রব্যোৎপাদনের' পরিপূরক ব্যবস্থার জন্য যে অপ্রত্যক্ষ শ্রমকাল ব্যয়িত হয় উহাকে বলা হয় অনুৎপাদক শ্রম।

[রাজমিস্ত্রি কর্নিক দ্বারা দেয়াল গাঁথাতে যে পরিশ্রম করে উহাকে বলা যায় উৎপাদক শ্রম। যোগাড়েরা উহার জন্যে মালমশলা আনতে যে পরিশ্রম করে উহাকে বলা হয় অনুৎপাদক শ্রম। কাঁচামাল যারা আনে ও যোগান দেয় তারা অনুৎপাদক শ্রম করে। তাঁতীরা তাদের তাঁতে সুতো সরবরাহ করতে যে শ্রম ব্যয় করে উহাকে বলা হয় অনুৎপাদক শ্রম। ঐ তাঁতী তাঁতের সাহায্যে প্রত্যক্ষ রূপে কাপড় বুনতে যে শ্রম করে উহাকে বলা হয় উৎপাদক শ্রম।]

বৃহৎ উদ্যোগ-শিল্পে সাধারণত এক-এক দল শ্রমিক এক-এক প্রকার কাজ করে। এদের মধ্যে কেহ উৎপাদক শ্রম ও কেহ অনুৎপাদক শ্রমকার্য করে থাকে। উৎপাদক শ্রম অপেক্ষা অনুৎপাদক শ্রমে বেশি শ্রমক্ষণ ব্যয় হয়। অথচ এই অনুৎপাদক শ্রমক্ষণ কমিয়ে উৎপাদক শ্রমক্ষণ বাড়ানো সম্ভব। বস্ত্র-শিল্প প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পে অবশ্য একই ব্যক্তি অনুৎপাদক ও উৎপাদক শ্রমের কাজ করে থাকে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাঁতে সূত্র সমাবেশ করে, সেই ঐ তাঁত চালিয়ে বস্ত্র বুনে। এইখানে দুই জন শ্রমিকের দুই প্রকার শ্রম করার সুযোগ নেই। কিন্তু যারা ঐ শিল্পে বিবম্ ও রিল্ তৈরি করে তারা অনুৎপাদক শ্রম করে। তবে যান্ত্রিক উন্নতি ও অভ্যাস অর্জিত কর্মকুশলতায় এবং অন্যান্য উপায়ে এই শ্রমিক তাহার অনুৎপাদক শ্রমের হার কমিয়ে আনতে পারে।

অনুৎপাদক শ্রম ব্যতীত উৎপাদক শ্রম কল্পনা করা যায় না। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোনও শিল্পে এই উভয় প্রকার শ্রমের প্রয়োজন। এই অনুৎপাদক শ্রম কমাতে পারলে উৎপাদক শ্রম বেড়ে যায়। এর ফলে অধিক দ্রব্য সামগ্রী তৈরি হতে থাকে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো।

শ্রম-বিজ্ঞান দ্রুত গতিতে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য এই অনুৎপাদক শ্রমের হ্রাস এবং উৎপাদক শ্রমের বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ করেছে। শ্রম-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, যে পরিমাণে অনুৎপাদক শ্রম কমবে সেই অনুপাতে উৎপাদক শ্রম বেড়ে যাবে। এঁরা আরও প্রমাণ করেছেন যে নিস্ফল শ্রম বা স্পয়েলড্ ওআর্ক সম্পূর্ণ বিদূরিত করে সফল শ্রমের শ্রমক্ষণ বহু গুণে বাড়ানো সম্ভব।

শ্রমিকরা কর্মকালে দৈহিক, স্নায়বিক ও মানসিক কর্মক্লান্তি বা ফেটিগ্ দ্বারা আক্রান্ত হয়। স্বল্প সময়ে বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে এই ত্রিবিধ ফেটিগ অন্যতম প্রতিবন্ধক। এই ফেটিগ কমাতে বা

রুখতে পারলে শ্রমিকরা কম সময়ে স্বল্পায়াসে বহুল সংখ্যক দ্রব্য উৎ-পাদনে সক্ষম।

শ্রম-বিজ্ঞানীরা এই ত্রিবিধ ফেটিগ্ কমানোর বহুবিধ সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছেন। কর্মলিপ্সা বা ইনসেনটিভ্ ও কর্মতাল বা রিথিমের হানি না ঘটিয়ে শ্রম-বিরতি বা রেস্ট্ পজ্ দ্বারা এই ক্ষতিকর ফেটিগ্ কমানোর রীতি-নীতি এই বিজ্ঞান পাঠে জানা যায়। কর্মকালের মধ্যে কতটুকু নির্দিষ্ট কর্মকাল [নমিন্যাল] এবং কতটুকু প্রকৃত কর্ম-কাল [রিয়েল] থাকে তা আবিষ্কার করে শ্রম-বিজ্ঞানীরা উদ্যোগ-শিল্পের প্রভূত উপকার করেছেন। উপরন্তু গরহাজিরা দৈব দুর্ঘটনা ও ধর্মঘটাদির সংখ্যা কমানোর অব্যর্থ পন্থাসমূহ এই বিজ্ঞান পাঠে জানা যায়। শ্রমিক ভর্তির উৎকৃষ্ট পন্থাসমূহ আবিষ্কার করে শ্রম-বিজ্ঞানীরা শ্রমিক প্রবেশ ও শ্রমিক নিষ্ক্রমণের [লেবার টার্ন আউট] মধ্যে সামঞ্জস্য এনে মালিক ও শ্রমিকদের সমভাবে উপকার করেছেন। অধিকন্তু শ্রম-বিজ্ঞানীরা কর্মশালায় উত্তম কায়িক ও মানসিক পরিবেশ [এন্‌ভায়রন মেন্ট্] আনার উপায় নির্ধারিত করে মালিক ও শ্রমিকদের সমভাবে সাহায্য করেছেন। এতদ্ব্যতীত দ্রব্যাবস্থান, দ্রব্য-সমাবেশ, কর্মচাতুর্য, স্বয়ংক্রিয়তা, দৈহিক সমতা সম্পর্কীয় বহু জ্ঞান এই শ্রম-বিজ্ঞান পাঠে জানা যাবে। এতে কর্মশালায় বায়ু চলাচল, প্রয়োজনীয় তাপরক্ষা, আলোক-ব্যবস্থা আলোচিত হয়েছে।

শ্রম-বিজ্ঞান এখনও তার শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নি। এইখানে গবে-ষণার এখনও প্রচুর ক্ষেত্র আছে। এই গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আমি স্ববাটীতে একটি বিদ্যুৎ-চালিত কুটির-শিল্প স্থাপন করেছি। এইখানে শ্রমিকদের সহিত আমি প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখতে সক্ষম। উপরন্তু চিফ্ সিকিউরিটি অফিসার রূপে চার-পাঁচটি বৃহৎ উদ্যোগ-

শিল্পের সহিতও আমি সংযুক্ত। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় ফোরম্যানরা যে সকল শ্রমিক কম দ্রব্য উৎপাদন করে তাদেরকে প্রতি সপ্তাহে একবার আমার দপ্তরে পেশ করে। উহাদের পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি উহাদের সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় অবগত হই। তৎপর মেসিন চালানোর সময় সরজমিন উপস্থিত থেকে কম দ্রব্য উৎপাদনের কারণ বুঝতে চেষ্টা করি। তুলনা করার জন্যে এই সময় অধিক দ্রব্য উৎপাদনকারী শ্রমিকের পাশে এদের কাজ করতে দেওয়া হয়। আমি এই শ্রমিকদের দৈহিক শক্তিহীনতা, রোগ ও শোক, পারিবারিক ও অন্যান্য অশান্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। বলা বাহুল্য যে, এ'ভাবে মালিক ও শ্রমিক— উভয়েরই এই সম্পর্কে দোষগুণ সম্পর্কে আমি অবহিত হতে পেরেছি।

এই উপায়ে লব্ধ তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের সুবিধা থাকায় এইরূপ একটি শ্রম সম্পর্কীয় তথ্য বহুল গ্রন্থ রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আশা করি যে ইহা মালিক ও শ্রমিক, এই উভয় পক্ষেরই উপকারে আসবে।

প্রাণি-বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ছাত্ররূপে আমি বিরাট গ্রন্থ 'হিন্দু-প্রাণি-বিজ্ঞান', পুলিশ বিভাগের ডেপুটি কমিশনার রূপে আট খণ্ডের 'অপরাধ-বিজ্ঞান' এবং অবসর গ্রহণের পর মিল ফ্যাক্টরিতে সংযুক্ত থেকে 'শ্রমিক-বিজ্ঞান' রচনা করেছি। একজন শিক্ষিত ব্যক্তিরূপে প্রাপ্ত পরিবেশের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার না করা আমি অনুচিত মনে করি।

শ্রমকে আবও বহু ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, একক শ্রম এবং যৌথ শ্রম। এমন বহু শ্রম আছে যাহা যৌথ ভাবে করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভার উত্তোলন, দ্রব্য টেনে আনা প্রভৃতির বিষয় বলা যায়। এই একক শ্রম ও যৌথ শ্রমের কার্যকরণ ও তদারকী ব্যবস্থা ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। এই সম্পর্কে শ্রম-বিজ্ঞানীরা সঠিক ভাবে নির্দেশ দিতে

পেরেছেন। উপরন্তু দৈহিক পরিশ্রম এবং মেসিন-ভিত্তিক শ্রমের মধ্যেও প্রভেদ আছে। এখানেও শ্রম-বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট পক্ষকে যথাযথ ভাবে উপদেশ দেন। এই শ্রমকে যেমন আড়াআড়ি ভাবে ভাগ করা যায়, তেমনি উহাকে লম্বালম্বি ভাবেও ভাগ করা যায়। এই শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা উহাদের দোষ-গুণের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করে শ্রম-বিজ্ঞানীরা সঠিক ভাবে উহাদের প্রতিষেধক ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন।

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই শ্রমিক পদবাচ্য ব্যক্তিরা কারা? অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তিদের শ্রমিক বলা যেতে পারে। অনেকের এমন ধারণা যে, যারা মাত্র দৈহিক শ্রম করে তারাই শ্রমিক। এদেশের এক শ্রেণীর সরল লোকেদের সহজে ক্ষ্যাপানো যায় ব'লে ধরে নেওয়া হয় যে মাত্র তারাই শ্রমিক। কেহ কেহ এদের শ্রমলব্ধ আয় কম ব'লে এদের শ্রমিক বলেন। আজকাল এক শ্রেণীর শ্রমিক বহু শিক্ষিত করণিকের অপেক্ষা বেশি আয় করে থাকে। এজন্যে সর্বহারা সংজ্ঞা কেবল মাত্র এদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না। যারা ফ্যাকটরিতে হাতুড়ি পেটে এবং যারা অফিসে কলম পেশে—উহারা সমভাবে শ্রমিক পদবাচ্য। করণিকরা মানসিক এবং দেহশ্রমীরা দৈহিক ফেটিগ দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। যেহেতু মানুষের দেহের সঙ্গে উহার মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, সেই হেতু আখেরে অধিক পরিশ্রম সমভাবে উহাদের দেহ ও মনকে কর্মক্লান্ত করে। অতএব এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের সমভাবে শ্রমিক বলা উচিত হবে।

আমার মতে দৈহিক শ্রম ও বিদ্যাবুদ্ধি বেতন বা অর্থের বিনিময়ে যারা বিক্রয় করে তারা শ্রমিক। কিন্তু তা বলে ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে মালিক পক্ষ শ্রম-বিমুখ হয়ে পরগাছা জীবন যাপন করে। প্রতিটি শিল্পের মালিকদেরও যথেষ্ট মেধা ও শ্রম ব্যয় করতে হয়। অন্যথায়

ব্যবসায় ফেইল হয়ে গিয়ে থাকে। এঁদের অনেককে শ্রমিকদের অপেক্ষা বহু গুণ বেশি মেধা ও পরিশ্রম ব্যয় করতে হয়েছে। [অধিকন্তু মূলধন বাবদ অর্থ সংগ্রহের চিন্তায় এঁদের বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে।] এই দিক থেকে বিবেচনা করলে এঁদেরও শ্রমিক বলা যেতে পারে। এঁদের শ্রমিক না বলার কারণ এই যে এঁরা স্বকীয় বা পৈতৃক অর্থসম্ভূত ব্যবসায় সংক্রান্ত মূলধনের অধিকারী।

[বহু দরিদ্র করণিক, টাইপিস্ট, বেয়ারা প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানির স্বল্প মূল্যের শেয়ারের অধিকারী। কিন্তু ঐ সকল কোম্পানির পরিচালনার সাথে তারা নির্লিপ্ত। অথচ উহাদের প্রতিভূ ম্যানেজার ম্যানেজিং এজেন্ট সর্বেসর্বা হলেও মালিক নয়। কোনও একক ব্যক্তি ঐ কোম্পানির অর্ধেকের বেশি শেয়ার করায়ত্ত করলে কিংবা ঐ ব্যক্তি এই ভাবে সমগ্র ব্যবসায়ের একক মালিক হলে অবশ্য সে কথা স্বতন্ত্র। এজন্য একমাত্র স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের, সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর সদস্যদের এবং সরকার নামধেয় প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের এই শ্রমিক-শ্রেণী হতে বাদ দেওয়া চলে। সর্বশ্রেণীর উচ্চ বেতনভূক কর্মচারীদের এই শ্রমিক-শ্রেণী ভূক্ত করা হয় না। এর কারণ এঁরা এঁদের প্রদত্ত শ্রম ও মেধার তুলনায় অধিক বেতন পান। এই কারণে উপরোক্ত ব্যক্তিদের মালিক পক্ষীয় ব্যক্তি বলা হয়। এর কারণ মালিকের স্থলাভিষিক্তরূপে এঁরা শ্রমিকদের উপর ক্ষমতা জাহির করার অধিকারী। এ' জন্যে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী এবং অনধিকারী ব্যক্তিদের যথাক্রমে মালিক ও শ্রমিক বলা যেতে পারে।]

আমার মতে দরদী নির্লোভী মালিকদের শ্রমিকদের প্রতিপালক বলা যেতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র এই মালিকের [রাষ্ট্রায়ত্ত

মালিকানা] স্থলাভিষিক্ত হন। গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রবহির্ভূত মালিকেরও অস্তিত্ব আছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানার কোনও ব্যবস্থা অমনোনীত হলে সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকরা উহা প্রতিরোধ করতে পারে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকরা মালিকদের যে কোনও অবিচারের প্রতি-বিধান করতে সক্ষম।

[বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র সমাজতন্ত্র ও গণ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন আছে। ধনতন্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি আজিকার পৃথিবীতে তা বিরল। যেটকু এখনও আছে তা'ও বেশি দিন টিকে থাকবে না। আয়কর, বিক্রয়কর, মৃত্যুকর প্রভৃতির নাগ-পাশে ধনতন্ত্র পলায়ন-পর। আজ একলক্ষ টাকা বার্ষিক আয় হলে তা থেকে আশি হাজার টাকার উপর সরকারের প্রাপ্য। এ' জন্যে মালিকদের মূলধনী শ্রমিক এবং মূলধনহীন শ্রমিককে সাধারণ শ্রমিক বললে অত্যুক্তি হয় না।]

শ্রমিক-বিজ্ঞানে কোনও দেশের বা রাষ্ট্রের সমাজ-ব্যবস্থার ভালো-মন্দ বিচারের কোনও স্থান নেই। এখানে রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা দল— শ্রমশিল্পে মূলধন নিয়োগকারী যে কোনও কর্তৃপক্ষকে মালিক এবং বেতনের বিনিময়ে শ্রমরত প্রত্যেক ব্যক্তিকে শ্রমিক বলা হবে।

এমন বহু কৃষক আছে যারা নিজেরাই কৃষিভূমির মালিক। কিন্তু তারা নিজেরা সবটুকু ভূমি চাষ করতে পারে না। এজন্য তারা ভূমি-হীন মজদুরদের নিয়োগ করে থাকে। এই ভূমির মালিক কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষকদের যথাক্রমে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণী-ভুক্ত করা যেতে পারে। সাধারণত কৃষকদের শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কিন্তু শ্রমিক-বিজ্ঞানে ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের মত ভূমিহীন কৃষকদেরও শ্রমিক রূপে স্বীকার করা হয়।

নিজেদের জন্য পরিশ্রম এবং অপরের জন্য পরিশ্রমের মধ্যে তফাৎ

আছে। এজন্য শ্রমিকরা নিজেদের শোষিত এবং মালিকদের শোষকরূপে মনে করে। প্রকৃত কারণ সহ বহু ভুল বুঝাবুঝি ইহার অন্যতম কারণ। শ্রম-বিজ্ঞানীরা শ্রমিকদের এই বিরূপ মনোভাব বৈজ্ঞানিক পন্থায় দূর করে উভয়ের সম্পর্ক মধুরতম করে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থায়ী শান্তি আনতে সক্ষম।

যে আফিসে উর্ধ্বতনের স্টিল্ চেয়ার এবং অধস্তনদের কাষ্ঠ চেয়ার দেওয়া হয়, সেই আফিসে কয়জন অধস্তনকে স্টিল চেয়ার দিলে ঐ স্থানে সামগ্রিক ভাবে যৌথ আনুগত্যের [morale] হানি হয়। শ্রম-বিজ্ঞানীরা ইহা পর্যন্ত সম্যকরূপে প্রমাণ করেছেন।

শ্রমিক-বিজ্ঞান শুধু শ্রমিকের উপকারার্থে রচিত হয় নি। ইহা মালিকদেরও যথেষ্ট উপকারে আসবে। এর দ্বারা মালিক ও শ্রমিক সমভাবে উপকৃত হবে। শ্রমিক-বিজ্ঞানের নির্দেশ এদেশের শিল্পপতিগণ মেনে চলতে চান না। এর কারণ এর সুফল সম্বন্ধে তাঁদের কোনও ধারণা নেই। এই জন্য বিদেশী কোম্পানিগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় আজ তাঁরা অসহায়। এই সম্পর্কে সামান্যতম প্রতিকার করাও তাঁরা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন।

বর্তমান ভারতের ন্যায় প্রাচীন ভারতেও শ্রমিক সমস্যা বর্তমান ছিল। এই সমস্যা সমহ এই যুগ অপেক্ষা তখন আরও সহানুভূতির সহিত বিবেচিত হতো। ঐ সময় বৃহৎ হীরক স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রখনিসমূহ রাজন্যবর্গ স্বয়ং কিংবা তাদের কর্মচারীরা নিয়ন্ত্রণ করতেন। ধনাঢ্য নাগরিকদের বহু ব্যক্তি সময়ে সময়ে অন্য পেশা গ্রহণ করলেও তাঁরা অনেকে বড় বড় খামার (কৃষিভূমি) প্রভৃতির মালিক ছিলেন। তৎকালে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য বড বড় বস্ত্র-শিল্প ও অন্যান্য কর্মশালা দেশব্যাপী গড়ে উঠে। এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান হতে দেশীয় ও বিদেশী বণিকগণ

নানাবিধ তৈরি-দ্রব্য সংগ্রহ করতেন। ছোট ছোট কুটির-শিল্পের সাথে সাথে তৎকালীন উদ্যোগ-শিল্পেরও প্রাচুর্য ছিল। মিছরি লবণ রেশম ও জাহাজ তৈরি, প্রস্তর, ইষ্টক, অস্ত্র, ঔষধ ও বস্ত্র তৈরি, অলঙ্কার, রত্ন ও কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্য, মশলা রঙ্ তৈজস-পত্র তৈরি ও পুষ্করিণী, কৃত্রিম হ্রদ ও নদী খনন ও গৃহাদি নির্মাণের জন্য বহু শ্রমিক নিযুক্ত থেকেছে। এতদ্-ব্যতীত প্রতিটি বণিক পরিবার শত শত ভৃত্য নিয়োগ করেছে। তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাতে এই সকল ভৃত্যেরাও শ্রমিক রূপে বিবেচিত হতো।

ঐ যুগের শ্রমিক-সমস্যা নিয়ন্ত্রণে শাসকবর্গ আগ্রহী ছিলেন। শ্রমিক-দের সুখ-সুবিধার জন্য বহু আইন তৈরি হয়। সম্রাট অশোকের অনু-শাসন ও শিলা-লিপি সমূহে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উহার প্রচুর উল্লেখ আছে। ঐ সকল লিপিকা হতে জানা যায় যে মজদুররা যাতে নিয়মিত বেতন (wages) পায় এবং তাদের প্রতি দয়ার্দ্র ব্যবহার করা হয় তার জন্য নিয়োগ-কর্তা-দের সম্রাট অশোক বাধ্য করতেন। তদানীন্তন হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে জীবন-ধারণের উপযোগী উচ্চ বেতন শ্রমিকদের না দেওয়া অতি নিন্দার বিষয় ছিল। ঐ সকল মালিক ধর্মপতিত ও জাতিচ্যুত জীব রূপে অভিহিত হতেন। রাজার আদেশে রাজকর্মচারী এই অপরাধে তাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন। শ্রমিক এবং ভৃত্য সম্প্রদায় সম্পর্কিত শাসন প্রতিপালিত হয় কি'না তা তদারক করা তৎকালীন রাজন্যবর্গের অবশ্য কর্তব্য [রাজধর্ম] ছিল। এই সকল ভৃত্যগণকে দান ধ্যান ও অন্যান্য মহৎ কর্ম করতে দেখা যেতো। অনুশাসনগুলিতে এরূপ বলা হয়েছে যে শ্রমিকদের এমন বেতন দিতে হবে—যাতে তারা পরিবার প্রতিপালন করে দান ধ্যান প্রভৃতি ধর্মকার্য করতে সক্ষম হয়। ইহা হতে বুঝা যায় যে তাঁরা অতি উচ্চ হারে বেতন পেতেন। সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা এই

যে রাজন্যবর্গ দ্বারা স্বীকৃত ভৃত্যদের নিজস্ব সংগঠন [**Union**] ছিল। সকল ক্ষেত্রে এই সকল ভৃত্যদের মুদ্রা দ্বারা বেতন দেওয়া হতো না। কোনও এক বালিকাকে রত্নখচিত পরিচ্ছদ পাবার জন্য কোন এক পরিবারে তিন বৎসর পরিচারিকার কাজ করতে হয়। একটি সুন্দরী ভার্যা পাবার জন্যে এক বালক ভৃত্য কোনও এক পরিবারে সাত বৎসর গৃহভৃত্যরূপে কার্য করেছিল। তৎকালীন রাজন্যবর্গ ভৃত্যদের জন্য সুদৃশ্য আবাস স্থল নির্মাণে নিয়োগকারীদের আইন দ্বারা বাধ্য করতেন। একটি মাত্রও ভৃত্য যাতে আবাসহীন না থাকে তা দেখা তৎকালীন রাজধর্মের অঙ্গীভূত ছিল। রাজ্য সমূহের বিশেষ বিচার-ব্যবস্থা দ্বারা ভৃত্যদের বেতন সম্পর্কীয় বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি করা হতো। এই থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময় ভৃত্যরা ইচ্ছা করলে তাদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে রাজদ্বারে অভিযোগ আনতে পারতেন। বৃদ্ধ বয়সের জন্য পেন্‌শন প্রদান এবং রোগভোগ কালে পুরা বেতন শ্রমিকদের দেওয়ার রীতি ছিল। এই ভাবে আমরা দেখতে পাই যে প্রাচীন ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল। তাদের বেতনের হার উত্তম ছিল। তাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ভালো ছিল। আপন পুত্র-কন্যাদের মত মালিক তাদের প্রতি ব্যবহার করতেন। অন্যথায় ধর্মীয় শাসন, সমাজ-শাসন ও রাজ-শাসন দ্বারা তাঁরা তা করতে বাধ্য হতেন। গৃহভৃত্যদের পর্যন্ত তৎকালীন আইনে শ্রমিক পদবাচ্য করা হতো।

ভারতের স্থানে স্থানে মোসলেম শাসনের প্রাদুর্ভাবের পর এই শ্রমিকদের অবস্থার অধঃপতন হয়। ঐ সময় মোগল সম্রাটের অধীনে বহু কারখানা গঠিত হয় [আইন-ই-আক্‌বরী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]। আমীর-গণের উপর এইরূপ ছত্রিশটি কারখানার ভার অর্পিত হয়। ঐ সকল

কারখানার প্রশাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোগল সম্রাটগণ কোনও সংবাদ রাখতেন না। এই সকল আমীরগণ স্বার্থান্ধ, উৎকোচ-গ্রাহক ও অর্থলোভী হওয়াতে ঐ সকল কারখানার শ্রমিকদের দুঃখের সীমা থাকত না। তাদের প্রাপ্য বেতনের অর্ধাংশ তাঁরা নিজেদের বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করতেন। বহু ক্ষেত্রে তাদের প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করা হতো। বহুক্ষেত্রে তাদের দেহ চাবুক দ্বারা বিক্ষত করা হয়েছে।

ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীলকুঠির নীল ব্যবসায়ীরা মোগলদের অনুকরণে তাদের নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতি কদর্য ব্যবহার করতেন। ইহাদের এই দেশের কৃষককুল হতে সংগ্রহ করা হতো। এ জন্য স্থানে স্থানে উহার প্রতিরোধে কৃষক-বিদ্রোহ শুরু হয়। পরবর্তী কালে ইংরাজাধীন উন্নত কলকারখানা স্থাপনের পর অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয় নাই। অবাধ্য শ্রমিকদের লাথি মেরে পিলে ফাটানো এবং কাউকে কাউকে বয়লারে নিক্ষেপ করে পুড়ানোর কাহিনী বিরল নয়। তৎকালীন চা-বাগিচার ও ফ্যাকটরির শ্রমিকদের অবস্থা অসহনীয় ছিল। মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা-আন্দোলনের সাথে দেশীয় শ্রমিকরা অভিযোগ-মথর হতে সাহসী হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে এই ইংরাজ শাসন কালেই বহু শ্রমিক-দরদী আইন-কানুনের প্রথম সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে মহানুভব ইংরাজ শাসকদের সৎ কার্য অতীব প্রশংসনীয়। স্বাধীন ভারতে আজ অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক এখন মালিক-শ্রমিকের সম্পর্কে পর্যবসিত। কিরূপে এই রূপ সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠে সেই সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

কর্মক্লান্তি

শ্রমিক-বিজ্ঞান মূলত শ্রমিকদের কর্মক্লান্তি বিদূরিত করে বা সম্ভবমত উহা হ্রাস করে উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের হার বাড়িয়ে দেয়। সাধারণত কর্মের মধ্যবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্রাম-ক্ষণ বা রেস্ট পজ দ্বারা এই কর্মক্লান্তি বিদূরিত করা হয়। এর ফলে শ্রমিকদের অনুৎপাদক শ্রমের হার কমে উহাদের উৎপাদক শ্রমের হার বেড়ে যায়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ বাতিল ও অনুৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী কম নির্মিত হয়। তৎসহ স্বল্প সময়ে ব্যবহারযোগ্য অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী নির্মিত হতে থাকে। উপরন্তু শ্রমিক নিষ্ক্রমণ, গরহাজিরা, রোগভোগ, এবং দৈবদূর্ঘটনার সংখ্যা কমে যায়। এতে মালিক ও শ্রমিক উভয়ে সমভাবে লাভবান হন।

শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহে শ্রমিকদের এই কর্মক্লান্তি বিদূরণের উপর সব কিছু নির্ভর করে। সাধারণত বিশ্রাম প্রদান দ্বারা এই কর্মক্লান্তি বিদূরণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে মাত্র রেস্ট পজ্ বা বিশ্রাম দ্বারা প্রতিটি শ্রমিকের কর্মক্লান্তি দূরীভূত হয় না। এর কারণ এই যে এর মূলগত কারণ আরও গভীর। এইজন্য এই কর্মক্লান্তির প্রকৃত স্বরূপ ও উহাদের উৎপত্তির কারণ জানা দরকার। অন্যথায় ইহার প্রতিষেধক আবিষ্কার করা অসম্ভব। এই জন্য আমি এদেশের শ্রমিকদের এই কর্মক্লান্তির কারন নির্ণয়ার্থে মনোযোগী হই। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই কর্মক্লান্তিকে অবক্লান্তি বলা হয়। ইহা শ্রমিক-বিজ্ঞানের একটি

পরিভাষা। এক্ষণে এই অবক্লান্তি বা ফেটিগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

কর্মক্লান্তিকে ইংরাজিতে বলা হয়ে থাকে ফেটিগ [Fatigue]। এই ফেটিগ্ বা অবক্লান্তির কুফল সুদূর প্রসারী। শ্রমিকদের এই অবক্লান্তির কারণে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন কমে যায়। বহু অকেযো দ্রব্য [spoiled work] উৎপাদিত হয়। দৈনিক ঘণ্টা পিছু উৎপাদনের গতি কমে যায়। শ্রমিকদের এই ফেটিগের কারণে অধিক দ্রব্যোৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় মালিকদের মত শ্রমিকরাও ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিক পিস্ রেট্ বা ফুরনে কাজ করে থাকে। উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর সংখ্যা কমলে মাথা পিছু তাদেরও আয় কমে যায়। উপরন্তু এই ফেটিগ্ বা অবক্লান্তি দৈব-দুর্ঘটনা বা অ্যাক্সিডেন্টের অন্যতম কারণ। এই দৈব-দুর্ঘটনা বা অ্যাকসিডেন্ট্ হলে শ্রমিকদের বহু শ্রমকাল বৃথা নষ্ট হয়। দৈবদুর্ঘটনা জনিত কাজ-কর্মে অক্ষম হয়ে তাদের আয় কমে যায়। অন্যদিকে মালিকদেরও ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ দিতে হয়।

কর্মকালে বিশ্রাম-বিহীন অত্যধিক পরিশ্রম এই ফেটিগের অন্যতম কারণ। কিন্তু উহার অন্যান্য কারণও আছে।

এই অবক্লান্তি বা ফেটিগের স্বরূপ ও কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই অবক্লান্তি তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা, (১) কায়িক [পেশীর] অবক্লান্তি বা মাসকুলার ফেটিগ্ , (২) স্নায়বিক অবক্লান্তি বা নারভাস ফেটিগ্ , (৩) মানসিক অবক্লান্তি বা মেনট্যাল ফেটিগ্। শ্রমিকদের দেহে এই তিনপ্রকার ফেটিগ পৃথক পৃথক বা একত্রে দেখা যায়। এই জন্য শ্রমিকদের এই ফেটিগকে আমরা শ্রমিক সুলভ অব-ক্লান্তি বা ইন্ডাসট্রিয়াল ফেটিগ বলি। এইবার এই তিন প্রকার অব-

ক্লান্তি বা ফেটিগ সম্বন্ধে আমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করবো।

(ক) মাসকুলার ফেটিগ্—এই মাসকুলার ফেটিগের অপর নাম দৈহিক অবক্লান্তি। কোনও শ্রমিক বহুক্ষণ এক নাগাড়ে বা অবিরাম ভাবে বিশ্রাম কাল ব্যতিরেকে পরিশ্রম করলে উহাদের দেহের মাস্‌ল বা মাংস-পেশী সমূহে ল্যাকটিক (lactic) অ্যাসিড্ রূপ এক ক্ষতিকর অম্লজান বা অ্যাসিডের স্থষ্টি হয়। পরিশ্রান্ত মানুষের মাংস সমূহ মাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ল্যাকটিক অ্যাসিড্ ধারণ করতে সক্ষম। অধিক ল্যাকটিক্ অ্যাসিড্ স্থষ্টি হলে মানুষ অবসাদ হতে রক্ষা পাবার জন্যে ইহাকে (অক্সিডাইজড্) অম্লজানে রূপান্তরিত করে গ্লাইকোজন নামক রসে পরিণত করে। কিন্তু প্রতিটি শ্রমিক এই ক্ষতিকর ল্যাকটিক অ্যাসিড্ একই হারে ধারণ করতে বা রূপান্তর করতে সক্ষম হয় না। এই ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী শ্রমিকদের মাসকুলার ফেটিগের পরিমাণের হার কম বা বেশি হওয়া নির্ভর করে। এই ল্যাকটিক অ্যাসিড্ বিদূরিত বা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা সকল শ্রমিকের সমান ভাবে নেই। এইজন্য কোন কোন শ্রমিক এই মাসকুলার ফেটিগে সত্বর আক্রান্ত হয়ে অবসাদ-গ্রস্ত হয়। কোনও কোনও শ্রমিকের এই ভাবে অবসাদগ্রস্ত হতে আরও বেশি সময় লাগে। বহুবিধ কারণে শ্রমিকদের দেহে এই ক্ষতিকর মাসকুলার ফেটিগের স্থষ্টি হয়। উহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান কারণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

(১) কোনও শ্রমিক বিশ্রাম ব্যতিরেকে বহুক্ষণ একনাগাড়ে কাজ করলে তার দেহে এই মাসকুলার ফেটিগের স্থষ্টি হয়। ওভার টাইম্ জনিত কর্মের বাড়তি পরিশ্রমও এই মাসকুলার ফেটিগ আনে। শ্রমিক-দের কেহ কেহ ফ্যাকটরির কাজের পর অন্যত্র পার্টটাইম্ কাজ করে

থাকে। এইরূপ ডবল পরিশ্রমের কবলে পড়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ায় তারা অকেজো হয়ে পড়ে।

(২) এদেশে বহু শ্রমিককে ভর্তিকালে যথাযথ ভাবে ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয় না। বহু বয়ঃসীমা অতিক্রমকারী (ওভার এজেড্) শ্রমিককেও দূরূহ কাজের জন্য ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে ডাক্তারদের উৎকোচ গ্রহণের বিষয়ও শুনা গিয়েছে। এদের বার্ধক্য জনিত স্নায়ুতন্ত্র দূর্বল থাকায় এরা সহজে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

(৩) ফ্যাকটরিসমূহে বায়ু চলাচল ও আলোক ব্যবস্থা উত্তম না হলে শ্রমিক দেহে এই দৈহিক 'ফেটিগ্' সামান্য পরিশ্রমেও দ্রুতগতিতে এসে যায়। উপযুক্ত পরিমাণে বায়ু-তাড়িত অক্সিজেনের অভাবে দেহ-জাত ল্যাকটিক অ্যাসিড্ অক্সিডাইজড্ না হতে পারায় এই দুরবস্থা ঘটে। স্বল্পালোকে জোর করে দেখবার চেষ্টা করলে চক্ষু পরিশ্রান্ত হয়। একটি পেশীর সহিত অপরটির সম্পর্ক থাকায় ইহা শ্রমিকদের সহজে অবসাদগ্রস্ত করে তুলে।

(৪) কারখানা সমূহের হাঁড়িঘর প্রভৃতিতে উত্তপ্ত আগুনের হল্কার সামনে ও তদুদ্গত বিষাক্ত গ্যাস বা ধূমের মধ্যে বহু শ্রমিককে কাজ করতে হয়। এই সকল স্থানে তাপ নিয়ন্ত্রণ ও শীতল বায়ু প্রয়োগের ব্যবস্থা না থাকলে শ্রমিকরা সহজে ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর বিপরীত পরিস্থিতিতে অতি শৈত্য আবহাওয়ার মধ্যেও বহু শ্রমিককে কাজ করতে হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ক্রমাগত দেহ হতে তাপ রেডিয়েট্ করে থাকে। এ'জন্যে ঐ গৃহে বাহির হতে উষ্ণবায়ু প্রবেশ না করালে তাপের সমতার অভাবে শ্রমিকরা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকে।

(৫) এদেশে বহু শ্রমিক আর্থিক চাপে পড়ে স্ব-ফ্যাকটরিতে ওভার-

টাইম কিংবা কর্মকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরে অন্য ফ্যাকটরিতে বাড়তি পরিশ্রম করে। এ'জন্য অধিক পরিশ্রম হেতু তাদের স্বাস্থ্য ও মন ভেঙে পড়ে। এই অবস্থায় সহজে তারা ফেটিগ বা অবক্লান্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

একমাত্র জীবন ধারণের উপযোগী বেতনের ব্যবস্থা করে কঠোর আইন দ্বারা দুই স্থানে কাজ এবং ওভারটাইম বন্ধ করলে এর প্রতিকার হয়। অন্যথায় বংশানুক্রমে এদেশে শ্রমিকদের শ্রমশক্তি কমে আসবে। ওভার-টাইমের বদলে আরও লোক নিয়োগ বেকার সমস্যারও সমাধান করে।

(৬) বহু শ্রমিক আছে যারা বহু দূর হতে কাজে যোগ দেয়। এই দূর পথ অতিক্রমে ফেটিগগ্রস্ত হয়ে তারা ফ্যাকটরিতে ঢুকে। এই অবস্থাতে বিশ্রাম ক্ষণ দ্বারা তাদের ফেটিগ দূরীভূত করা যায় না। ফ্যাকটরিতে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের মান হ্রাসের ইহা অন্যতম কারণ।

[শ্রমিক ভর্তির কালে এই সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করলে সুফল হতে পারে। আলো বায়ু যুক্ত শ্রমিক-ভবন কলকারখানার সন্নিকটে নির্মাণ করতে হবে। ইলেকট্রিক ট্রেন প্রভৃতি যানবাহন চালু হলেও এর প্রতিকার হতে পারে। একথা ঠিক যে মুক্ত বায়ুতে স্বপরিবারের মধ্যে বাস করলে দৈহিক ও মানসিক এই উভয় ফেটিগ হতে নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু দেখতে হবে যে ঐ সকল যানবাহন ব্যবহার করার মত অর্থ তাদের আছে কিনা। অন্যথায় ফ্যাক্টরির নিকটে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের জন্য ফেমিলি কোআর্টার নির্মাণ করতে হবে।

এই মাসকুলার ফেটিগের তারতম্য উদ্যোগ-শিল্পের স্বরূপের উপর

নির্ভর করে। লৌহ পিটাই-এর কাজে যতো পরিশ্রম করতে হয় ততো পরিশ্রম তাঁত চালানোর কাজে করতে হয় না। এই কারণে বিভিন্ন ইনডাসট্রির দৈহিক ফেটিগের হারের তারতাম্য বিভিন্ন রূপের হয়। এই তারতম্য অনুযায়ী শ্রমিকদের বিশ্রাম ক্ষণের মাত্রা নির্ধারিত করা উচিত হবে।

(খ) নারভাস্ ফেটিগ—মনুষ্য দেহের পেশী সমূহের তুলনায় উহাদের স্নায়ুতন্তু (নার্ভ ফাইবার) অতো সহজে অবসাদগ্রস্ত না হবারই কথা, কিন্তু অপর কয়েকটি কারণে উহা দ্রুত অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানুষের উপস্নায়ু সমূহের একটি মুখ 'স্নায়ু-মুখিকার' (**nerve plate**) সাহায্যে মাংসপেশীগুলির সহিত সংযুক্ত এবং উহাদের অপর মুখ কেন্দ্রীয় স্নায়ু সংস্থার (সেণ্ট্রাল নারভাস্ সিস্টেম) সহিত গ্রথিত। পেশীসমূহে সংযুক্ত উপস্নায়ুর স্নায়ু-মুখিকা বা এণ্ডপ্লেট ল্যাকটিক অ্যাসিড দ্বারা আক্রান্ত হলে ঐ সকল উপস্নায়ু শ্রমিকদের মাংসপেশী সমূহের কর্মতৎপরতা বজায় রাখার মত প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎপ্রবাহ কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থা হতে আহরণ করতে পারে না। উপরন্তু মানুষের মাংসপেশীসমূহ এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থার মধ্যবর্তী সংযোগ উপস্নায়ুসমূহ ঐ কারণে দূর্বল হয়ে পড়ায় ঐ কেন্দ্রীয় স্নায়ু সংস্থাতেও একটি ক্ষতিকর পরিবর্তন আসে। ঐ কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থার ঐরূপ ক্ষতিকর পরিবর্তনের তারতম্য মাংসপেশীর ফেটিগ বা অবক্লান্তির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। এইজন্য আমরা মাংসপেশীর ফেটিগের সহিত স্নায়বিক ফেটিগও অনুভব করে থাকি।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওভারস্ট্রেন্ জনিত দৈহিক ও মানসিক ফেটিগ একত্রিত হয়েও এই স্নায়বিক ফেটিগের সৃষ্টি করে। এই নারভাস ফেটিগে ক্রমাগত ভুগলে শ্রমিকরা নারভাস ব্রেকডাউনে আক্রান্ত

হতে পারে। নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে শ্রমিকদেহে এই নারভাস্ ফেটিগ্ দ্রুত গতিতে এসে যায়।

(১) এক ভাবে একস্থানে বসে বা দাঁড়িয়ে নড়ন-চড়ন-বিশ্রাম ব্যতি-রেকে বহুক্ষণ কায করলে এই নারভাস ফেটিগ্ মানুষকে সহজে আক্রমণ করে। এর প্রতিষেধক রূপে মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব স্থানের পরিবর্তন করে কিংবা কর্মস্থান হতে বেরিয়ে এসে বেড়িয়ে বেড়ানো বা অন্য রূপে অঙ্গ-সঞ্চালন করা দরকার।

(২) অতি বিপজ্জনক মেসিন সমূহে সদা ভয়ে ভয়ে কাজ করলে বা ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে থাকলে এই ক্ষতিকর নারভাস্ ফেটিগ্ দ্রুত গতিতে এসে থাকে। অভ্যস্ত হবার পূর্বে একজনের পক্ষে বহুক্ষণ এইরূপ ভয়ঙ্কর মেসিনে কাজ করা অনুচিত। এই বিষয়ে নবাগতদের সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন না করলে সারা জীবন তারা স্নায়ুদৌর্বল্য রোগে ভুগে।

(৩) এদেশে বহু শ্রমিক ভাঙ নেশা মদ্যপান এবং তাড়ি ও চরস প্রভৃতি সেবন করে। স্বল্প মদ্যপান কথঞ্চিৎ মানসিক ফেটিগ সাময়িক ভাবে রোধ করে। নিয়ত অধিক মদ্যপান স্নায়ুকে প্রত্যক্ষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে নারভাস্ ফেটিগের আক্রমণ সহজতর (সাসেপটেব্‌ল) করে তুলে।

(গ) মেনট্যাল ফেটিগ্—এই মেনট্যাল ফেটিগ্ বা মানসিক অবক্লান্তির সৃষ্টি বহুবিধ কারণে হয়ে থাকে। অবসাদগ্রস্ত মন সামান্যতম বিরূপ অনুভূতি বা দুশ্চিন্তা সহ্য করতে পারে না। ঐ অবস্থায় একটি নির্দোষ বাক্যও তাকে অকারণে বিক্ষুব্ধ করে তুলে। মানসিক অবক্লান্তির কারণে বহু প্রদমিত মনোভাব সে সহজে ব্যক্ত করে ফেলে। মানসিক অবক্লান্তির কারণে তার স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় গোপন মনোভাব সে চেপে রাখতে পারে না। এ'সময় সে এমন সব কথা বলে বা এমন সব কাজ করে যা সে সহজ অবস্থায় কল্পনাও করে নি।

ম্যানেজার, মালিক বা ফোরম্যানদের [বড় মিস্ত্রি] দুর্ব্যবহার, কর্মচ্যুতির আশঙ্কা, অর্থের অভাব, পারিবারিক অশান্তি, নিজের অক্ষমতা ও অসাফল্য, অবিচার ও অত্যাচার এবং রোগ-ভোগ প্রভৃতি এই মেন্‌ট্যাল ফেটিগ্‌ এনে থাকে।

উপরিউক্ত কারণগুলি ব্যতীত এই মানসিক বা মেন্‌ট্যাল ফেটিগের আরও বহু কারণ আছে। কোনও একটি কাজে অধিকক্ষণ অনাবিল ভাবে (prolonged) অত্যধিক মনোযোগ দিলে মানুষ মানসিক অবক্লান্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এমন বহু কাজ আছে যাতে বারে বারে ডিসিশন্‌ নিতে বা মনঃস্থির করতে হয়। এই প্রকার কাজ-কর্মে আরও শীঘ্র এই মানসিক অবক্লান্তি উপগত হয়।

এই মানসিক অবক্লান্তি কাজ-কর্মে মন্থর গতি আনে। এ অবস্থায় সে সামান্য কারণে বিরক্ত, চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। উপরন্তু এই মানসিক ফেটিগ্‌ কর্মরত শ্রমিককে কাজকর্মে অমনোযোগী করে তুলে। কর্মশালায় বহু দৈব-দুর্ঘটনা এই মানসিক অবক্লান্তির কারণে ঘটে গিয়েছে।

কেহ কেহ বলে থাকেন যে মানসিক কর্মক্লান্তিতে আক্রান্ত শ্রমিক-দের অন্তর্বর্তীকালে এমন কাজ দেওয়া ভালো যাতে অধিক মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এই মতবাদ সমভাবে প্রযোজ্য নয়। ক্ষেত্র বিশেষে এতে ফল বিপরীত হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই এমন কাজ কিছুক্ষণ করলেও মানুষের মধ্যে বোরডম্‌ [boredom] বা অবক্লান্তি আসে। এই বোরডম্‌ বা অবক্লান্তিকে চলতি ভাষায় একঘেয়েমী বলা হয়। কর্মক্লান্তি বা ফেটিগ্‌ এবং অবক্লান্তি বা বোরডমের মধ্যে যা কিছু তফাৎ তা এইখানে। মানুষের এই বোরডম্‌ অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী

উৎপাদনের প্রতিবন্ধক। এই বোরডমের কারণে কর্মের প্রতি কর্মীর আকর্ষণ ও উৎসাহ নষ্ট হয়। এর ফলে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের গতি বা স্পিডের হার কমে আসে। কেহ কেহ মনে করেন যে একই কাজ বারে বারে করলে মানুষের একঘেয়েমী-বোধ আসে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এইরূপ ধারণার স্থান নেই। অধিক ক্ষেত্রে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই এমন কাজও বোরডম্ এনে থাকে। এই জন্যে রোগের উৎপত্তির কারণ বুঝে উহার প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা উচিত হবে।

[লেখা ও পড়ার কাজ বিশ্রাম ব্যতিরেকে বহুক্ষণ যাবৎ করলে মানুষ চক্ষু ও মন সম্পর্কেও দৈহিক ও মানসিক কর্মক্লান্তিতে আক্রান্ত হয়। এ অবস্থায় ক্ষণে ক্ষণে গবাক্ষের বাইরের দৃশ্যের প্রতি চক্ষু ফেরালে কিংবা মধ্যে মধ্যে অন্য বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করলে ইহা হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ ভাবে অধিকক্ষণ শ্রম-বিরতি দিলে পড়া বা লেখার ঝোঁক ও ভাব নষ্ট করে দিতে পারে। এ'জন্য এরূপ শ্রম-বিরতি অধিক-ক্ষণ হওয়া উচিত হবে না।]

মানসিক কর্মক্লান্তি বা মেনট্যাল ফেটিগের মূল কারণগুলি উপরে বিবৃত করা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত কারণসমূহ ব্যতীত এদেশের শ্রমিকদের এই মেনট্যাল ফেটিগের উৎপত্তির আরও বহু কারণ আছে। এই সকল কারণের কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

(১) এদেশে বহু শ্রমিক তাদের একটু বেশি বয়সে বিবাহ করে থাকে। ক্রমশ তার বয়স আরও বেশি হলেও স্ত্রীর বয়স তদনুপাতে কম থাকে। প্রৌঢ় বয়সে যৌন-লিপ্সা এমনিতেই এদের কিছুটা কম থাকে। এ অবস্থায় পরিশ্রান্ত স্বামীর পক্ষে [কম বয়সী] স্ত্রীর প্রতি দৈহিক মনোযোগ দেওয়ার ইচ্ছা থাকে না। প্রতিদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর রাত্রে

তার দেহ নেতিয়ে পড়ে। এ অবস্থায় [তখনও] যুবতী স্ত্রী যৌন ভোগের কারণে তাকে উত্যক্ত করলে মানসিক ফেটিগের সৃষ্টি হয়। এ'স্থলে এই মানসিক ফেটিগ পরদিন কর্মকালেও সক্রিয় ভাবে কার্যকরী থাকে। কোন কোন সমাজের রীতি অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শ্রমিকের কাজ করে থাকে। ঐ সমাজের স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সমভাবে পরিশ্রান্ত থাকায় তাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হয়। কিন্তু এদেশের বহু পরিবারে এইরূপে একত্রে পরিশ্রম করার রীতি নেই। আবার কয়েকটি সমাজে স্ত্রীরা স্বামীর অপেক্ষা বয়সে বড়ো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য এদের পুরুষদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্তু ঐরূপ পরিবারের সংখ্যা এদেশে অতীব বিরল।

এই সম্পর্কে একদা কোনও এক শ্রমিকের একটি বিবৃতি গ্রহণ করেছিলাম। এই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রৌঢ় শ্রমিক চোখের জল ফেলতে ফেলতে এই বিবৃতি দেয়। এই চিত্তাকর্ষক বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। এর এই বিবৃতিটি কর্মকর্তাদের প্রণিধানযোগ্য।

"আমার বর্তমান বয়েস পঞ্চাশের উর্ধ্বে উঠেছে। কোম্পানির ডাক্তারকে বিশ টাকা ঘুষ দিয়ে ও মিথ্যা করে কম বয়স লিখিয়ে আমি চাকুরি পাই। আমার চল্লিশ বৎসর বয়সে আমার যথেষ্ট শক্তিসামর্থ্য ছিল। এই ভরসায় আমি ষোলো বৎসর বয়স্কা ভার্যা গ্রহণ করি। কিন্তু সেদিন আমি বুঝি নি যে আমি বেঁচে থেকে বুড়ো হবো। কিন্তু সেই দিন পর্যন্ত সে জোয়ান স্ত্রীলোক থাকবে। এর ফলে প্রতিটি রাত্রি আমার পক্ষে বিভীষিকা হয়ে উঠে। যার জন্যে স্ত্রীলোক রাজ্য-সংসার ছেড়ে যায় তা আমি তাকে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এসে দিতে পারি না। বাড়ি ফিরা মাত্র আমি নেতিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আমার কলহমুখরা স্ত্রী তা

বুঝেও বুঝে না। প্রিয়তমা স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায় না। বার্ধক্যে সেই আমার সম্বল। এছাড়া এদেশে তালাক দেওয়ার রীতি নেই। বলা বাহুল্য যে সে-ও এতে রাজি হবে না! এই মারাত্মক অবস্থায় আমার একমাত্র মৃত্যুই কামনা।"

[শ্রমিক নিয়োগ-কর্তারা শ্রমিক নিয়োগ কালে তাদের সাংসারিক অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন না। আমার মতে তাদের. পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের নিয়োগ করলে বহু নিস্ফল বা বিফল শ্রমক্ষণ হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এই ভাবে শ্রমিক নিয়োগ করে আমি দেখেছি যে বাতিল ও অনুৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্য রূপে কমে গিয়েছে।]

(২) মুহুর্মুহু চাকরি যাবার ভয়ে আতঙ্কিত থাকতে হলেও এই মেণ্টাল ফেটিগ্ দ্বারা শ্রমিকরা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। উর্ধ্বতন মিস্ত্রি ও ফোরম্যানদের অকারণ দুর্ব্যবহার ও অবিচারও এই মেনট্যাল ফেটিগের কারণ। একান্তে অন্তরালে কাউকে বকাঝকা এবং সর্বসমক্ষে বকাবকির মধ্যে তফাৎ আছে। পরিচিত বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের সম্মুখে এরূপ ঘটনা ঘটলে এই মানসিক ফেটিগ্ চরমে উঠে থাকে। অবিচার ও অত্যাচার বাধ্য হয়ে সহ্য করতে হলে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারলে এই মেনটাল ফেটিগ্ সারানো দুষ্কর হয়ে উঠে।

(৩) এদেশের শ্রমিকরা পুরাপুরি শ্রমিক মনোবৃত্তি আজও পর্যন্ত অর্জন করতে পারে নি। এ'জন্য ক্ষেত-খামারে ফসল তুলবার সময় এরা স্ব স্ব গ্রামে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে অপারক হলে এদের মধ্যে মানসিক কর্মক্লান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই সময় ছুটি না পেলে এদের অনেকে কাজ ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এতে অপারক হলে তারা মানসিক অবক্লান্তিতে ভুগে।

[এইখানেও শ্রমিক ভর্তির সময় প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। অন্য দিকে এদের প্রকৃত শ্রমিক রূপে গড়ে তুলার চেষ্টাও এদেশে অদ্যাবধি হয় নি। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যথাসত্বর অবহিত হওয়া উচিত হবে।]

এই তিন প্রকার অবক্লান্তি বা ফেটিগের একত্র অবস্থানকে আমরা ইন্ডাসট্রিয়াল ফেটিগ বা শ্রমিক সুলভ কর্মক্লান্তি বলে থাকি। আমার মনে হয় যে আরও কয়েক প্রকার কর্মক্লান্তি এতে যুক্ত আছে। আমার মত এই যে, এই বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। শ্রমিকদের এই কর্মক্লান্তির সংজ্ঞা, পরিমাপ ও প্রকৃতি নিরূপণ একটি কঠিন কাজ। এখানে ইনডাসট্রিয়াল ফেটিগ এবং মনোবনমন বা ইনহিবিশনের মধ্যে প্রভেদ বুঝা দরকার। এর কারণ এই শ্রমিক সুলভ কর্মক্লান্তির বা ফেটিগের সহিত এই মনোবনমন বা ডিপ্রেশন এবং ইনহিবিশন বা অবক্লান্তি তথা বোরডম্ প্রভৃতি যুক্ত থাকে। উপরন্তু এই মানসিক ফেটিগের কম-বেশি পরিমাণেরও প্রশ্ন উঠে। বারে বারে কোনও কাজে মনোযোগ দেওয়ার জন্য যেমন ফেটিগ্ বা কর্মক্লান্তি আসে, তেমনি কর্মের মধ্যে একই প্রকার ভাবালুতা [Attitude] রক্ষা করার জন্যেও এই ফেটিগ বা কর্মক্লান্তি আসে। এখানে এই কয় প্রকার কর্মক্লান্তি বা ফেটিগের প্রভেদ সম্পর্কেও বিবেচনা করা দরকার। উপরন্তু কর্মলিপ্সা, ইনসেন্‌টিভ্, উত্তেজনা, স্নায়ু দৌর্বল্য, বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্‌শন প্রভৃতিও শ্রমিকদের এই ফেটিগ্ বা কর্মক্লান্তি কমাতে বা বাড়াতে পারে। শ্রমিকদের অবক্লান্তি বা ফেটিগ সাধারণ মানুষের কর্মক্লান্তি অপেক্ষা জটিলতর পদার্থ।

এই শ্রমিক সুলভ কর্মক্লান্তি বা ফেটিগ্ উদ্যোগ-শিল্পে অধিক সংখ্যক দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের হানি ঘটিয়ে থাকে। এজন্যে এর প্রকৃত স্বরূপ

বুঝে এর কবল থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করা উচিত হবে। শ্রমিক ও মালিক এই উভয় শ্রেণীর স্বার্থে ইহার প্রয়োজন আছে।

শ্রমিকদের এই ফেটিগ্ বা কর্মক্লান্তি তাদের মধ্যে এসেছে কি'না এবং তা এসে থাকলে কতো পরিমাণে এসেছে তার পরিমাপ বৈজ্ঞানিক পন্থায় নির্ধারণ করা যায়। এই সম্পর্কে কয়েকটি ফেটিগ্ পরিমাপক যন্ত্র বহু কাল পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্র হতে শ্রমিকদের বীক্ষণাগারে সরিয়ে এনে এই যন্ত্রের সাহায্যে তাদের পরীক্ষা তারা পছন্দ করে না। উপরন্তু এ বিষয়ে তাদের মনে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। অধিকন্তু এইরূপ পরীক্ষার্থে সময় অপচয়ে দ্রব্য সামগ্রী কম উৎপাদন হয়। এই পরীক্ষাতে শ্রমিকরা উপযুক্ত অভিজ্ঞান [ইনট্রসপেকশন্) ঐ পরিমাপক যন্ত্রের মাধ্যমে দিতে পারে নি। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে এই ফেটিগ পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু শ্রমিক-বিজ্ঞানীরূপে এতে মত দিতে পারি না। আমার মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত পন্থায় শ্রমিকদের এই ফেটিগ্ পরিমাপ করা সম্ভব না হলেও অন্য উপায়ে আমরা শ্রমিকদের এই কর্মক্লান্তির পরিমাপ জেনে নিতে পারি। এই জন্যে প্রথমে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন সম্পর্কিত কয়েকটি দৈনিক পরিসংখ্যান তৈরি করে নিতে হবে, যথা, (১) অকেজো বা বাতিল দ্রব্য [spoiled work] ও অনুৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্যা, (২) ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর সংখ্যা, (৩) দৈব দুর্ঘটনা ও গরহাজিরের সংখ্যা। এর পর দ্রব্যোৎপাদনের গতি বা স্পিডের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিসংখ্যাগুলির সাহায্যে কয়েকটি স্তম্ভ বা কলম্ ও রেখা বা কার্ভ সৃষ্টি করে এই ফেটিগের আগমন কাল ও উহার পরিমাপ নির্ধারণ করা যায়। এই ফেটিগ বা অবক্লান্তি উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর

সংখ্যা কমিয়ে আনে এবং ঘণ্টা পিছু দ্রব্যোৎপাদনের গতি কমিয়ে দেয়। শ্রমিকদেব সামগ্রিক কর্মফলেব উপর নির্ভর ক'রে উহাদের ফেটিগ বা কর্মক্লান্তি পরিমাপ করা যায়।

(যে সকল ফ্যাকটরিতে একই প্রকারের ও আকারের দ্রব্যাদি তৈরি হয় সেই সকল ফ্যাকটরিতে শ্রমিক সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ঘণ্টা পিছু উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যেব সংখ্যাব উপব নির্ভব কবে ফেটিগের পরিমাপ কবা চলে। কিন্তু ধোবীখানার মত এমন কযেকটি শিল্প আছে যেখানে ঐ পন্থা প্রযোজ্য নয়। ধোবীবা বিভিন্ন মাপেব বস্ত্র কাচে ও ইস্ত্রি ক'রে থাকে। এই জন্য এখানে ফেটিগ নির্ণযার্থে ইস্ত্রি করা বস্ত্রের সংখ্যা গুনলে চ'লবে না। এ'ক্ষেত্রে ঐ ধোবীকে একই প্রকারের ও আকাবের বস্ত্র নির্দিষ্ট সমযেব মধ্যে ইস্ত্রি কবতে বলতে হবে এইভাবে কয় ঘণ্টা কাজের পর তাদেব মধ্যে ফেটিগ আসে তা জানা যায়।)

এইভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা কোনও কর্মশালায় শ্রমিকদের মধ্যে কর্মক্লান্তি বা ফেটিগের অস্তিত্ব আছে বুঝলে উহা বিদূরিত করা মালিকদেব এক অবশ্য কর্তব্য কর্ম। প্রধানত তিনটি পৃথক্ পৃথক্ উপাযে শ্রমিকদের এই কর্মক্লান্তি বা ফেটিগ বিদূরিত কবা যায়, যথা—(১) শ্রমিক জীবনে অনুপযুক্ত ব্যক্তিদেব গ্রহণ না করা। এ জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থায় শ্রমিক নির্বাচন করতে হবে, (২) কর্মশালায় প্রচুর আলোক ও বাতাসের ব্যবস্থা কবা, (৩) কায-কর্মেব ফাঁকে ফাঁকে কর্ম বিরতির [Rest pause] ব্যবস্থা কবা এবং (৪) কর্ম-শালায় নির্দিষ্ট কর্মকাল ও প্রকৃত কর্মকাল নিয়ন্ত্রণ করা।

উপরোক্ত এই তিন প্রকারের প্রতিষেধক ব্যবস্থা দ্বারা উদ্যোগ-শিল্পে যুগান্তব এনে উহার প্রভূত উপকার করা সম্ভব। এই জন্যে এই জটিল তথ্য ও তত্ত্ব ত্রয় সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক অধ্যায়ে আমি আলোচনা করবো।

শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি কল্পে শ্রমিকদের তিন প্রকার কর্মক্লান্তি বা ফেটিগের অপসরণের প্রয়োজন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে এই শ্রমিক-কর্মক্লান্তি মূলত তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—দৈহিক, স্নায়বিক এবং মানসিক। কিন্তু এই কর্মক্লান্তি ত্রয় বিদূরণের কালে উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা দরকার। কারণ এই যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে একটির অপসরণে অপরটির বর্ধন ঘটে। এই সম্পর্কে জনৈক শ্রমিকের একটি বিবৃতি প্রণিধান যোগ্য। ঐ বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি অমুক প্রতিষ্ঠানে মাত্র ষাট টাকা মাসিক বেতন পেতাম। এতে ছয়টি প্রাণী সম্বলিত পরিবার পালন অসম্ভব হয়ে উঠে। এই জন্য কারখানার ডিউটি আওআরের পর অন্যত্র রাত্রের সিফটে আমি কর্মরত হই। আমি ভালো কারিকর হওয়ায় এই সুবিধা অন্যত্রও আমি পাই। এতে আমার মাসিক আয় বেড়ে যাওয়ায় আমি মানসিক অশান্তি হতে অব্যাহতি পাই। এইভাবে দিন রাত খেটে অল্পেই আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তাম। এই সময় কোম্পানি প্রদত্ত বিশ্রামে আমি সুস্থ হতাম না। একদিন আমার কোম্পানি আমার অন্যত্র বাড়্তি চাকুরির বিষয় জেনে ফেলে। তারা আমাকে ঐ চাকুরি ছাড়তে বাধ্য করে। এর ফলে আবার আমার সংসারে অর্থাভাব ও অশান্তির সৃষ্টি হতে থাকে। আমি এতে মানসিক কর্মক্লান্তিতে অভিভূত হয়েও পড়ি।"

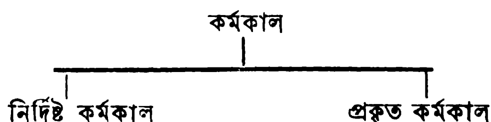
উপরোক্ত তথ্যটি সকল ক্ষেত্রেই যে প্রযোজ্য তা বলা যায় না। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, অধিক বেতন পাওয়া সত্ত্বেও এরা অসুখী। এর কারণ অকারণে অধিক ব্যয়, আয়ব্যয়ের হিসাব না রাখা, মদ্যপান জুয়া প্রভৃতিতে আসক্তি। এই সামাজিক কারণগুলি দূরীভূত করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। এর জন্য শ্রমিকদের মধ্যে সহজ শিক্ষা-দীক্ষার

প্রচলন করা উচিত হবে। এই শিক্ষাতে শ্রমিকদের ঘরনাদের [স্ত্রীদের] শিক্ষিত করলে তারা পুরুষদের সংযত করতে পারে। আর একটি উপায়ে সামগ্রিক ভাবে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। এদের বাড়িতে বাড়িতে কুটির-শিল্পের প্রচলন করে এদের যৌথ আয় বাড়ানো উচিত। কয়েক শ্রেণীর নাগরিকদের নারীদের শ্রমশিল্পে কর্ম করার রীতি নেই। এই শ্রেণীর শ্রমিকদের সম্পর্কে এই শেষোক্ত ব্যবস্থা বিশেষরূপে প্রযোজ্য।

কর্মকাল

ফ্যাকটরি সমুহে যে কয় ঘণ্টা কাজ করার হুকুম দেওয়া হয় ঐ সময়টুকুকে ঐ ফ্যাকটরির কর্মকাল বলা হয়ে থাকে। যদি কোনও ফ্যাকটরিতে সিফ্‌ট পিছু দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার রীতি থাকে তো ঐ আট ঘণ্টা যাবৎ কর্মকালকে বলা হয় ঐ ফ্যাকটরির কর্মকাল। যদি কোনও ফ্যাকটরিতে একত্রে বারো ঘণ্টা যাবৎ কাজ করার ব্যবস্থা থাকে তো ঐ বারো ঘণ্টা ব্যাপী কর্মকালকে বলা হবে ঐ ফ্যাকটরির দৈনিক কর্মকাল। এই কর্মকালকে ইংরাজিতে ওআর্ক স্পেল বলা যেতে পারে। বহু কর্মক্ষণের একত্র সমাবেশ দ্বারা এই কর্মকালের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ফ্যাকটরি সমুহের এই কর্মকালকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা—(১) নির্দিষ্ট কর্মকাল এবং (২) প্রকৃত কর্মকাল। ইংরাজিতে উহাদের যথাক্রমে নমিন্যাল এবং একচুয়েল কর্মকাল বলা যেতে পারে। এইখানে এই নিদিষ্ট কর্মকাল ও প্রকৃত কর্মকালের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।



ফ্যাকটরির মালিক পক্ষ হতে শ্রমিকদের কাজের জন্য সিফ্‌ট পিছু

দৈনিক যে কয় ঘণ্টা কর্মকাল নির্দিষ্ট করা হয় তাহাকে বলা হয়— নির্দিষ্ট কর্মকাল। ধরে নেওয়া হয় যে এই নির্দিষ্ট কর্মকালের মধ্যে শ্রমিকরা এক নাগাড়ে তাদের প্রতিটি শ্রমক্ষণ উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যয় করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে মালিকদের দ্বারা নির্দিষ্ট শ্রমকালের প্রতিটি শ্রমক্ষণ উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যয়িত হয় নি। তারা নানা ভাবে ফাঁকি দেয় বা অননুমোদিত বিশ্রাম গ্রহণ করে। এই জন্য দেখা যায় যে ফ্যাকটরি সমূহে নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকদের দ্বারা নির্দিষ্ট কর্মকালের মধ্যে যতো উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন হওয়া উচিত তদপেক্ষা ঐরূপ দ্রব্যোৎপাদন বহু গুণে কম হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে এই নির্দিষ্ট কর্মকাল যতো ঘণ্টা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে কার্যক্ষেত্রে তদপেক্ষা বহু কম ঘণ্টা কর্মশালায় উৎপাদনের জন্য কাজ হয়। [এই শেষোক্ত কর্মকালকে বলা হয় প্রকৃত কর্মকাল।] এই অব্যয়িত কর্মকালকে শ্রমিক-বিজ্ঞানের পরিভাষায় নষ্ট কাল বলা হয়ে থাকে। এক্সিডেন্ট, রোগ-ভোগ, কাজে ফাঁকি, গরহাজিরা, অবৈধ বিশ্রাম এবং মন্থর গতির কারণে অপচয় হওয়া কালকেও নষ্ট কাল বলা যেতে পারে। নির্দিষ্ট কর্মকাল হতে এই নষ্ট কর্মকাল বাদ দিলে যে সময় অবশিষ্ট থাকে তাকে আমরা বলি 'প্রকৃত কর্মকাল'। নিম্নলিখিত পন্থায় আমরা ফ্যাকটরি সমূহের নীট্ ফল বার করে নিতে পারি।

নির্দিষ্ট কর্মকাল——১২ ঘণ্টা
নষ্ট কর্মকাল——৮ ঘণ্টা

প্রকৃত কর্মকাল ৪ ঘণ্টা

ফ্যাকটরি সমূহে এই নষ্ট কাল বন্ধ না হলে লাভের আশা দুরাশা। এই নষ্ট কর্মকাল কমাতে না পারায় বহু কর্মশালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ফ্যাকটরির প্রোডাকশন বা উৎপাদন বাড়াতে হলে এই সময়ের অপচয় বন্ধ করতে হবে। এই নষ্ট কাল কমাতে না পারলে ফ্যাকটরির মালিকরা প্রধানত দুইটি বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। প্রথমত তাঁদের কর্মীরা প্রকৃত পক্ষে [তালিকা দেখুন] বারো ঘণ্টা স্থলে মাত্র চার ঘণ্টা কাজ করলেও মেসিন চালানোর জন্যে বারো ঘণ্টার হিসাবে ইলেকট্রিক কারেণ্ট খরচ হয়েছে। দ্বিতীয়ত তারা মাত্র চার ঘণ্টা যাবৎ কাজ করলেও তারা বারো ঘণ্টার কাজের হিসাবে বেতন আদায় করেছে। মালিকরা একদিকে উপরোক্ত দুইটি খরচ বাবদ অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অপর দিকে উপযুক্ত সংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদিত না হওয়ায় তাদের বাড়তি লোকসান ঘটেছে। ফ্যাকটরি সমূহের এই ক্ষতিকর নষ্ট কালের জন্য কেবলমাত্র শ্রমিকদের দায়ী করা অনুচিত। বহু ক্ষেত্রে উহাদের মালিকরাও এইরূপ দুরবস্থার জন্য দায়ী। বক্তব্য বিষয় বুঝার জন্য এই নষ্ট কালের স্বরূপ ও কারণ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

এক্সিডেণ্ট, রোগ-ভোগ, কাজে ফাঁকি, গরহাজিরা, চুরি করা বিশ্রাম ও কর্মে মন্থর গতি প্রভৃতি কারণে কর্মশালায় বহু শ্রম-ক্ষণের অপচয় ঘটে। শ্রমিক-বিজ্ঞানের পরিভাষায় ইহাকে আমরা নষ্ট কাল বলি। অবশ্য মেসিন খারাপ হওয়ায় বা কাঁচা মালের অভাবের জন্য নষ্ট কালকে এর মধ্যে ধরা হয় না। এর কারণ এই দুইটির সঙ্গে প্রশাসনিক ত্রুটি থাকে। এতে শ্রমিক-বিজ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নেই। শ্রমিকদের কাজ-কর্মে ফেটিগ বা কর্মক্লান্তি বাড়া বা কমার সঙ্গে এই নষ্টকাল বাড়ে বা কমে। এইগুলিকে শ্রমিকদের ইনডাসট্রিয়াল ফেটিগ বা অপসরণের প্রত্যক্ষ কুফল বলা যেতে পারে। এই ফেটিগের কারণে গরহাজিরার সংখ্যা বাড়ে ও

কর্মে মন্থরগতি আসে এবং রোগ-ভোগ, কর্মে ফাঁকি ও এক্সিডেণ্টের সংখ্যা বাড়ে।

শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কর্মকাল হতে এই নষ্ট কর্মকাল বাদ দিলে যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় প্রকৃত কর্মকাল। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে অত্যধিক রূপে এই নির্দিষ্ট কর্মকাল বাড়িয়ে দিলে প্রকৃত কর্মকাল অত্যন্ত রূপে কমে গিয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের সাধ্যের মধ্যে নির্দিষ্ট কর্মকাল কমিয়ে আনলে এই প্রকৃত কর্মকাল উহার প্রায় কাছাকাছি উঠে এসেছে। এমন কি কয়েক ক্ষেত্রে এতে এই দুই কর্মকাল সমান সমান দেখা গিয়েছে।

কোন একটি ফ্যাকটরিতে বার ঘণ্টা নির্দিষ্ট কর্মকাল নির্ধারিত হলে দেখা যায় যে, উহার প্রকৃত কর্মকাল ছয় ঘণ্টাতে নেমে এসেছে। কিন্তু ঐ ফ্যাকটরির নির্দিষ্ট কর্মকাল আটঘণ্টায় কমিয়ে আনলে দেখা যায় যে, উহার প্রকৃত কর্মকাল বেড়ে সাত ঘণ্টার উপরে উঠে এসেছে। উপরন্তু ঐ সময়ে কর্মের গতি বাড়ার জন্য এই সাত ঘণ্টা প্রকৃত কর্মকালের ভিতর কাজ করে শ্রমিকরা দশঘণ্টার কাজের সমপরিমাণ কাজ করেছে। ঐ সময়ের মধ্যে একটি মাত্রও অকেজো ও অনুৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদন করে তারা মালিকের ক্ষতি করে নি। কিন্তু উহাদের কর্মকাল ছয় ঘণ্টার নিম্নে নামালে দেখা গিয়েছে যে উহাতে মালিক বা শ্রমিক কেহ লাভবান হয় নি। পিসরেটের কাজের শ্রমিকদের পক্ষে ইহা খুব বেশি ক্ষতিকর হয়ে থাকে। প্রতি সিফটে ছয় ঘণ্টার কম কর্মকাল নির্ধারণে কাহারও লাভ হয় না। কারণ ইহাতে দ্রব্যোৎপাদন না বেড়ে উহা বরং কমে যেতে থাকে। এতে বুঝা যায় যে, 'কর্মকালের' বাড়ানোর মত উহা কমানোরও একটা শেষ সীমা আছে। হাল্কা ও ভারী শিল্পে পরিশ্রমের তারতম্য ঘটে। এজন্য বিভিন্ন শিল্পে এই শেষ সীমা বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

[এই তথ্য ও তত্ত্ব হতে বুঝা যায় যে, অধিক সময় শ্রমিকদের খাটালে যতো আয় হয়, তার চেয়ে বেশি আয় তাদের কম সময় খাটালে পাওয়া যায়। কারণ শ্রমিকদের শক্তি সামর্থ্যের বাইরে তাদের খাটালে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। ভালো কাজ পেতে হলে শ্রমিকদের কর্মকাল উচিতমত কমানো দরকার। এতে শ্রমিকগণ ফেটিগ্ মুক্ত হওয়ায় তারা অধিক দ্রব্য উৎপাদন করবে। এই কর্মকাল কয় ঘণ্টা হবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা যায়। ভারী ও হাল্কা শিল্পের 'উচিত কর্মকাল' বিভিন্ন হতে বাধ্য। এই সম্বন্ধে আমি পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করবো।]

সাধারণত আমরা শ্রমিক সংখ্যার ও উহাদের কর্ম ঘণ্টার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কর্মকালের সহিত উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্যার তুলনা করে প্রথমে নষ্ট কাল এবং পরে নির্দিষ্ট কর্মকাল হতে ঐ নষ্ট কাল বাদ দিয়ে প্রকৃত কর্মকাল বার করি। যে সকল ফ্যাকটরিতে একই আকার [সাইজ্] ও প্রকারের [কোয়ালিটি] দ্রব্যাদি নির্মিত হয় সেই সকল ফ্যাকটরিতে ইহা প্রকৃত পন্থা রূপে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এমন বহু কর্মশালা আছে যেখানে ছোট, বড়ো, মাঝারি সাইজের দ্রব্যাদি নির্মিত হয়ে থাকে। এইখানে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের সংখ্যার পরিবর্তে উহাদের সাথে ঐ সময়ে খরচ হওয়া ইলেকট্রিক কারেণ্টের ইউনিটের সংখ্যার তুলনা করতে হবে। এইভাবে প্রথমে ঐ ফ্যাকটরির নষ্ট কর্মকাল অঙ্ক কষে বার করতে হবে। এরপর ওখানকার নির্দিষ্ট কর্মকাল হতে ঐ নষ্টকাল বাদ দিয়ে ঐ ফ্যাকটরির প্রকৃত কর্মকাল বার করা যাবে।

এদেশে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে প্রতিটি শ্রমিকের উপর পৃথক পৃথক ভাবে লক্ষ্য রাখা সম্ভব। কিন্তু বৃহৎ উদ্যোগ-শিল্পে শ্রমিকগণ যৌথ-ভাবে কাজ করে। প্রকৃত কর্মকালের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য কোনও শ্রমিক

এখানে একক ভাবে দায়ী নয়। প্রতিটি শ্রমিকের উপর এখানে নিষ্প্রয়োজনে লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়। বিবিধ কার্যে নিযুক্ত থাকায় এদের মধ্যে সমান ভাবে কর্মক্লান্তি বা ফেটিগ আগত হয় নি। এরা সকলে সমান ভাবে দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে নি। সকল শ্রমিক সমান ভাবে কর্মলিপ্সা [টেম্পো বা ঝোঁক] অর্জন করতে পারে না। কেহ কেবল মাত্র আপন দক্ষতায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করেছে। আবার, কোন কোন অনুপযুক্ত শ্রমিক অনুৎকৃষ্ট ও বাতিল দ্রব্য উৎপাদন করেছে। ঐজন্যে বৃহৎ শিল্পে নির্ধারিত কর্মকালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত কর্মকাল বার করতে হলে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে প্রথমে উৎপাদিত দ্রব্যের নীট্ ফল বার করতে হবে। এই নীট ফল ভালো বা মন্দ তা বুঝতে হলে শুধু উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্যার উপর নির্ভর করলে চলবে না। অনুৎকৃষ্ট ও অকেজো দ্রব্যের সংখ্যাও এই হিসাবের মধ্যে স্থান দিতে হবে। ফ্যাকটরি সমূহের অনুৎকৃষ্ট দ্রব্যকে আমরা বাতিল দ্রব্য বলে থাকি। এদের নীট ফল বার করার পন্থা নিম্নোক্ত তালিকা হতে বুঝা যাবে।

মোট উৎপাদন————	৩০০
উৎকৃষ্ট দ্রব্য————	২০০
বাতিল দ্রব্য————	১০০
নীট কর্মফল————	
	১০০

এই ফ্যাকটরির দৈনিক উৎপাদিত দ্রব্যের নীটফল এই ভাবে বার করার পর আমাদের ঐ ফ্যাকটরির কর্ম ঘণ্টা [ঘণ্টা পিছু] ধরে কর্মকালের

একটা হিসাব নিতে হবে। [এখানে কর্মকালের সহিত গতি সংযুক্ত থাকায় ঘণ্টা প্রতি হিসাব ধরা হয়েছে।] এর পর ঐ ফ্যাকটরিতে ঐ দিন কতো ব্যক্তি কাজ করেছে তাদের সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে। ধরা যাউক, ঐ বিভাগে একশত ব্যক্তি এক নাগাড়ে [অবিশ্রান্ত] এক ঘণ্টা যাবৎ কাজ করেছে। [১০০ শ্রমিক × এক ঘণ্টা = ১০০ ঘণ্টা।] এবার দেখতে হবে যে ঘণ্টা প্রতি উৎপাদিত নীট কর্মফলের সহিত ঐ একশ ঘণ্টার কাজের সামঞ্জস্য আছে কি'না? বৃহৎ উদ্যোগ-শিল্পে এই ভাবে হিসাব করে নীট ফল খারাপ দেখলে বুঝতে হবে যে বহু অনুপযুক্ত কর্মী সেখানে বহাল আছে কিংবা প্রশাসনিক গলদের জন্য কর্মীদের মধ্যে ফেটিগ্ বা অবক্লান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ফেটিগ বা অবক্লান্তি বিদূরণের জন্য প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট কর্মকাল কমাতে হবে কিংবা যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত নির্দিষ্ট কর্মকালের মধ্যে মধ্যে ফেটিগ কমানোর জন্যে স্বল্পকালীন শ্রম-বিরতি [Rest-pause] দিতে হবে।

এই নির্দিষ্ট কর্মকাল এবং প্রকৃত কর্মকাল সম্পর্কিত কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। এই সকল পরীক্ষা হতে প্রকৃত কর্মকাল উদ্যোগ-শিল্পসমূহে কতো ঘণ্টা নির্ধারিত হওয়া উচিত তা বুঝা যায়।

(১) শ্রমিকদের সাধ্যাতীত ভাবে তাদের কর্মকাল [বারো ঘণ্টা] নির্দিষ্ট করলে ফ্যাকটরি সমূহে দৈব দুর্ঘটনা, বাতিল দ্রব্যাদি, রোগ-ভোগ, গরহাজিরা, কাজে ফাঁকির সংখ্যা বেড়ে যায়। এতে অযথা বহু শ্রমক্ষণ বা কর্ম ঘণ্টা ফ্যাকটরিতে অপচয় হয়ে থাকে। এজন্য ঐ নির্দিষ্ট কর্মকাল বারো ঘণ্টা হতে দশ ঘণ্টাতে নামালে ঐ ফ্যাকটরির দৈনিক ঘণ্টা প্রতি উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। এই নির্দিষ্ট কর্মকাল দশ ঘণ্টা হতে আট ঘণ্টায় নামালে

ঐ ফ্যাকটরিতে উৎপাদিত দ্রব্যের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষাও বেশি হয়েছে।

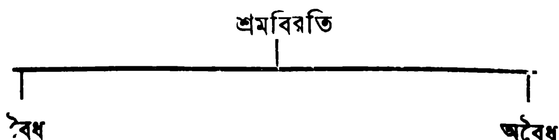
(২) এই নির্দিষ্ট কর্মকাল আট ঘণ্টার নিম্নে নামালে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য আর বাড়ে নি। তবে কোনও বাতিল দ্রব্য সেখানে উৎপাদিত হয় নি। এই নিদিষ্ট কর্মকাল ছয় ঘণ্টার নিম্নে নামালে ঐ ফ্যাকটরিতে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য না বেড়ে বরং উহার সংখ্যা কমে গিয়েছে।

৯

বিশ্রাম-ক্ষণ

বিশ্রাম-ক্ষণের অপর নাম শ্রম-বিরতি। শ্রম-বিরতিকে [স্বল্পকাল বিশ্রাম] ইংরাজিতে রেস্টপস্ (Rest-pause) বলা হয়। কর্মরত শ্রমিকের কর্মের মাঝখানে যে স্বল্পক্ষণ বিশ্রম দেওয়া হয় তাকে শ্রমবিরতি বলা হয়ে থাকে। এইরূপ বিশ্রাম দ্বারা শ্রমিকরা তাদের ফেটিগ্ বা অবক্লান্তি হতে মুক্ত হয়ে থাকে। সাধারণ ভাষায় ইহাকে টিফিন টাইম [জলযোগের সময়] বলা হয়ে থাকে। এই টিফিন টাইমে শ্রমিকরা যেমন জলযোগ করে, তেমনি ঐ সময়ে বিশ্রাম দ্বারা তারা তাদের ফেটিগ্ বিদূরিত করে।

শ্রম-বিরতি শ্রমিকদের ফেটিগ্ হতে মুক্ত করে কর্মঠ রাখার একমাত্র উপায়। ইহা তাদের বৈধ ভাবে না দিলে জৈব কারণে উহা তারা চুরি করে আদায় করে। নিয়ম তান্ত্রিকতার নামে কোনও দানবীয় শাসনও তাদেরকে এই স্বভাব হতে মুক্ত করতে পারে নি। এই জন্য এই শ্রম-বিরতিকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকি, যথা বৈধ ও অবৈধ।



শিল্পকর্মে রেস্টপস্ বা শ্রম-বিরতির সুফল সদূর প্রসারী হয়ে থাকে। শ্রম-বিরতি শ্রমিকদের অবক্লান্তি বা ফেটিগ্ বিদূরিত করে উহাদের কর্মশক্তিকে অব্যাহত রাখে। এই প্রয়োজনীয় 'শ্রম-বিরতি' শ্রমিকদের না দিলে ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হলে শ্রমিকরা অবৈধ ভাবে বিশ্রাম নেয়। এই 'শ্রম চুরি' অভ্যাসে পরিণত হলে উহার কুফল সুদূর প্রসারী হয়ে উঠে। ফ্যাকটরিতে বৈধ শ্রম-বিরতির আগমনের আশায় শ্রমিকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। নির্ধারিত কালে উহারা উহা অন্যান্য শ্রমিকদের সহিত একত্রে উপভোগ করার জন্যে উম্মুখ হয়ে থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, বৈধ শ্রম-বিরতির তুলনায় অবৈধ শ্রম-বিরতির উপকারিতা এক পঞ্চমাংশ মাত্র। অবৈধ শ্রম-বিবতি এক-একজন শ্রমিক এক-এক সময় নিয়ে থাকে। যৌথ পরিশ্রমের ক্ষেত্রে ইহা তাদের যৌথ-বোধ ও দায়িত্ব বা টিম ওআর্ক নষ্ট করে দেয়। এক-এক শ্রমিক এক-এক সময় কর্মক্লান্ত হয় সে কধা ঠিক। কিন্তু সাধারন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন শ্রমিকদের এই ভেদাভেদ খুব বেশি হয় না। অভ্যাসগত স্বয়ংক্রিয়তা এবং কর্মলিপ্সার কারণে কিছুকাল পরে [ফৌজী লোকের মত] এইটুকু প্রভেদও এদের থাকে না। এই সম্বন্ধে 'শ্রমকার্য' সম্পর্কিত প্রবন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করবো। এই কারণে শ্রমিকদের যৌথ ভাবে একত্রে বিশ্রাম-প্রদান উচিত হবে।

বহু মালিক বলে থাকেন যে, কাঁচা মালের অভাবে, যোগান দানের বিলম্বে, মধ্যে মধ্যে মেসিন থামালে এবং উহা সাময়িকভাবে খারাপ হলে এমনিতেই শ্রমিকরা যথেষ্ট বিশ্রাম পায়। তদুপরি মোটর যাতে জ্বলে না যায় তার জন্যে মাঝে মাঝে মেসিনকে রেস্ট দেওয়া হয়। তাঁদের মতে এর বেশি বিশ্রাম শ্রমিকদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঐরূপ ছাড় ছাড় [নাম-মাত্র) বিশ্রাম শ্রমিকদের কাম্য হয় না। এরূপ অনির্দিষ্ট বিশ্রামেতে তারা

বিরক্ত হয়ে উঠে। ইহা তাহারা পছন্দ করে না। এরা এতে দৈহিক অবক্লান্তির সাথে সাথে মানসিক অবক্লান্তিতে ভূগেছে। এই হতে বুঝা যায় যে, একমাত্র বৈধ শ্রমবিরতি শ্রমিকদের ক্ষতিকর বিবিধ রূপ ফেটিগ কমাতে সক্ষম।

এখন শ্রম-বিরতি (বিশ্রাম) কতক্ষণ দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আমার মতে উহা স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হওয়া উচিত। উহা কদাচ দীর্ঘস্থায়ী হওয়া উচিত নয়। এইখানে হিসাবের ভূলচুক হলে শ্রম-শিল্পের ক্ষতি হয়। শ্রম-বিরতি বা রেষ্টপস্ দীর্ঘস্থায়ী হলে উহা শ্রমিকদের মধ্যে আগত কর্ম-লিপ্সা নষ্ট করে দেয়। এই কর্মলিপ্সা [টেম্পো বা ঝোঁক] পুনরায় অর্জন করা সময় সাপেক্ষ। অথচ উপযুক্ত সময় শ্রম-বিরতি না দিলে ফেটিগ বা অবক্লান্তি বিদূরিত হয় না। এই জন্য এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম-বিরতি দেওয়া প্রয়োজন।

[উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মলিপ্সা একটি উপকারী শ্রমিক মনোবৃত্তি। ইহাকে ইন্‌সেনটিভ্ অথবা টেম্পো বা ঝোঁক বলা যেতে পারে। এই কর্মলিপ্সা কর্মারম্ভের পর ধীরে ধীরে উদ্ভূত হয়ে কর্মের গতি বাড়িয়ে দেয়। এই কর্মলিপ্সা থাকা কালীন শ্রমিকরা দ্রুতগতিতে অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করে। এই কর্মলিপ্সা শ্রমিকদের অবক্লান্তি বা ফেটিগ দ্বারা অবরুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই কর্মলিপ্সা বা কর্মের টেম্পো অবক্লান্তি বা ফেটিগ্‌কে বহুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারে। ফেটিগ অতিরিক্ত হলে আখেরে অবশ্য এই কর্মলিপ্সা তৎদ্বারা বিদূরিত হয়। এই ফেটিগ্ বন্ধ করার জন্যে দীর্ঘস্থায়ী বিশ্রাম দিলে এই কর্মলিপ্সা নষ্ট হয় এবং উহা পুনরায় আয়ত্ত করতে বহু মূল্যবান শ্রমক্ষণ বৃথা অপচয় হয়। এই জন্যে এই কর্মলিপ্সার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বল্পস্থায়ী শ্রম-বিরতি নির্ধারণ করা উচিত। স্বল্পস্থায়ী বিশ্রাম এই কর্ম-

লিপ্সা নষ্ট করে না। অথচ এতে অবক্লান্তি বা ফেটিগ্ও বিদূরিত হয়।]

শ্রম-বিরতি কতক্ষণ হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার উহা দিবসের কোন সময় দেওয়া উচিত তা বলবো। সাধারণত মধ্যাহ্ন কালে টিফিনের সময় শ্রমিকদের এক ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া হয়। দৈনিক আট ঘণ্টা কর্মকালকে দুই ভাগে বিভক্ত করে মধ্যবর্তীকালে কিছুকাল বিশ্রাম দেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু প্রতিটি ফ্যাকটরিতে এই নিয়ম প্রযোজ্য ব'লে আমি মনে করি না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, দিবসেব এক সময় ফ্যাকটরিতে দ্রব্যোৎপাদন সর্বোচ্চ শিখরে উঠে এবং তারপরই উৎপাদিত দ্রব্যের সংখ্যা ধীরে ধীরে কম হতে শুরু করে। এতে বুঝা যায় যে. শ্রমিকদের কর্মলিপ্সা ঐ সময় পর্যন্ত উহাদের ফেটিগ্কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। উহাদের ফেটিগ কর্মলিপ্সাকে বিদূরিত কবা মাত্র উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্যা কমতে শুরু করে। আমার মতে দ্রব্যোৎপাদন ঐ সর্বোচ্চ শিখরে উঠার পরমূহূর্তে পরিশ্রান্ত শ্রমিকদের শ্রম-বিরতি (রেস্টপস্) দেওয়া উচিত হবে। বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন ফ্যাকটরিতে বিভিন্ন সময়ে উৎপাদন সর্বোচ্চ শিখরে উঠে থাকে। দ্রব্যোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কম বা বেশি পরিশ্রমের উপর এই উৎপাদন সম্পর্কিত সর্বোচ্চতা নির্ভর করে।

কোন্ সময় ও কতক্ষণ এই শ্রম-বিরতি দেওয়া উচিত তা বলা হলো। এখন দিবসে কতবার উহা শ্রমিকদের দেওয়া উচিত তা বলা যাক। লৌহ শিল্পাদি ভারি শিল্পে যত শীঘ্র অবক্লান্তি [ফেটিগ] আসে, বস্ত্র শিল্পাদি হাল্কা শিল্পে ততো শীঘ্র উহা আসে না। কয়েকটি ক্ষেত্রে (অবস্থা ভেদে) দীর্ঘস্থায়ী একটি শ্রম-বিরতির বদলে স্বল্পস্থায়ী দুই বার কিংবা চারিবার শ্রম-বিরতি দিলে ফল ভালো হয়। শ্রমিকদের দেহের অবক্লান্তির

প্রতি লক্ষ্য রেখে এইরূপ বিবিধ প্রকার শ্রম-বিরতির তথা বিশ্রাম-ক্ষণের ব্যবস্থা করা তদারকি কর্মচারীদের উচিত হবে।

কয়েকটি কাজে অতি দ্রুত গতিতে পরিশ্রম করতে হয়। এই সকল কাজে মানুষ সহজে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। একটি ভারী দ্রব্য তুলে শ্রমিকরা বিশ্রাম নিয়ে তবে অপর এক ভারী দ্রব্য তুলতে পারে। অপরদিকে একটি ভারী দ্রব্য তুলে পরে কম ভারী দ্রব্য তুলতে তাদের অসুবিধা নেই। রেস্টপস্ নিরূপণার্থে এই সকল বিষয় ম্যানেজার বা মালিকের বিবেচনা করা উচিত।

শ্রমিকদের ফেটিগ্ দূরীকরণার্থে কোনও কোনও ফ্যাকটরিতে রেকর্ড যোগে হাল্কা মিঠা বাজনা বাজানো হয়ে থাকে। এই হাল্কা মিউজিক শ্রমিক-চিত্তে টনিকের কাজ করে। কিন্তু এই মিউজিক এক নাগাড়ে বহুক্ষণ বাজানো উচিত নয়। একাদিক্রমে বাজালে উহা একটা সহজ ব্যাক গ্রাউণ্ডের সৃষ্টি করে। মন অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় উহা আর মনে প্রতিক্রিয়া আনে না। উপরন্তু উচ্চনাদে বাজনা ও কণ্ঠসঙ্গীত (সমূহ) সর্বদা পরিত্যাজ্য। গানের কথা বুঝতে চেষ্টা করে শ্রমিকরা অন্যমনস্ক হয়ে দৈব দুর্ঘটনা ঘটায়। এই জন্য নীচু সুরে হাল্কা বাজনা মধ্যে মধ্যে বাজালে মাত্র ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়। এই যন্ত্রসঙ্গীতের সুর মধ্যে মধ্যে বদলালে মানসিক ব্যাক্ গ্রাউণ্ডের সৃষ্টি হয় না। এই হাল্কা বাজনার সুরের উত্থান ও পতন যন্ত্রের গতি ও যন্ত্রীর রিথিমের সাথে মিশে গেলে ফল আরও উত্তম। এই বিষয়ে যন্ত্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা প্রভূত সাহায্য করতে পারেন।

এই রেস্ট্ পস্ কোনও ফ্যাকটরিতে প্রথম প্রবর্তনের সময় খুব বেশি ভালো ফল দেখা যায় না। এতে অভ্যস্ত হতে শ্রমিকদের কয়েক দিন সময় দিতে হবে। এইজন্য ইহার সুফল কয়েক দিন পর প্রকাশ পায়।

এখন এই রেস্ট্ পসের উপকারিতা সম্পর্কীয় কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই সকল তত্ত্ব ও তথ্য [ভবিষ্যৎ] গবেষক ছাত্রদের গবেষণাতে পথ নির্দেশ করবে।

(১) কোনও এক ফ্যাকটরিতে কোনও শ্রম-বিরতি দেওয়ার নিয়ম ছিল না। এই সময় এখানে গরহাজিরা ও রোগভোগের শতকরা হার ৭৫ ভাগ ছিল। ঐখানে শ্রম-বিরতির প্রবর্তন করার পর দেখা যায় যে, ঐগুলির শত করা হার মাত্র ২৬ ভাগ হয়েছে।

(২) কোনও একটি ফ্যাকটরিতে শ্রমিকরা প্রতিদিন অবৈধ বিশ্রাম নিতো। এইজন্য সেখানে এক ঘণ্টাতে মাত্র ১৬টি উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে। এর পর সেখানে স্বল্পক্ষণ বৈধ শ্রম-বিরতি প্রবর্তন করা হয়। এতে মাত্র ২৫ মিনিট বিশ্রাম গ্রহণ করে শ্রমিকরা এইখানে ১৮টি উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করেছে। পরে ১৭ মিনিট কাজের মধ্যে তিন মিনিট বিশ্রাম গ্রহণে ঐখানে ২২টি দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে। পরে দশ মিনিট কাজের মধ্যে দুই মিনিট বিশ্রাম গ্রহণে ঐখানে ২৫টি উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে। এই সম্পর্কে নিম্নের তালিকাটি দ্রষ্টব্য।

শ্রমিকদের কর্মকাল	১ ঘণ্টা	২৫ মিঃ	১৭ মিঃ	১০ মিঃ
শ্রম-বিরতি	—	৫ মিঃ	৩ মিঃ	২ মিঃ
উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী	১৬	১৬	২২	২৫

(৩) কোনও এক ফ্যাকটরিতে আড়াই ঘণ্টার কর্মকালের মধ্যে একক্ষেপে দশ মিনিট বিশ্রামের বদলে দুই ক্ষেপে দুই মিনিট কাল বিশ্রাম

দিলে দেখা যায় যে, ঐখানে উৎপাদিত দ্রব্যের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে এককক্ষেপে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিশ্রাম অপেক্ষা দুই ক্ষেপে স্বল্পস্থায়ী বিশ্রাম অধিক কার্যকরী হয়।

(৪) কোনও একটি এমব্রয়ডারি শিল্পে দেখা গিয়েছে যে, দুই ক্ষেপে দুইটি দীর্ঘস্থায়ী বিশ্রামের বদলে সেখানে তিনক্ষেপে তিনটি স্বল্পস্থায়ী বিশ্রাম দেওয়ায় উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। এই নূতন ব্যবস্থাতে ঐ স্থানে কাজকর্ম খুব ভালো হতে থাকে। মালিকরা এতে যথেষ্ট লাভবান হতে থাকেন।

(৫) কোনও এক কর্মক্ষেত্রে মেণ্ট্যাল ওআর্ক খুব বেশি করা হতো। এখানে এক ঘণ্টা কর্মকালের মধ্যে ৪০ মিঃ কাল কাজ করার পর দু মিনিট বিশ্রাম দিলে যা সুফল পাওয়া গিয়েছে তার চেয়ে দুঘণ্টার কর্মকালের মধ্যে ৮০মিঃ কার্য করার পর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম দিলে তদপেক্ষা অধিক সুফল পাওয়া গিয়েছে।

এইখানে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ফেটিগ আগত হওয়ার পূর্বে বিশ্রাম দেওয়ায় ওদের কর্মলিপ্সা ঐ বিশ্রাম দ্বারা ব্যাহত হয়েছে। দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কর্মলিপ্সার অবসান হওয়ার পর ঐ বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এই সকল ফলাফল হতে বুঝা যায় যে, এই কর্মলিপ্সার সাহিত ফেটিগের সামঞ্জস্য রেখে এই শ্রম-বিরতি বা বিশ্রামকাল স্থির করা আমাদের উচিত হবে।

উপরোক্ত রূপ রেস্টপস্ ব্যতিরেকে অপর আর এক প্রকার রেস্টপস্ সম্বন্ধেও আমি পরীক্ষা করেছি। আমার নিজস্ব কুটীর-শিল্পে ছয়টি বিদ্যুৎ চালিত টেপলুম আছে। একজন শ্রমিক এই প্রকার দুইটি করে টেপলুম চালাতে সক্ষম। সর্বসাকুল্যে প্রতি সিফটে ছয়টি কলের জন্য তিনটি তাঁতীর প্রয়োজন। এখানে আমি একজন চতুর্থ তাঁতী নিয়োগ

করি। প্রয়োজন মত পর্যায়ক্রমে প্রতিটি কর্মরত তাঁতীকে সে ক্ষণে ক্ষণে বিশ্রাম দিতে থাকে। একজন বাড়তি তাঁতী সাথে থাকাতে কর্মরত তাঁতীদের মনের সাহস বাড়ে। যারা হাতে-কলমে কাজ করে তাদের চক্ষে নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে না। কিন্তু এই বাড়তি তাঁতী নিজে কর্মে নির্লিপ্ত থাকাতে তার চক্ষে সাথীদের ভুলচুক ও তাঁতের যান্ত্রিক দোষ সমভাবে ধরা পড়ে। এতে দেখা যায় যে, এই শিল্পে উৎকৃষ্ট ফিতা উৎপাদনের হার শতকরা পনেরো ভাগ বেড়ে গিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে এক গজ ফিতাও বাতিল করার প্রয়োজন হয় নি। এই ব্যবস্থার অপর সুফল এই যে, তাঁতীদের কেউ গরহাজির বা অসুস্থ হলে এই বাড়তি তাঁতী তৎক্ষণাৎ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে তাঁতীর অভাবে একটু ক্ষণের জন্যও উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে না।

কয়েকটি কুটীর-শিল্পে দেখা গিয়েছে যে, সকালের দিকে উৎপাদন ভালো হলেও বিকালের দিকে ফল ভালো হয় নি। সম্ভবত বিভিন্ন সময়ের মানসিক অবস্থা এবং আবহাওয়া এ জন্য দায়ী। বোরডম্ ইহার অপর কারণ হতে পারে। বিকালের দিকে বাটী ফিরার জন্য শ্রমিকের মন উৎসুক হয়। এই ক্ষেত্রে মধ্যাহ্নে দীর্ঘস্থায়ী বিশ্রাম না দিয়ে সকালে ও বিকালে স্বল্পস্থায়ী বিশ্রাম দিলে ফল ভালো হয়।

কোনও কোনও শিল্পে দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রমিকদের খাটানো হয়। কিন্তু এই আট ঘণ্টা সময়কে চার ঘণ্টা করে ভাগ করা হয়ে থাকে। এই উভয় কর্মকালের মধ্যে এদের তিন ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ চার ঘণ্টা অবিরাম কাজ করার পর তিন ঘণ্টা কাল তারা বিশ্রাম পায়। এই বিশ্রামের পর পুনরায় তাদের চার ঘণ্টা অবিরাম কাজ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে তাদের [$4+(3)+4=11$] এগারো ঘণ্টা কাল কর্মস্থলে আটক থাকতে হয়। বাটী সন্নিকটে থাকলে তাদের এতে কতকটা সুবিধা হয় বটে।

বহু শ্রমিক ট্রেনে করে দূর হতে কর্মস্থলে আসে। যাতায়াতে তাদের প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। এই হিসাবে তাদের তের ঘণ্টা বাটীর বাহিরে থাকতে হয়। য়ুরোপীয়দের ক্লাব-ভিত্তিক জীবনে এই ব্যবস্থা সর্বোত্তম হতে পারে। এর কারণ, এই মধ্যবর্তী তিন ঘণ্টা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তারা কোম্পানির রেস্তঁরাতে ও ক্লাবে এবং লাইব্রেরিতে হৈ-হল্লা করে চিত্ত বিনোদন করে। কিন্তু এ দেশীয়দের জীবন বাটী-ভিত্তিক হয় [ক্লাব-ভিত্তিক নয়]। এই জন্য দিবসের পরিশেষে স্ত্রী-পুত্রের সাথে দ্রুত মিলনের জন্য এদের মন উন্মুখ হয়। এর ফলে এরা এতে সহজে দৈহিক, মানসিক ও স্নায়বিক অবক্লান্তিতে অভিভূত হয়। এদেশে মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকের পক্ষে এই ব্যবস্থা শ্রমিক-জীবন গ্রহণের প্রধান প্রতিবন্ধক। এমন কি, যে সকল নিরক্ষর শ্রমিক কুলি লাইনে বাস করে তারাও এ ব্যবস্থা পছন্দ করে না। তাদের এই বহুক্ষণস্থায়ী অবসর তারা নিজস্ব পন্থায় নিজেদের ডেরাতে উপভোগ করার পক্ষপাতী।

এতক্ষণ দৈনিক বিশ্রাম-ক্ষণ বা শ্রম-বিরতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কিন্তু এই একই কারণে সাপ্তাহিক এবং বাৎসরিক বিশ্রাম-কালেরও প্রয়োজন আছে। সপ্তাহে একদিন যে ছুটি থাকে তাকে সাপ্তাহিক বিশ্রামকাল বলা হয়। কোনও মাসে দুদিন [এক সাথে শনি এবং রবিবার] ছুটি থাকলে উহাকে মাসিক বিশ্রামকাল বলা হয়। বৎসরে বহু দিন একত্রে ছুটি হলে উহাকে বাৎসরিক বিশ্রামকাল বলা হয়। মানসিক, দৈহিক ও স্নায়বিক কর্মক্লান্তি বিনোদনের জন্য এই সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে। এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত না হলে শ্রমিকরা সমাজের সাথে সম্পর্ক বিবর্জিত হয়ে অনুভূতিবিহীন মেকানাইজড্ মানুষে পরিণত হয়। এতে সমাজের সাথে সাথে শ্রম-শিল্পেরও ক্ষতি হয়।

৫

শ্রমকার্য

শ্রমিকদের শ্রমকার্য দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—সফল ও অসফল। শিল্প ক্ষেত্রে অসফল শ্রমের কোনও স্থান নেই। এই স্থলে শুধু সফল শ্রম সম্বন্ধে বলা হবে। এই সফল শ্রম ব্যতিরেকে কোনও উদ্যোগশিল্পের উন্নতি হতে পারে না। এর অভাবে রাষ্ট্র ও দেশ নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শ্রমিকদের কর্মক্লান্তি তথা ফেটিগ বিদূরিত করে এই সফল শ্রমের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

স্বল্প সময়ের মধ্যে কর্মক্লান্তি (ফেটিগ) ব্যতিরেকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য শ্রমিকরা শ্রম দান বা বিক্রয় করে থাকে। উদ্যোগ ও কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা এই উদ্দেশ্যে নিজেদের ও মালিকদের স্বার্থে শ্রমকার্য করে। এমন বহু মালিক আছেন যাঁরা শ্রমিকদের দেহের ও মনের ক্ষতিকর পূর্বোক্ত কর্মক্লান্তি উপশমের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। বহু ক্ষেত্রে তাঁরা 'চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হবে'—এইরূপ ভয় দেখিয়ে কিংবা বাড়তি ভাতা বা ওভার টাইম দেওয়া হবে ব'লে শ্রমিকদের নিকট হতে বাড়তি পরিশ্রম আদায় করেন। এই পন্থায় প্রথম কয়দিন বা কয় মাস উপরো-উপরি ফল ভালো হলেও আখেরে উহা মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই সর্বনাশ সাধন করে। একটি অশ্বকে মাদক দ্রব্য পান করিয়ে কিংবা তাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করে স্বল্প সময়ে অধিক দূর ছুটানো সম্ভব। কিন্তু এর ফলে পরিশেষে তার দেহ ও মন ভেঙে যায় এবং সে শেষ-বেশ পুরাপুরি অক্ষম ও অথর্ব হয়ে পড়ে।

কোনও দেশের কৃষক ও শ্রমিক কুল এই ভাবে ক্লীবে পরিণত হলে ঐ দেশের প্রতিরক্ষার অসুবিধে ঘটে থাকে। এর কারণ এই কৃষক ও শ্রমিক কুল হতে সেনা-বাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। কু-খাদ্য গ্রহণ, স্বল্লাহার প্রভৃতি এবং অতি পরিশ্রম শ্রমিকদের মধ্যে ক্লীবত্ব আনে। ক্ষেত্র বিশেষে উহার বংশগত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এই জন্য রাষ্ট্রের উচিত এই বিষয়ে মালিকদের সংযত করা। এ ভাবে যুবক-শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে কুফল সাংঘাতিক হয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের বিষয় সর্বদা মনে রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। যুদ্ধ প্রভৃতি মহা আপৎ কালে মাত্র এর ব্যতিক্রম ঘটানো যেতে পারে। স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি নিয়োগ করে অধিক দ্রব্য উৎপাদনের অন্য কুফলও আছে। এতে মালিকের লাভ হলেও বেকার যুবকের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। উপরন্তু ফ্যাকটরিতে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য অচিরে ভেঙ্গে পড়ে।

এইরূপ অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ কিছু কাল পরে দেখা যায় যে কর্মক্লান্তির কারণে গরহাজিরা, রোগভোগ, অনুৎকৃষ্ট ও বাতিল দ্রব্যোৎপাদন, দৈব দুর্ঘটনা, কর্মে মন্থরগতি ও শ্রমিক-চ্যুতির (লেবার টার্ন আউট) সংখ্যা বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এই অবস্থাতে মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই লাভের বদলে লোকসান হয়ে থাকে।

মালিকদের মত শ্রম-বিজ্ঞানীরাও স্বল্প সময়ে বহুল সংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন কামনা করেন। কিন্তু মালিকদের ও শ্রম-বিজ্ঞানীদের অবলম্বিত পন্থাদ্বয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। শ্রমিক-বিজ্ঞানীরা শ্রমিকদের ফেটিগ কমিয়ে বা তা রুদ্ধ করে তাদের দেহ ও মনকে সুস্থ রেখে তাদের দ্বারা স্বল্প সময়ে অধিক দ্রব্য উৎপাদন করাতে চান। শ্রম-বিরতি বা রেস্ট পস্ প্রভৃতির দ্বারা এই অব-

শ্যম্ভাবী ফেটিগ কমানো বা দূর করার বিষয় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। (বিশ্রামক্ষণ শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) পূর্ব নিবন্ধে এই অবশ্যম্ভাবী কর্মক্লান্তি অতি মাত্রায় উপগত হলে রেস্ট পস্ দ্বারা তার অবসানের উপায়ের বিষয় বলা হয়েছে। শ্রমিকরা ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হবার উপক্রম হওয়া মাত্র বিশ্রামক্ষণ দ্বারা তাদের ঐ ফেটিগ নিবারণ করা হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই ফেটিগ বা কর্মক্লান্তি যথেষ্ট পরিশ্রমেও যাতে কম আসে বা উহা দেরিতে আসে তার উপায় বিবৃত করবো। কয়েকটি রীতিনীতি দ্বারা কঠোর পরিশ্রমকে লঘু পরিশ্রমে পর্যবসিত করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় উহাকে শ্রম-রীতি বলা হয়ে থাকে। এর ফলে ফ্যাকটরি সমূহে স্বল্প পরিশ্রমে অধিক সুফল পাওয়া গিয়ে থাকে। সুসংহত পরিশ্রমের কারণে শ্রমিকরা সহজে ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। একক শ্রম ও যৌথ শ্রম এবং দৈহিক শ্রম ও যান্ত্রিক শ্রম—এই সকল প্রকার শ্রম সম্পর্কে এই শ্রমরীতি সমভাবে প্রযোজ্য। শ্রমিকদেব মধ্যে কর্মতাল বা রিথিমের সৃষ্টি করে, শ্রমকালে উহাদের দৈহিক ভারসাম্য বা ব্যালেন্স রক্ষা করে, উহাদের মধ্যে কর্মচাতুর্যের সৃষ্টি করে এবং উহাদের কর্মে স্বয়ংক্রিয়তা, পৌনঃপুনিকতা [রিপিটেটিভ ওআর্ক] নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রব্য সমাবেশ ও দ্রব্যাবস্থানের সুব্যবস্থা করে শ্রমিকদের কর্মক্লান্তি যথেষ্ট পরিমাণে কমানো যায়।

দ্রব্যোৎপাদনার্থে শ্রমিকদের এই শ্রম কার্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মকাল [work-spell] মালিকরা ঠিক করেছেন। সহজ ভাষাতে ইহাকে ফ্যাকটরিতে কর্মের সিফট বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে প্রতিটি ক্ষণ শ্রমকার্যে কদাচিৎ ব্যয়িত হয়েছে। বিশ্রামহীন ভাবে বহু ঘণ্টা যাবৎ কাজ-কর্ম করলে অবসাদ আসে। তৎজনিত শ্রমিকরা নানারূপ ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর ফলে কর্মে মন্থরগতি

আসে এবং শ্রমিকরা অবৈধ [অননুমোদিত] বিশ্রাম গ্রহণ করে। এইজন্য ফ্যাকটরিতে 'প্রকৃত কর্মকাল' উহার নির্দিষ্ট কর্মকাল অপেক্ষা বহু কম হয়ে থাকে। এই নির্দিষ্টকাল এবং প্রকৃত কর্মকাল সম্বন্ধে 'কর্মকাল' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষণে উহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই নির্দিষ্ট কাল শ্রমিকদের সহ্যাতীত ভাবে অধিক হলে ফ্যাকটরির প্রকৃত কর্মকাল কমে গিয়ে থাকে। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট কর্মকাল কমিয়ে শ্রমিকদের সাধ্যের মধ্যে আনলে এই প্রকৃত-কর্মকাল বেড়ে গিয়েছে। নিম্নোক্ত পরীক্ষা-নীরিক্ষা দ্বারা বক্তব্য বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝা যাবে।

(১) এই নির্দিষ্ট কর্মকাল সিফ্‌ট্ পিছু বারো ঘণ্টা হতে দশ ঘণ্টাতে নামালে ফ্যাক্টরির প্রকৃত কর্মকাল পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যায়। ফলে ফ্যাকটরিতে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্যা পূর্বের চাইতে বেশি হয়। এই নির্দিষ্ট কর্মকাল দশঘণ্টা হতে আট ঘণ্টাতে নামালে ফ্যাক্টরির প্রকৃত কর্মকাল আরও বাড়ে। ফলে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্যা ওখানে আরও বেশি হয়। এ' ভাবে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদন বাড়ার সাথে ফ্যাক্টরিতে বাতিল দ্রব্যের সংখ্যাও যথাক্রমে কম হয়। এই হতে বুঝা যায় যে শ্রমিকদের অধিক সময় খাটালে অধিক ফল পাওয়া যায় না, বরং উহাদের উচিতমত কম সময় খাটলে পূর্বের তুলনায় ভালো ফল পাওয়া যায়।

(২) এই নির্দিষ্ট কর্মকাল [সিফ্‌ট্ পিছু] আট ঘণ্টা হতে ছয় ঘণ্টাতে নামালে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংখ্যা আর বাড়ে না। কিন্তু এই ছয় ঘণ্টার কর্মকালের মধ্যে একটি মাত্রও বাতিল দ্রব্যের সৃষ্টি হয় নি। এতে দেখা যায় যে, আট ঘণ্টার সিফ্‌ট্ অপেক্ষা ছয় ঘণ্টার সিফ্‌টে লাভ বেশি। এই নির্দিষ্ট কর্মকাল ছয় ঘণ্টার নিম্নে নামালে উৎপাদিত দ্রব্যের সংখ্যা না বেড়ে উহা কমতে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থাতে শ্রমিক ও মালিক সম-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এরূপ পরীক্ষা-নীরিক্ষা হতে বুঝা যায় যে, ফ্যাক্টরিতে কর্মকাল বাড়ানো বা কমানোর একটা শেষ সীমা আছে। উপরোক্ত ছয় ঘণ্টাব সিফ্টকে ঐ ফ্যাকটরির কর্মকাল কমানোর শেষ সীমা বলা যেতে পাবে। উপরোক্ত আট ঘণ্টাব সিফ্টকে ঐ ফ্যাক্টরিব কর্মকাল বাড়ানোর শেষ সীমা বলা যায। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকদেব যথেষ্ট রেস্ট্-পস্ দিয়েও কোন সুফল দেখা যায় না। কিন্তু তা ব'লে প্রতিটি শিল্পে [ভাবী ও হাল্কা] কর্মকাল বাড়ানোর বা কমানোব শেষ সীমা একরূপ হয না। কারণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পে শ্রমিকবা বিভিন্ন হাবে ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ' জন্য বিভিন্ন শিল্পেব বায়বিক ও মানসিক পবিবেশ এবং উহাতে প্রযুক্ত পবিশ্রম অনুযাযী ফ্যাকটবিব কর্মকাল বাড়ানোর বা কমানোব শেষ সীমা নিবারণ কবা উচিত হবে।

ফ্যাকটরির নির্দিষ্ট কর্মকালেব মধ্যে প্রকৃত কর্মকাল কতটুকু তা কর্তৃপক্ষকে সর্বাগ্রে অবগত হতে হবে। অন্যথায় তাহাদের পক্ষে ফ্যাকটরিব প্রশাসনিক গলদ বার কবা অসম্ভব। ফ্যাকটবিতে অব্যয়িত কর্মকালকে আমবা নষ্ট কাল বলি। ফ্যাকটরির নির্দিষ্ট কর্মকাল হতে এই নষ্ট কর্মকাল বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাহা প্রকৃত কর্মকাল। এইবাব এই নষ্ট কর্মকাল বাব করবাব পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যাক। সকলে জানে যে, ফ্যাকটরিতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সাথে কিছু কিছু বাতিল দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এই জন্য প্রথমে ঐ ফ্যাকটরিব নীট ফল বার করে নিতে হবে। ফ্যাকটরিব এই নীটফল নিম্নোক্ত উপায়ে বার কবা সম্ভব।

উৎকৃষ্ট দ্রব্য—৬০০

বাতিল দ্রব্য—৪০০

নীট ফল—২০০

[যে সকল ফ্যাকটরিতে একই প্রকারের ও আকারের দ্রব্যোৎপাদন হয় সেইখানে উপরোক্ত ভাবে নীটফল বার করা যায়। কিন্তু কয়েকটি ফ্যাকটরিতে বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এই ক্ষেত্রে ঐ সকল উৎকৃষ্ট ও বাতিল দ্রব্যের সংখ্যার বদলে উহাদের মোট মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই নীটফল উপরোক্ত পন্থাতে বার করতে হবে।]

ফ্যাকটরির নির্দিষ্ট কর্মকালের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মীর দ্বারা ঐ ফ্যাকটরির দ্রব্যোৎপাদনের নীটফল কিরূপ হওয়া উচিত—এই সম্বন্ধে সরজমিন তদন্ত দ্বারা আমাদের নির্ভুল ভাবে একটা ধারণা করে নিতে হবে। ঐ তুলনাতে কর্মশালাতে ঐ সময়ের মধ্যে ঐ সংখ্যক কর্মীদের পরিশ্রমের নীটফল কম হলে বুঝতে হবে যে ঐখানে বেশ কিছু শ্রমকাল অব্যয়িত হয়। এই অব্যয়িত কর্মকালকে আমি ফ্যাকটরির নষ্ট কর্মকাল বলেছি। এইভাবে প্রথমে নষ্টকাল বার করতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট কর্মকাল হতে উহার অংশ বিশেষ এই নষ্টকাল বাদ দিলে প্রকৃত কর্মকাল বার হবে।

নির্দিষ্ট কর্মকাল—৮ ঘণ্টা
নষ্ট কর্মকাল—৬ ঘণ্টা

প্রকৃত কর্মকাল—২ ঘণ্টা

কোনও ফ্যাকটরিতে প্রকৃত কর্মকাল সেখানকার নির্দিষ্ট কর্মকাল হতে অস্বাভাবিক ভাবে কম হলে বুঝতে হবে যে কোথাও ঘোরতর গলদ ঢুকেছে। এ ক্ষেত্রে হয় নির্দিষ্ট কর্মকাল কমাতে হবে, নয় উপযুক্ত বিশ্রামক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানে অনুপযুক্ত কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে কিনা তাও দেখা দরকার। মেসিনের দোষ-ত্রুটি এবং প্রশাসনিক গলদও এই দুরবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে।

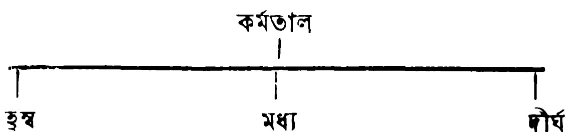
উদ্যোগ বা কুটীর-শিল্পের প্রকার ভেদে প্রথমে ফ্যাকটরিতে উচিতমত কর্মকাল নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু শ্রমকার্যে সফলতার জন্যে ঐ-রূপ কর্মকালের মধ্যেও শ্রমিকদের ফেটিগ লাঘবের জন্য উপযুক্ত বিশ্রাম-ক্ষণের (Rest-pause) ব্যবস্থা করতে হবে। এই রেস্ট্-পস্ সম্বন্ধে 'বিশ্রামক্ষণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমি সবিশেষ আলোচনা করেছি। এই ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এইভাবে শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত কর্মকাল নির্ধারণ করে এবং উহাদের কর্মের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রামক্ষণের ব্যবস্থা করে পরিশ্রমজাত ফেটিগ বিদূরিত করা যায়। কিন্তু এতদ্‌ব্যতিরেকে এমন আরও কয়েকটি পন্থা আছে যাহাদের সাহায্যে এই শ্রম-জাত ফেটিগ যাতে শীঘ্র না আসে তার ব্যবস্থা করা সম্ভব। এই সকল শ্রম সম্পর্কিত পন্থাগুলিকে যথাক্রমে কর্মচাতুর্য, কর্মে ক্ষিপ্রতা, কর্মতাল, স্বয়ংক্রিয়তা, কর্মলিপ্সা, বোরডম বা অবক্লান্তি, পৌনঃপুনিকতা, ভারসাম্য বা দৈহিক সমতা, দ্রব্যসমাবেশ, দ্রব্যাবস্থান প্রভৃতি বলা যেতে পারে। এক্ষণে উহাদের প্রত্যেকটির বিষয় নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করবো।

(ক) কর্মতাল :—শ্রমিকদের কর্মতালকে ইংরাজিতে রিথিম্ বলা হয়ে থাকে। শ্রমিকদের শ্রমকর্মে এই কর্মতাল অন্যতম সহায়ক। ইহা দ্বারা শ্রমিকদের দৈহিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়। ইহার ফলে পরিশ্রম করেও পরিশ্রম অনুভূত হয় না। নৃত্যের ভঙ্গিমাতে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে শ্রমকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ও তৎসহ পেশীসমূহের সঞ্চারণ দ্বারা যে রিথিমের সৃষ্টি হয় তাকে কর্মতাল বলা হয়। পেশীসমূহের বিভিন্ন অংশ পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে এই রিথিমের মধ্যে এক অব্যক্ত মাদকতা আনে। এই কর্মতাল শ্রমিকদের কর্মলিপ্সার (Incen-) অন্যতম সহায়ক। এই কর্মলিপ্সার সহিত মনের প্রত্যক্ষ সংযোগ

থাকায় উহা সহজে মানসিক ফেটিগও বিদূরিত করে। মাদক দ্রব্য সেবনের ন্যায় ইহা সাংসারিক ক্ষোভ ও দুঃখ কর্মকালে বিস্মৃত হতে সাহায্য করে। মানসিক উৎফুল্লতার সাথে ইহা সংশ্লিষ্ট থাকাতে উহা স্নায়বিক ফেটিগও বিদূরিত করে। এর ফলে বিপজ্জনক যন্ত্রে কর্মকালে ভয় বিদূরিত হয়। তৎজনিত তারা নার্ভাস ফেটিগ হতে রক্ষা পেয়ে থাকে। এই ভাবে শ্রমিকরা দৈহিক, স্নায়বিক ও মানসিক ফেটিগ বিদূরিত করতে পেরেছে। এই কর্মতাল বা রিথিম কর্মে দ্রুতগতি ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে।

শ্রমিকদের মানসিক, স্নায়বিক ও দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের উপর তাদের রিথিম বা কর্মতালের পরিমাণ নির্ভর করে। এইজন্যে শ্রমিকদের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রকার কর্মতাল দেখে থাকি। কাহারও কর্মতাল দ্রুতগতিতে, কাহারও মধ্যে উহা মধ্য মাত্রাতে এবং কাহারও ক্ষেত্রে উহা মিঠা তালে চলে। এই কর্মতালের কম বা বেশি গতি চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। কিন্তু তাদের এই রিথিমের গতির ছবি মুভিযন্ত্রে ফিল্‌মে তুলে নিলে উহার এই বিভিন্নতা বুঝা যায়। সাধারণ ভাবে এই কর্মতাল বা রিথিমকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) হ্রস্ব, (২) মধ্য ও (৩) দীর্ঘ। একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের পেশী-সমূহের সঞ্চালন কতবার হলো তার একটি মোটামুটি ধারণা করে এই সম্পর্কিত শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণী-বিভাগ হতে শ্রমিকদের কর্মের ক্ষিপ্রতা কিরূপ তা বুঝা যায়। শ্রমিকদের এই ক্ষিপ্রতা স্বল্প সময়ে অধিক দ্রব্যোৎপাদনের প্রধান সহায়ক।



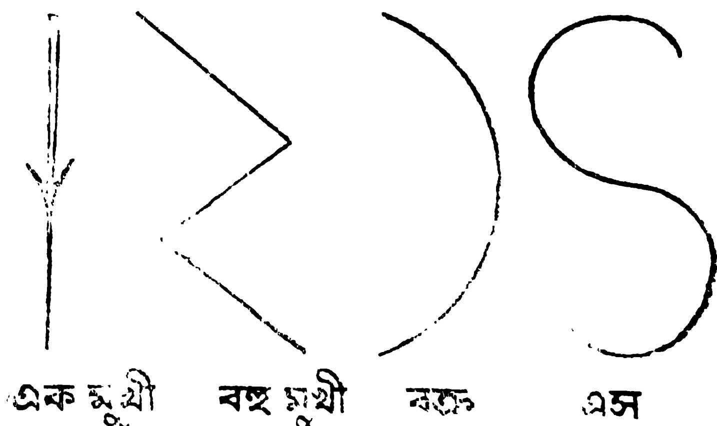
এই কর্মতালের বিভিন্নতার জন্যে যে শ্রমিক দ্রুতগতি সম্পন্ন মেসিনে ভালো কাজ দেখাতে পারে নি সেই শ্রমিক মন্থরগতি সম্পন্ন মেসিনে অতি উত্তম কাজ দেখাতে পেরেছে। প্রথমোক্ত শ্রমিকদের দ্রুতগতি সম্পন্ন রিথিম দ্রুতগতি মেসিনের সঙ্গে, দ্বিতীয়োক্ত শ্রমিকদের স্বল্পগতি রিথিম স্বল্পগতি মেসিনের সাথে এবং মধ্যগতি শ্রমিকদের কর্মতাল মধ্যগতি মেসিনের সঙ্গে সমতালে কাজ করে। এই ভাবে এই কর্মতাল বা রিথিমের সাহায্যে শ্রমিকরা তাদের স্ব স্ব মেসিনের গতির সাথে মিশে গিয়ে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে এর ফল অতি উত্তম হয়ে থাকে।

উদ্যোগ-শিল্পের মালিক ও তাদের তদারকী কর্মীরা মেসিন সমূহের জন্য শ্রমিক নির্বাচন কালে এই বিষয়ে মনোযোগী নন। এক মেসিনে দক্ষ কর্মীদের সেই মেসিন হতে অন্য মেসিনে বদলী করার কালে তাদের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। শ্রমিকদের কর্মতাল বা রিথিম পরীক্ষা করে তাদের উপযুক্ত যন্ত্রাদিতে নিয়োগ করলে সুফল হবে। এমন বহু মেসিন আছে যার গতির সাথে শ্রমিকদের হাত বা পা নাড়াতে বা চালাতে হয়। কিংবা তাদের আগে এগিয়ে পরে পিছিয়ে যেতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে মেসিনের গতির সাথে শ্রমিকদের স্বভাবগত কর্মতালের সামঞ্জস্য থাকার বিশেষ প্রয়োজন।

অন্যদিকে যে সকল শ্রমিক—প্যাডেলে মেসিন চালিয়ে হাতে দ্রব্যোৎপাদন করে, তাদের হাতের রিথিমের সাথে পায়ের রিথিমের সামঞ্জস্য থাকে। অন্যথায় তাদের পক্ষে স্বল্প কালে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদন করা অসম্ভব। মেসিন নির্বাচনের ভুল উত্তম কারিগরদের কর্মক্ষেত্রে অসফল হওয়ার প্রধান কারণ। বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের গতির সহিত শ্রমিকদের কর্মতাল তুলনা করে শ্রমিক নির্বাচন করা উচিত। আমি

বহু অসফল শ্রমিককে এক মেসিন হতে অপর মেসিনে এনে তাদের সফল শ্রমিক করে তুলতে পেরেছি।

ভারী দ্রব্যাদি বহনের কালে বা উহা টেনে আনতে একমুখী টানের অপেক্ষা বহুমুখী টানে কম পরিশ্রম হয়। সোজা সোজা ভাবে দ্রব্যাদি টেনে আনতে যে পরিশ্রম হয়, এঁকে বেঁকে উহা টেনে আনতে তদপেক্ষা কম পরিশ্রম হয়। এর কারণ একমুখী টানে এই কর্মতাল সৃষ্টি হয় না, কিন্তু বহুমুখী [আঁক বাঁকা] টানে প্রয়োজনীয় রিথিমের সৃষ্টি হয়েছে। কোলিয়ারি সমূহে কয়লা উত্তোলন কালে ইহা বিশেষ রূপে পরিদৃষ্ট হয়। [আসানসোলে ধেমোমেন কোলিয়ারিতে আমি ইহা পরিলক্ষ্য করেছি।] এতদ্‌ব্যতিবেকে হেঁচকা টানে ও একানা টানের মধ্যেও যথেষ্ট ফলগত প্রভেদ দেখা যায়।



পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, এই কর্মতাল বজায় থাকলে উৎকৃষ্ট

দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ত্রিশ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিকরা ভার বহন কালে মুখ হতে বহু উৎকৃষ্ট শব্দ বার করে, যথা—উ উ উ—উ! কিংবা তারা কর্মকালে গান গেয়ে বা ছড়া কেটে দৈহিক ও মানসিক কর্মতালের সৃষ্টি করে থাকে। এই কর্মতাল বা রিথিম সৃষ্টির কারণে পাল্কি-বাহকরা তারস্বরে বলতে থাকে—'হুকুমদারী' শালা বড় ভারী': আরোহীদেয় দুর্বোধ্য ভাষায় গাল দিয়ে তারা তাদের দৈহিক ও মানসিক অবক্লান্তি দূর করে। অন্যান্য শ্রমিকরা ভার উত্তোলন বা বহন কালে এই একই কারণে বিভিন্ন সুরে চেঁচিয়ে উঠে—'আউর থোড়া—হেঁইও। মারো ঠেলা—হেঁইও', ইত্যাদি। নদীতে জল মাপবার সময়ও মাঝি-মল্লাদেরও অনুরূপ বহু বচন আওড়াতে শুনা গিয়েছে। এই সকল কথাসমষ্টির সুর ও তালের সাথে সঙ্গতি রেখে অঙ্গ সঞ্চালন করে তারা প্রয়োজনীয় দৈহিক কর্মতাল সৃষ্টি করে শ্রমকে সহজ করে তুলে। দৈহিক, শারীরিক ও মানসিক অবক্লান্তি বিদূরণে শ্রমিকদের ইহা এক অমোঘ অস্ত্র।

[একক প্রচেষ্টার মত যৌথ প্রচেষ্টাতেও ভার উত্তোলন ও উহার আকর্ষণের কাজ করা হয়। একজন শ্রমিকের এই ধরনের কার্যের ফাঁকি সহজে ধরা যায়। বহুলোক একত্রে এই যৌথ কাজ করলে উহাদের কাজের ফাঁকি ধরা শক্ত হয়। যৌথ শ্রমের ক্ষেত্রে দুই-এক ব্যক্তি অন্যান্যদের মত সমান শক্তি প্রয়োগ করেনি। এরূপ ব্যবহারকে ঐ কাজে এদের কাজে ফাঁকি বা শ্রম-চুরি বলা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে যৌথ রিথিম ভেঙ্গে পড়ে কাজের তাল ভঙ্গ হয়। অভিজ্ঞ আদেশ-কারী সর্দার এই শ্রম-চুরি দূর হতে ধরে ফেলতে পারে। এই ক্ষেত্রে ঐ অসাধু শ্রমিকদের স্থান পরিবর্তন করে দিলে সুফল হবে। অন্যদিকে প্রতিটি শ্রমিক লম্বায় ও শক্তিতে সমান হয় না। এই জন্য শ্রমিকদের

দৈহিক দৈর্ঘ্য অনুযায়ী তাদের স্থান নির্ধারণ করে দিতে হবে। শক্তিমান শ্রমিকদের সম্মুখে ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রমিকদেব পিছনে [সারিতে] রাখা ভালো। বেঁটে শ্রমিকদের সম্মুখে এবং লম্বা শ্রমিকদের পিছনে রাখলে টানা দড়িতে একটি ঊর্ধ্বমুখী বাঁক [curve] সৃষ্টি হয়। এতে ভার উত্তোলনে, আকর্ষণে ও ঠেলার কাজে কম পরিশ্রম হয়ে থাকে।]

(খ) ভারসাম্য :—দৈহিক সমতা বা ভারসাম্য দ্বারা শ্রমিকরা তাদেব পরিশ্রমের লাঘব যথেষ্ট পরিমাণে করতে সক্ষম। দেহ একদিকে বেশি হেলে থাকলে শ্রমিকরা স্বল্পে পরিশ্রান্ত হয়েছে। পরক্ষণে উহা অপরদিকে অনুরূপ ভাবে হেলানোর দরকার। এতদ্ব্যতি-রেকে শ্রমিকদেব দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয় না। এই ভারসাম্যের অভ্যাস দেহকে সবল রেখে কর্ম করতে সাহায্য করে। এর ফলে দৈব দুর্ঘটনা প্রভৃতি বহুল সংখ্যায় কমে যায়। কর্মকালে সর্বক্ষণ দেহকে সরল রাখার জন্য পর্যায়ক্রমে ডানে ও বামে হেলা দরকার। কখনও ক্ষিপ্র গতিতে হেলে দুলে দৈহিক ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। দৈহিক ভারসাম্য রক্ষা একমাত্র অভ্যাস দ্বারা সম্ভব। বেশিক্ষণ ডানে বা বামে হেলে থাকলে দেহের মাত্র একাংশের উপর অধিক চাপ পড়ে। এই জন্য দেহের উভয় অংশকে সমান ভাবে কাজে লাগানো দরকার। এই ভাবে দেহের দুই অংশকে পর্যায়ক্রমে সমান বিশ্রাম দেওয়া যায়। এতে শ্রমিকরা সহজে ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। একাঙ্গিক কার্য অপেক্ষা দ্বিরাঙ্গিক [দ্বি-অঙ্গ] কাজ উত্তম হয়ে থাকে। এজন্য এক হাতে কাজ না করে দু' হাতে কাজ করা ভালো। এতে দৈহিক ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এই দ্বিরাঙ্গিক [**Bi-manual**] কার্য পরিশ্রমের লাঘব ঘটায়।

(গ) পৌনঃপুনিকতা :—একই প্রকার কাজ বারে বারে [পুনঃ পুনঃ] করলে উহাকে পৌনঃপুনিক কর্ম বলা হয়। পৌনঃপুনিক কর্মকে ইংরাজিতে রিপিটেটিভ্ ওআর্ক বলা হয়ে থাকে। পৌনঃপুনিকতা দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা (১) অঙ্গগত পৌনঃপুনিকতা এবং (২) কর্মগত পৌনঃপুনিকতা। শ্রমিকদের কর্মক্লান্তি কমানোর জন্যে এই উভয় প্রকার পৌনঃপুনিকতা সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

অঙ্গগত পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধে প্রথমে বলা যাক্। যে কোনও কর্মরত শ্রমিককে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তাদের একটি অঙ্গ কম বার এবং অপর অঙ্গ বহুবার সঞ্চালিত হচ্ছে। অর্থাৎ উহারা প্রতিটি অঙ্গ একত্রে [সমান ভাবে] বা পর্যায়ক্রমে কাজে লাগায় না। বহু ক্ষেত্রে ইহা কাজে অসুবিধা, মুদ্রাদোষ বা অভ্যাসজাত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে অঙ্গ-বিশেষের পৌনঃপুনিকতা নিবারণ বা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এক হাতে বা এক পায়ে বারে বারে কাজ না করে মধ্যে মধ্যে হাত বা পা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে, একটি মাত্র অঙ্গের উপর অত্যধিক চাপ পড়া ক্ষতিকর। এই জন্য পাল্কি-বাহকরা মধ্যে মধ্যে কাঁধ বদলিয়ে থাকে। অন্যান্য শ্রমিকরা এই কারণে মধ্যে মধ্যে হাত বদলিয়ে থাকে। দ্বিরাঙ্গিক বা দ্বি-আঙ্গিক (**Bi-manual**) কাজ-কর্ম আরও উত্তম। এজন্য সম্ভব হলে এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতে কাজ করা ভালো।

অঙ্গগত পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার কর্মগত পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধে বলবো। দৈনিক কর্মচক্রের [**cycle**] মধ্যে এমন কয়েকটি কাজ আছে যাহা মাত্র বিশবার করতে হয়। কিন্তু ঐগুলি সাধারণত ভারী ও দুরূহ কাজ হয়ে থাকে। আবার এমন কাজও আছে যাহা ঐ কর্মকালের মধ্যে আশিবার করতে হয়। কিন্তু সেগুলি

সংখ্যায় বেশি হলেও হাল্কা কাজ হয়ে থাকে। উপরন্তু ঐ সকল কাজে অপর আর এক সুবিধা থাকে। বারে বারে এক কাজ করলে ঐ কর্মে শ্রমিকগণ এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে উহা তাহারা অবলীলাক্রমে করে যেতে পারে। বহুল অভ্যাসের কারণে ঐ কর্মে তাদের এক প্রকার স্বয়ংক্রিয়তা [অটোমেটিস্‌ম্] এসে পড়ে। এর ফলে ঐ কাজে তাদের দৈহিক কর্মক্লান্তি—বিশেষ করে মানসিক ও স্নায়বিক কর্মক্লান্তি দেরিতে আসে। কিন্তু কর্ম-চক্রের মধ্যে পূর্বোক্ত কাজগুলি শ্রমিকরা মাত্র স্বল্পবার করাতে তারা এই স্বাভাবিক স্বয়ংক্রিয়তা অর্জন করে না। উপরন্তু এইগুলি ভারী কাজ হওয়াতে স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিকরা দৈহিক ও মানসিক কর্মক্লান্তিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এর প্রতিষেধক রূপে প্রথমোক্ত কাজগুলি দিবসের প্রথমে এবং শেষোক্ত কাজগুলি দিবসের শেষে করলে সুফল হয়। কর্মারম্ভের প্রথমে যে কর্মলিপ্সা ও কর্মশক্তি শ্রমিকদের থাকে তা উহার শেষার্ধে থাকে না। এই কর্মলিপ্সা ও কর্মশক্তির অভাব দিবসের শেষে শ্রমিকদের কর্ম-ক্লান্ত করে। ঐ সময় শ্রমিকরা বাটী ফিরবার জন্যে ব্যস্ত হওয়ায় তাদের মন উতলা হয়। কিন্তু দিবসের শেষার্ধে এই কর্মলিপ্সার অভাব শ্রমিকদের মধ্যে ঐ সময়ে আগত স্বয়ংক্রিয়তা পূরণ করে দেয়। এই ভাবে দিবসের প্রথমার্ধে কর্মলিপ্সা এবং উহার শেষার্ধে স্বয়ংক্রিয়তা শ্রমিকদের সাহায্য করে।

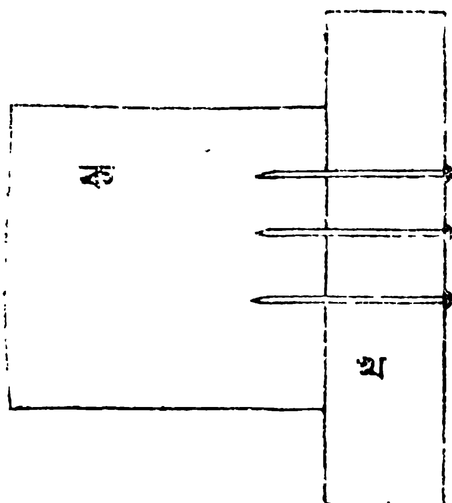
(ঘ) স্বয়ংক্রিয়তা:—মানুষ কোনও দৈহিক কাজ প্রতিনিয়ত উপর্যুপরি করে গেলে কিছুকাল পরে ঐ কাজের মধ্যে এক প্রকার দৈহিক স্বয়ংক্রিয়তা আসে। বারে বারে কোনও অঙ্গ নাচালে বা নাড়ালে পরে স্বল্পায়াসে বা অনায়াসে উহা আপনা হতে নড়তে বা নাচতে শুরু করে। এমন কি, উহা স্মরণ হওয়া মাত্র উহা আপনা হতে নড়ে বা নাচে। এইরূপ অবস্থার বৈজ্ঞানিক

নাম আঙ্গিক স্বয়ংক্রিয়তা। শ্রমিকদের পুনঃ পুনঃ কর্মজাত স্বয়ংক্রিয়তা স্বল্প পরিমাণে এলে উহা তাদের উপকারে আসে। কিন্তু অত্যধিক স্বয়ংক্রিয়তা স্নায়বিক রোগের সৃষ্টি করে। এই বিষয়ে শ্রমিকরা অভ্যস্ত হয়ে পড়লে ক্যান্টিনে বসেও তারা পা বা হাত নাচায়। এমতাবস্থাতে অকারণে তাদের মধ্যে দৈহিক ও স্নায়বিক কর্ম-ক্লান্তির সৃষ্টি হয়। এইজন্য এই বিষয়ে শ্রমিকদের মত মালিকদেরও সাবধান হয়ে এই রোগ সারানো উচিত।

কর্মশালা সমূহে দেখা গিয়েছে যে কর্মচক্রের মধ্যে কয়েকটি ভারী কাজ এবং কয়েকটি হাল্কা কাজ থাকে। এই ভারী কাজ সংখ্যায় কম এবং হাল্কা কাজ সংখ্যায় বেশি হয়। সাধারণ ভাবে বলা হয়ে থাকে যে, ভারী কাজগুলি দিবসের প্রথমার্ধে এবং হাল্কা কাজগুলি দিবসের পরার্ধে সমাধা করা ভালো। এর কারণ, দিবসের প্রথমার্ধে শ্রমিকদের মধ্যে কর্মলিপ্সা এবং উহার শেষার্ধে তাদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়তা থাকে। তবে এ কথাও ঠিক যে একটি ভারী কাজ দশটি হাল্কা কাজের সমতুল হতে পারে। এ'জন্য একটি হাল্কা কাজ পর পর দশবার সমাধা করলে উহাতে শ্রমিকগণ সমভাবেই পরিশ্রান্ত হয়। কিন্তু ঐ হাল্কা কাজ বহুবার করলে তাদের মধ্যে জাত স্বয়ংক্রিয়তা তাদের কর্মক্লান্তি কিছুটা উপশম করতে সক্ষম। এই বিতর্কমূলক বিষয়টিতে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। এই বিষয়ে আমি এখনও গবেষণারত আছি।

(৬) কর্মচাতুর্য :—কর্মচাতুর্যকে ইংরাজিতে ক্র্যাফটম্যানশিপ বলা হয়ে থাকে। এই কর্মচাতুর্য দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা (১) কায়িক ও (২) মানসিক। এই উভয় কর্মচাতুর্যই ভারতীয় শ্রমিকরা অভ্যাস দ্বারা অর্জন করে থাকে। প্রথমে কায়িক কর্মচাতুর্য

সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ভারতীয় শিল্পীদের এই কর্মচাতুর্য সম্বন্ধে য়ুরোপীয়দের বিশ্বাস করানো কঠিন। এমন কি, ভারতীয়রাও ভারতীয় শিল্পীদের এই অদ্ভুত কর্মচাতুর্যের বিষয় অবগত নন। বস্তু-তান্ত্রিক য়ুরোপীয়রা যন্ত্রের উৎকর্ষতার উপর এবং ভারতীয় শিল্পীরা তাদের ব্যবহার-চাতুর্যের উপর অধিক নির্ভরশীল। এই জন্য য়ুরোপীয়রা জটিল [complex] যন্ত্র-পাতি এবং ভারতীয়রা সহজ [simple] যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পক্ষপাতী। অতি সাধারণ যন্ত্রপাতি দ্বারা ভারতীয়রা যে কারুকার্য সৃষ্টি করেছে, য়ুরোপীয় শিল্পীরা তাদের উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে তা করতে আজও অক্ষম। সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদন অতি সাধারণ যন্ত্রপাতির দ্বারা দ্রুত-গতিতে তাদের বহুল সংখ্যায় করতে দেখে বহু যন্ত্রকুশলী বিদেশী বিস্মিত হয়েছে। ভাবতীয়রা প্রয়োজন মত সহজ যন্ত্র সরু বা মোটা করে তাতে দাঁত তুলে বা মুখ মুড়ে বা খাঁজ কেটে তা ব্যবহার করে থাকে। কর্ম-চাতুর্য দ্বারা কর্মক্লান্তি নিবাবণ করবার জন্যে পরিশ্রমকে লঘু করা সম্ভব। একটি হাতুড়ি বা ছেনি ধরবাব কায়দা বা বসবার বা দাঁড়াবার কায়দা [ভঙ্গি] জানা থাকলে অযথা দেহের ও মনের উপর চাপ পড়ে না। সামান্য একটি পেরেক পুতবারও নানা রূপ কায়দা-কানুন আছে। হাতুড়ির ঘা'য়ের চাপ কতটুকু পড়া উচিত তা আন্দাজ করে নিতে হয়। এমন কি, সরল চাপ ও বাঁকা চাপ, উপবে বা নীচে চাপ, জোবে বা আস্তে ঘা'র উপবও বহু কিছু নির্ভর করে। কর্মচাতুর্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। এইরূপ বহুবিধ উদাহরণ বাস্তব ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে।



উপরের চিত্রে 'ক' কাঠটি 'খ' কাঠের সাথে তিনটি পেরেক দ্বারা যুক্ত আছে। কোনও কারণে এই কাষ্ঠ দুইটি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হলো। কোনও অদক্ষ মিস্ত্রি হাঙ্গরমুখী সাঁড়াশী দিয়ে ঐ পেরেকের মুণ্ডগুলি ধরে উঠাবাব চেষ্টা করবে। কিন্তু ঐ পেরেকত্রয়ের মুণ্ডগুলি কাষ্ঠের সাথে কাপে-কাপে বসানো থাকায় উহাদের উঠানো সম্ভব নয়। ঐ পেরেকের মুণ্ডির চারিপাশের কাঠ কেটে বা কুরে তবে ঐ মুণ্ড হাঙ্গর-সাঁড়াশী দ্বারা আঁকড়ে ধরা সম্ভব। এতে ঐ 'ক' বা 'খ' কাষ্ঠখণ্ডটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বাতিল হতে পারে। এই ক্ষেত্রে কর্মকুশলী শ্রমিক একটি বাটালি ঐ উভয় কাষ্ঠের যুক্ত রেখার [suture] অভ্যন্তরে হাতুড়ির ঘায়ে বসালে এই উভয় কাষ্ঠ খণ্ড পেরেকসহ পরস্পর হতে সহজে বিচ্ছিন্ন হবে। এর পর ঐ পেরেক ত্রয়ের নীচের দিকে হাতুড়ির ঘা' মেরে 'খ' কাষ্ঠখণ্ড হতে উহাদের বহির্গত করা সম্ভব। ভারতীয়দের কায়িক কর্মচাতুর্য সম্বন্ধে

বলা হলো। এইবার উহাদের মানসিক কর্মচাতুর্য সম্বন্ধে আমি বলবো।

আমার দেখা এমন বহু দেশীয় শ্রমিক আছে যারা অভ্যাসগত ভাবে অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে। এই অতীন্দ্রিয়তাকে ইংরাজিতে হাইপার সেনসিবিলিটি [Hyper-sensibility] বলা হয়। এইরূপ অতীন্দ্রিয়তা আমরা দুই প্রকারে অর্জন করতে পারি, যথা—অভ্যাসদ্বারা এবং ইনষ্টিঙ্কটের সাহায্যে। এই অভ্যাসগত অতীন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করবো। এই অভ্যাসগত অতীন্দ্রিয়তা এদেশীয় বহু সুদক্ষ শিকারীর মধ্যেও দেখা গিয়েছে। অনেকে বাঘ না দেখেও তারা বলে দেবে যে নিকটে ঐ সময় ক'টি বাঘ এসেছে! অভ্যাস দ্বারা ঘ্রাণ সম্পর্কিত অতীন্দ্রিয়তা অর্জনই ইহার কারণ। সুদক্ষ শ্রমিকরা অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ঘ্রাণ, স্পর্শ, রূপ ও শব্দ সম্পর্কিত অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে। অপরের অশ্রুত অতি সূক্ষ্ম শব্দ এই হাইপার সেনসিবিলিটির কারণে তারা শুনতে পায়। এমন কি, একটি সূক্ষ্ম শব্দ হতে অপর এক সূক্ষ্ম শব্দের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রভেদও তারা বুঝে নেয়। এমন বহু মিস্ত্রি আছে যারা শুধু শব্দ শুনে বুঝতে পারে যে যন্ত্রের কোন অংশ খারাপ বা তা এখনই পরেই বিকল হয়ে যাবে। এদের কেউ কেউ শুধু চোখে দেখে ফোকরের মাপে রড্ বা রডের মাপে ফোকর কেটেছে। কিন্তু এই দুরূহ কাজ আন্দাজে করলেও তারা তাতে একটুকুও ভুল করে নি। মাইক্রোমিটার নামক সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে পরে দেখা গিয়েছে যে, ঐ মাপ একটু মাত্রও ছোট বা বড়ো হয় নি। অভ্যাস দ্বারা এমন প্রভেদ তারা দেখে ও বুঝে যা এত সূক্ষ্ম যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। উহা শুধু তারা অনুভব ক'রে সেই মত কাজ করে। তারা বহু দুরূহ কাজ লীলায়িত ভঙ্গিতে তাদের ছন্দোবদ্ধ হাতের সাহায্যে স্বল্পকালে নির্ভুল-

ভাবে করে থাকে। এদেশে ফ্যাকটরি সমূহের ডিরেকটার, মালিক ও ম্যানেজারদের এইরূপ মিস্ত্রিদের খুঁজে বার করে তাদের এতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা এই সকল বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। এই সকল সুদক্ষ কারিগরগণ বাহিরে ছোট-খাটো কারখানাতে যোগ দেয়। ফলে বড়ো কারখানার মালিকরা উন্নত যন্ত্রপাতির অধিকারী হয়েও ওদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হন। বহু ক্ষেত্রে কয়েক প্রকার যন্ত্র নির্মাণার্থে তাঁদের ওদের দ্বারস্থও হতে হয়। বহু ক্ষেত্রে তাদের তৈরি মেসিন বিলাতি মেসিনকেও হার মানায়। এই সকল মিস্ত্রি আমাদের দেশের গর্ব। কিন্তু তাদের খোঁজ মালিকদের মধ্যে কম ব্যক্তি রাখে।

শ্রমিকদের অভ্যাসগত অতীন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার উহাদের ইনষ্টিঙ্কট্‌গত অতীন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে বলা যাক। কোনও শ্রমিক শিল্পকার্যকে চাকুরিরূপে গ্রহণ না করে উহাকে বৃত্তি বা পেশা [প্রফেশন্] রূপে গ্রহণ করলে এই বিশেষ ইনষ্টিঙ্ক্ট-এর অধিকারী হতে পারেন। ইংরাজিতে ইহাকে প্রফেশন্যাল ইনষ্টিঙ্কট বলা যেতে পারে। অনেক উকিল, ডাক্তার, পুলিশকর্মী ও ব্যবসায়ীর মধ্যে এই ইনষ্টিঙ্কট্ বা সহজাত বৃত্তি দেখা যায়। বহু ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করার পূর্বে মাত্র তাকে দেখে বলে দিতে পেরেছন যে তার কি রোগ হয়েছে। পরে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁর এই মতামতে কোনও ভুল নেই। অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারদের সামনে দশটি গৃহ-ভৃত্যকে উপস্থিত করলে তিনি বলে দিতে পারেন যে, কোন্ ভৃত্যটি সেই দিনে সেই চৌর্য কার্য সমাধা করেছে। অনুরূপ ভাবে অভিজ্ঞ সুদক্ষ শ্রমিকরাও [মিস্ত্রি] যন্ত্রের শব্দ শুনে বা উৎপন্ন দ্রব্য দর্শন করে বলে দিতে পারে তার মধ্যে কোনও দোষ-ত্রুটি আছে কি'না !

পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের এই সব মতামত নির্ভুল রূপে প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য যে, এর মধ্যে কোনও অবৈজ্ঞানিক ইন্দ্রজাল নেই। অপরের অগোচর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শব্দ শুনে ও ইহাদের রূপ দেখে ঐ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পার্থক্য বহুদর্শী শ্রমিকদের অভিজ্ঞ কর্ণে বা চক্ষে ধরা পড়ে।

(চ) অবক্লান্তি :—অবক্লান্তিকে ইংরাজিতে বোরডম্ [Boredom] বলা হয়ে থাকে। ইহাকে চলতি ভাষাতে আমরা একঘেয়েমী বলে থাকি। ভালো লাগে না এমন কাজ বারে বারে করলে শ্রমিকরা এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইহা উহাদের মানসিক অবক্লান্তির অন্যতম কারণ। এই জন্য শ্রমিকদের অপছন্দকর কোনও কার্যে তাদের নিয়োগ করা উচিত নয়। এই এক-ঘেয়েমী হতে রক্ষা পাবার জন্য মধ্যে মধ্যে অন্যত্র মনোনিবেশ করতে হয়। এমন বহু কাজ আছে যাতে দক্ষতার কোনও প্রয়োজন নেই। কুশলী শ্রমিকদের ঐ সব কাজে নিয়োগ করলে তাদের মধ্যে একঘেয়েমী ভাব আসে। এর ফলে শ্রম-শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। শ্রমকার্যে বৈচিত্র্য থাকলে এই বোরডম্ উপগত হতে পারে না।

(ছ) কর্মলিপ্সা—কোনও কর্মেতে [স্বতঃপ্রবৃত্ত] ঝোঁক বা টেম্পোকে কর্মলিপ্সা [incentive] বলা হয়ে থাকে। কর্মলিপ্সা শ্রমিক-বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য পরিভাষা। কবিদের অন্তর্নিহিত প্রেরণার মত শ্রমিকদের মধ্যেও এক প্রকার কর্মপ্রেরণা আসে। ঐ সময় তারা আনন্দোৎফুল্ল ভাবে আত্মহারা হয়ে স্ব স্ব কর্মে আত্মনিয়োগ করে। কর্মকালে কোথা হতে কেমন করে সময় অতিবাহিত হয় তারা তা' বুঝেও বুঝতে পারে না। এক প্রকার সৃষ্টির আনন্দ তাদের দেহ ও মনকে এই সময় ভরপুর করে তোলে। এই সময় তারা একাগ্রচিত্ত-ভাবে তাদের মনোনীত কাজ সুষ্ঠুভাবে না করে মনে শান্তি পায় না।

এই সময় ঐ নির্দিষ্ট কর্ম ব্যতিরেকে অন্য কাজে তারা মনোনিবেশ করতে চায় নি। ঐ একটি কর্মের মধ্যে তাদের মন এমন কেন্দ্রীভূত হয় যে কোনও প্রকার কর্মক্লান্তি বা ক্ষুধা-তৃষ্ণা পর্যন্ত সহজে তাদের অভিভূত করতে পারে না। তারা তখন অনাবিল গতিতে এই একটি মাত্র কাজে আত্মনিয়োগ করে ও এতে সামান্য মাত্র বিঘ্ন এলে তা তাদের বিরক্তির কারণ ঘটায়।

কার্যকালে শ্রমিকদের এই কর্মলিপ্সা একটানা ভাবে বহুক্ষণ কার্যকরী হয়। কিন্তু মধ্যে বহুক্ষণ কর্মে ছেদ পড়লে ধীরে ধীরে উহার অবসান হয়। উহা সম্পূর্ণ রূপে অবসানের পূর্বে পুনরায় কর্মরত না হলে উহা নূতন করে অর্জন করার প্রয়োজন হয়। এই জন্য কর্মের মধ্যে স্বল্পক্ষণ বিশ্রাম-কাল নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই বিশ্রাম-কাল অধিকক্ষণ হলে এই কর্মলিপ্সা পুনরায় অর্জন করতে যথেষ্ট সময় লাগে। কখনও কখনও উহা পুনরায় অর্জন করা কঠিন হয় কিংবা আদপে উহা সম্ভব হয় না। এইজন্য বিশ্রাম-কাল বা রেস্ট পস্ এই কর্মলিপ্সার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রদান করা উচিত।

অবক্লান্তি [একঘেয়েমী ভাব] বা বোরডম-এর সাথে এই কর্মলিপ্সার তফাৎ আছে। শ্রমিকরা অবক্লান্তিতে [Boredom] আক্রান্ত হলে তাদের মন পুরানো কর্ম ছেড়ে নূতন কর্ম করতে চায়। কিন্তু কর্ম-লিপ্সা শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কর্মসূচী হতে একটুও বিচ্যুত হতে দেয় না। কোনও কার্য শ্রমিকদের মনোনীত না হলে কিংবা তাদের অমনোনীত কার্য করতে বাধ্য করলে উহাদের মধ্যে এই বোরডম-এর উৎপত্তি হয়। এই বোরডমের নিবৃত্তির জন্য শ্রমিকদের কর্মসম্পর্কিত পছন্দ-অপছন্দর একটা নির্ভুল সমীক্ষা করা উচিত। তাদের আপন পছন্দ মত কর্মে নিয়োগ করলে এই বোরডমের বদলে কর্মলিপ্সার উৎপত্তি

হয়। কিছুক্ষণের জন্য শ্রমিকদের মন অন্যত্র নিক্ষেপ করলে এই বোরডম্ হতে তারা অব্যাহতি পেতে পারে। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ বাহিরে পায়চারি করলে বা ক্লাবে বা ক্যান্টিনে গল্প-গুজব করলে এই বোরডমের নিরসন হয়। অবশ্য এই সুযোগ একমাত্র বিশ্রাম কালের সময়ে এরা পেতে পারে। এই জন্য প্রতিটি ফ্যাকটরিতে অবসর বিনোদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা কবার প্রয়োজন। এই কর্মলিপ্সা এবং বোরডম্-এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান না করলে বা অবিবেচনার সাথে উহা নষ্ট করে দিলে কিরূপ কুফল হয় তা' নিম্নের দৃষ্টান্ত হতে বুঝা যাবে।

'কোনও একটি ফ্যাকটরিতে কয়েকজন বালক শ্রমিক একত্রে কাজ করতো। এরা প্রত্যেকে সেখানে যথাক্রমে ঔষধাদি বোতলে ভর্তি করা ও ঐ সকল বোতলে লেবেল লাগানো এবং উহাদের প্যাক করার কাজ করতো। এই সব কাজ সমাধা করার পর তারা সেগুলো গাড়িতে তুলে দিতো। জনৈক নূতন ম্যানেজার এসে এক দল বালককে এক একটি কাজে নিয়োগ করলো। অর্থাৎ এদের কেউ প্যাকিং, কেউ বা লেবেলিং, কেউ ঔষধ ভর্তিতে, আবার কেউ বা গাড়িতে তুলার কাজ করতে থাকে। এই নূতন ব্যবস্থাতে সেখানে বৈচিত্র্যহীন কর্মের আধিক্য ঘটে। ঐ ভাবে কর্মের শ্রেণী বিভাগ করার পর দেখা যায় যে ঘণ্টা পিছু ফিনিসড্ গুড্সের [তৈরি দ্রব্য] সংখ্যা শতকরা ত্রিশ ভাগ কমে গিয়েছে।'

পূর্ব ব্যবস্থাতে একই কর্মিদল পর পর বিভিন্ন কাজ করাতে এদের মধ্যে বোরডম্ আসতো না। অন্যদিকে ঐগুলি একই কাজের বিভিন্ন শাখা হওয়ায় তাদের কর্মলিপ্সারও হানি ঘটতো না। কিন্তু নূতন ব্যবস্থাতে একই প্রকার [বৈচিত্র্যহীন] কর্মে এরা লিপ্ত থাকাতে এদের মধ্যে বোরডম্ আসে। এই জন্য এই সময় ফ্যাকটরির কাজে ঐরূপ অবনতি ঘটে।

এই কর্মলিপ্সার সাথে বোরডমের যেমন সম্পর্ক আছে, তেমনি

উহার সাথে স্বয়ংক্রিয়তারও সম্পর্ক আছে। এই জন্য উহাদের মধ্যে সাবধানে সামঞ্জস্য আনা দরকার। আমার মতে ওই বিষয়ে গবেষণার একটি বিরাট ক্ষেত্র আছে। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব গবেষণা এখনও শেষ হয় নি।

[শ্রমিকদের মধ্যে পরিদৃষ্ট কর্মলিপ্সা এবং স্বয়ংক্রিয়তা রূপ দুইটি বৃত্তির মধ্যেও প্রগাঢ় সহযোগিতা আছে ব'লে আমার মনে হয়। আমি কয়েকটি উদ্যোগ শিল্পের এবং আমার নিজস্ব কুটির-শিল্পের কর্মীদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অবগত হয়েছি যে, দিবসের প্রথমার্ধে এই কর্মলিপ্সা এবং উহার পরার্ধে স্বয়ংক্রিয়তা শ্রমিকদের শ্রমের লাঘব করে। এই কর্মলিপ্সা কর্মে আসামাত্র স্বয়ংক্রিয়তা তার স্থান গ্রহণ করেছে। এই কর্মলিপ্সা ও স্বয়ংক্রিয়তা শ্রমিকদের শ্রমের লাঘব করে কর্মক্লান্তি বা ফেটিগকে বহুক্ষণ ঠেকাতে পেরেছে। শ্রমশিল্পে প্রকৃতিরানীর ইহা এক অমোঘ কল্যাণকর ব্যবস্থা। দিবসের প্রথমার্ধে কর্মলিপ্সা উদ্ভূত অনাবিল [পুনঃ পুনঃ] কর্ম উহার শেষার্ধে শ্রমিক-দেহে স্বয়ংক্রিয়তা আনে। এই স্বয়ংক্রিয়তা আসার সাথে সাথে কর্মলিপ্সা ধীরে ধীরে কমে আসে। কিংবা এও বলা যায় যে কর্মলিপ্সার অবসানের সাথে সাথে শ্রমিক-দেহে এই স্বয়ংক্রিয়তা উদ্ভূত হতে থাকে। এই কর্মলিপ্সা ও স্বয়ংক্রিয়তার আগমন নির্গমনের রীতি-নীতি সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট গবেষণা করে উপরোক্ত রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।]

(জ) ক্ষিপ্রতা :—শ্রমকার্যে দ্রুত গতিতে অথচ সাবধানে দ্রব্যোৎপাদন করার প্রয়োজন হয়। শ্রম-শিল্পে এই গতির উপর অধিক দ্রব্যোৎপাদন নির্ভর করে। এই জন্য শ্রম-শিল্পে গতির প্রশ্ন সর্বাগ্রে এসে থাকে। শ্রম-শিল্পে উহা সর্বদা প্রাধান্য লাভ করে। এই ক্ষিপ্রতার সাথে কর্মচাতুর্য, বিচার-শক্তি এবং কর্মতালের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে। কর্মচাতুর্য, বিচার-

শক্তি এবং কর্মতাল বিহীন ক্ষিপ্রতা দৈব দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এই ক্ষিপ্রতা সাধারণতঃ অভ্যাস সাপেক্ষ হয়ে থাকে। কিন্তু শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক গঠনের উপর ইহার উৎকর্ষতা নির্ভর করে। অধিক ক্ষেত্রে মেদবহুল শ্রমিকরা প্রয়োজনীয় ক্ষিপ্রতার অধিকারী হয় না। উপরন্তু কর্মকেন্দ্রে অধিক স্থান এরা অধিকার ক'রে এরা বহু প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করে। ফ্যাক্টরি সমূহে দৈব দুর্ঘটনা সঙ্ঘটনের ইহাও অন্যতম কারণ। শ্রমকালে শ্রমিকদের পরিক্রমণ [Movement] নির্দিষ্ট স্থানে ও পথে সুসংযত থাকা উচিত। প্রয়োজন হলে এই স্থান ও পথ পরিবর্তন ক্ষিপ্রতার সাথে সমাধা করতে হবে। উপরন্তু উহা তাদের দ্বারা ব্যবহৃত যন্ত্রের গতি ও উহা হতে দ্রব্য পাতের [তৈরি দ্রব্য] সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। যন্ত্র হতে নিষ্ক্রান্ত দ্রব্যের পতনের স্থান ঐরূপ পরিক্রমণে দ্রুত পরিহার করার কৌশল অভ্যাস দ্বারা শ্রমিকদের অর্জন করতে হয়। শিল্প-কার্যে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে উপর্যুপরি কয়েকবার দ্রুত পরিক্রমণের প্রয়োজন হয়। এক হতে অপর কার্যে আত্মনিয়োগ কালে উহা যথাসাধ্য সহজসাধ্য ভাবে করা উচিত।

শ্রম-শিল্পে কয়েকটি শিল্প-কার্যে কার্যারম্ভের সাথে সাথে এই ক্ষিপ্রতা [ক্ষিপ্রগতি] আনা হয়ে থাকে। কিন্তু সকল প্রকার কাজে এই ক্ষিপ্রগতি শুরুতে আনা সম্ভব নয়। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ চুল-চেরা মাপের কার্যের বিষয় বলা যেতে পারে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং চুলচেরা [Accurate] দুরূহ কাযে সাবধানে পরিক্রমণ করতে হয়ে থাকে কিংবা উহাতে বারে বারে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই সব কাজে প্রথমে ধীরে সুস্থে [slowly] কার্যারম্ভের পর [অভ্যস্ত হয়ে] পরে ঐ সকল কার্যের গতি বাড়ানো উচিত হবে।

ইহার বিপরীত ব্যবস্থাতে দৈব দুর্ঘটনা আনে এবং তৎসহ উহা বাতিল দ্রব্যের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়।

(ঝ) স্বাতন্ত্র্য-বোধ :—সাধারণতঃ কুশলী শ্রমিকরা তাদের স্ব স্ব কর্ম-রীতি অনুযায়ী কাজ-কর্ম করার পক্ষপাতী। ইহারা স্ব স্ব কার্যরীতিতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থাকে। আপন আপন সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি এবং অভ্যাস মত এরা এই স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। অবশ্য স্ব স্ব গুরুর শিক্ষা-দীক্ষাও ইহা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করেছে। একই রীতিতে কার্য করা এদের পক্ষে বড়ো অসুবিধাকর। এজন্য এদের প্রত্যেকের কর্ম-পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের হয়। এদের কর্মের পন্থা ও রীতির মধ্যে মাত্র প্রভেদ দেখা যায়। উৎপাদনের পথ ও মত বিভিন্ন হলেও এরা একই আকারের ও প্রকারের দ্রব্য তৈরি করতে সক্ষম। সাধারণতঃ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কাজ-কর্মে শ্রমিকদের মধ্যে এই স্বতন্ত্রতা-বোধ উগ্র ভাবে দেখা যায়। ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে কায়িক পরিশ্রমে ওই স্বতন্ত্র স্পৃহার অবস্থান বিশেষ রূপে স্বীকার্য। এইরূপ উৎপাদনে ব্যয়িত সময়ের বিশেষ তারতম্য ঘটে না। প্রায় একই সময়ে তারা তাদের নির্দিষ্ট কার্য সমাধা করেছে। এই জন্য কৌশলী শ্রমিকদের কার্যের গতি নিরূপণার্থে সময় অনুধাবন করা [Timing] অনুচিত। এতে তারা বিরক্ত হয়ে থাকে এবং তৎজনিত বাতিল দ্রব্যের সৃষ্টি হয়।

উপরোক্ত কার্যে শ্রমিকদের স্ব স্ব কার্যরীতিতে এবং তৎকালে ব্যয়িত সময়ের মধ্যে অতি-সমতা আনার চেষ্টা করা অনুচিত। শ্রমিক-দের নিজেদের সামর্থ্য ও স্পৃহা অনুযায়ী ঐ সকল কাজ করতে দিলে ফল ভালো হয়। অবশ্য কয়েকটি স্থূল কার্যে সম্ভব মত একীভূত কর্ম ধারাতে [Standardization] শ্রমিকদের অভ্যস্ত করা যেতে পারে। এই একীভূত কর্মধারাকে শ্রমিক-বিজ্ঞানের পরি-ভাষায় একৈকনিকতা

বলা হয়ে থাকে। কুশলী শ্রমিকরা তাদের কর্মরীতির মধ্যে এই ঐকৈকনিকতার বিরোধী হলেও তারা তাদের তৈরি দ্রব্যের মধ্যে ঐকৈকনিকতা আনতে সক্ষম। এইজন্য তাদের স্ব স্ব কর্মরীতিতে কারুর বাধা দেওয়া উচিত হবে না।

বহু মালিকের ও ম্যানেজারের ধারণা যে জিমন্যাস্টস্ এবং আর্মিম্যানদের মত প্রত্যেক শ্রমিকের কর্মরীতির মধ্যেও এই ঐকৈকনিকতা আনা যেতে পারে। এরা মনে করে যে আর্মিম্যান ও জিমন্যাস্টদের ক্ষেত্রে যাহা সম্ভব তা সকল প্রকার শ্রমিকদের মধ্যে সম্ভব হবে না কেন? কিন্তু কোনও দেশের শ্রম-শিল্পে শ্রমিকদের কর্মরীতির মধ্যে অনুরূপ ঐকৈকনিকতা আনা সম্ভব হয় নি। জিমন্যাস্টদের কসরৎ এবং সৈনিকদের কুচ-কাওয়াজ নিবিষ্ট মনে অনুধাবন করলে উহাদেরও ব্যক্তিগত পরিক্রমণে বহুবিধ প্রভেদ দেখা যায়। জীব-জন্তুদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে যে একটা সীমার ওপারে তাদের মধ্যে এই ঐকৈকনিকতা আনার প্রচেষ্টা তারা সবশক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করেছে। প্যাভলভ সাহেব ইহাকে ফ্রিডম্ রিফ্লেক্স নামে অভিহিত করেছেন। বাংলা ভাষায় ইহাকে স্বাতন্ত্র্য-প্রীতি বলা যেতে পারে। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার স্পৃহা জন্তুদের মত মানুষ তথা শ্রমিকদের মধ্যেও দেখা যায়।

[শ্রমশিল্পে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শ্রম-কাযে প্রাইভেট সেকটরের মালিকরা শ্রমিকদের এই স্বাতন্ত্র্য-বোধের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করেন না। একান্ত প্রয়োজনে তারা বর্ধিত বেতন দ্বারা বশীভূত করে এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ঐকৈকনিকতা আনতে চেষ্টা করেছেন। শ্রমিকরা লোভে পড়ে সহযোগিতা [স্ব-ইচ্ছাতে] করাতে এদের মধ্যে আংশিক ঐকৈকনিকতা আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু পাবলিক সেকটরের

কর্মকর্তারা এদের এই স্বাধীনতা হরণ করে জোর জবরদস্তিতে সামগ্রিক ভাবে এই ঐকৈকনিকতা আনতে প্রয়াস পান। মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবোধ বন্দীশালাতেও মরে না। ফলে বহু কুশলী শ্রমিক অযথা মানসিক অবক্লান্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তারা তাদের স্বকীয় কর্মচাতুর্য হারিয়ে কর্মের মধ্যে মন্থর গতি এনেছে। কেহ বা এজন্য দৈব দুর্ঘটনাতে পতিত হয়েছে। পাবলিক সেকটরের কর্মকর্তারা লাভালাভের বিষয় না ভেবে নিয়মতান্ত্রিকতার উপর অধিক প্রাধান্য দেন। এই জন্য তাঁদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাতে এইরূপ ত্রুটি দেখা যায়। এই সম্পর্কে পরে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন শীর্ষক নিবন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো। বর্তমান প্রবন্ধে উহাদের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।]

(ঞ) দ্রব্যাবস্থান—কর্মশালায় দ্রব্যাবস্থানের উপর বহুল সংখ্যায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন বিশেষ রূপে নির্ভর করে। কর্মস্থান হতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য [কাঁচামাল] এবং যন্ত্র নাগালের বাইরে থাকলে শ্রমিকদের বহু শ্রমক্ষণ ও কর্মশক্তির বৃথা অপচয় হয়ে থাকে। সময়ের অপচয়ের বিষয় বাদ দিলেও তারা বারে বারে দৌড়াদৌড়ি করে অকারণে অবক্লান্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। কর্মীদের হাতের নাগালের মধ্যে দ্রব্য ও যন্ত্রাদি থাকলে একদিক হতে উহাদের শ্রমের লাঘব হয়, অপর দিক হতে দ্রুত গতিতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি উৎপন্ন হতে পারে। প্রায় দেখা গিয়েছে যে দ্রব্য নির্মাণ, প্যাকিং [বস্তাবন্দি], একত্রীকরণ [অ্যাসেমব্লিং], মেরামতি প্রভৃতি কাজে শ্রমিকদের বারে বারে যন্ত্র ও দ্রব্যের জন্য কষ্ট করে দূরে হস্ত প্রসারিত করতে হয়েছে। এই ভাবে প্রতি ঘণ্টায় একশবার জোর করে নাগালের ওপারে হস্ত প্রসারিত করলে শ্রমিকরা সহজে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এখানে এই এক ইঞ্চি এক

ফুটের বারো ভাগের মাত্র এক ভাগ নয়। এখানে শ্রমিকদের হাতের নাগালের বাইরে অতিরিক্ত এক ইঞ্চি পরিমিত দূরত্বের প্রশ্ন উঠে না। এখানে প্রশ্ন হবে ঐ শ্রমিককে কতোবার তার হাতের নাগালের ওপারে এক ইঞ্চি হস্ত প্রসারিত করতে হয়েছে। এইরূপ এক একটি ইঞ্চি দিবসের শেষে একত্রিত করে যোগ করলে উহার মাপ এক মাইল দীর্ঘ হয়ে উঠতে পারে। দ্রব্যাবস্থানের অব্যবস্থাতে শ্রমিককে এই ভাবে দৈনিক কয়েক হাজার বার তার নাগালের বাইরে হস্ত প্রসারিত করতে হয়েছে। এই ভাবে দেহের ও অঙ্গের অযথা সঞ্চালন শ্রমশিল্পের প্রভূত ক্ষতিকারক হয়। দিবসের প্রথম দিকে এই অসুবিধা শ্রমিকরা খুব বেশি গ্রাহ্য করে না। কিন্তু দিবসের শেষার্ধে এই বাড়তি পরিশ্রম তাদের উত্ত্যক্ত করে তোলে। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের সকল সময়েই অসহায় দেখা যায়।

সাধারণতঃ শ্রমিকদের আকৃতি ও ব্যবহার হতে তাদের এই অসুবিধা বুঝা যায় না। তারা এই সকল অসুবিধাতে এমন অভ্যস্ত যে তারা ঐ জন্যে কখনও অভিযোগে মুখর হয় নি। এ বিষয়ে তার উপর কিরূপ অবিচার হ'চ্ছে তা সে নিজেই জানে না। আপাত দৃষ্টিতে তার কাজ-কর্মেও কোনও গাফলতি ধরা পড়ে না। কর্মে নিযুক্ত হওয়ার প্রথম দিন হতে সে এই একই অসুবিধা ভোগ করে এসেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করে বলে দিতে পারেন যে এই কু-ব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিক সমভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অথচ সামান্য উন্নত ব্যবস্থায় আরও কম সময়ে আরও অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হতে পারতো। পিস রেট্ বা ফুরনের কাজে শ্রমিকরা আরও বেশি অর্থ উপায় করতে পারতো এবং ঐভাবে অধিক পরিশ্রম জনিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য অযথা ভেঙে পড়তো না। মালিকরা হাতে-কলমে নিজেরা কাজ না করলে

শ্রমিকদের এই অসুবিধা কোনও দিনই বুঝতে পারবেন না। একই প্রকারের অসুবিধা বারে বারে ভোগ করলে শ্রমিকদের মন স্বভাবতই বিরূপ হয়ে উঠে। এবং সেই তুলনাতে এক এক প্রকার অসুবিধা এক এক বার ভোগ করলে তারা ততো বিরক্ত হয় না।

এই কুব্যবস্থা থেকে দেশের শিল্পকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও যন্ত্রের এবং শ্রমিকদের মধ্যে যথাসম্ভব নৈকট্য আনতে হবে। এই নৈকট্য এমন হওয়া চাই যে স্বস্থান হ'তে হাত বাড়ালেই প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও যন্ত্র স্বল্পায়াসে আহরণ করা যেতে পারে। কর্মরত শ্রমিকদের বসিবার স্থানের দুই ধারে অর্ধচন্দ্রাকৃতি দুইটি সেল্‌ফ বা তাক স্থাপন করে এই অসুবিধা দূর করা যেতে পারে। এই সেল্‌ফগুলি খুব উঁচু বা খুব নীচু হলে অসুবিধা পূর্বাপর থেকে যেতে পারে। এ দেশে একমাত্র ঘড়ি মেরামতকারীরা ও মুদ্রণ-শিল্পীরা এইরূপ সুব্যবস্থা ভোগ করে থাকেন। এই ব্যবস্থায় বাড়তি খরচ যে বেশি হয় তা নয়। কিন্তু বহু মালিক দৃষ্টি-কৃপণতার জন্য এদিকে দৃষ্টি দেন নি।

(ট) দ্রব্য-সমাবেশ :—ফেটিগ বা কর্মক্লান্তি নিবারণের জন্যে সুষ্ঠু দ্রব্যাবস্থানের মত সুষ্ঠু দ্রব্য-সমাবেশের প্রয়োজন আছে। দ্রব্যাবস্থান ভালো হলে শ্রমিকরা সহজে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা ক্ষুদ্র যন্ত্র [Tools] আহরণ করতে পারে। সুষ্ঠু দ্রব্য-সমাবেশ ঐ দ্রব্য বা ক্ষুদ্র যন্ত্র কোথায় আছে তা তাদের জানিয়ে দেয়। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা ক্ষুদ্র যন্ত্র খুঁজে বার করবার জন্য যথেষ্ট সময়ের অপচয় হয়ে থাকে। উপরন্তু হাতের কাছে হাতিয়ার না পাওয়ায় শ্রমিকদের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সময়ের এই অযথা অপচয়ের জন্য মালিকদের ন্যায় শ্রমিকদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। পিস রেট্‌ বা ফুরনের কাজে ইহা বিশেষ রূপে সত্য। এজন্য ফ্যাকটরিতে খোপ যুক্ত র‍্যাকের ব্যবস্থা করা উচিত।

৬

দ্রব্যোৎপাদন

ফ্যাকটরি সমূহে স্বল্পকালে [দ্রুত গতিতে] সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের জন্য শ্রম-কার্য করা হয়ে থাকে। এই শ্রমকার্য দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা, যান্ত্রিক শ্রম এবং কায়িক শ্রম। উদ্যোগ এবং কুটির-শিল্পে দ্রব্যোৎপাদনের জন্য দৈহিক ও যান্ত্রিক উভয় প্রকার শ্রম-কার্য করা হয়। বিদ্যুৎ বা বাষ্প চালিত যন্ত্রের সাহায্যে দ্রব্যোৎপাদনের জন্য ব্যয়িত শ্রম-কার্যকে যান্ত্রিক শ্রম বলা হয়। ফ্যাকটরিতে হস্ত-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে ঐ কার্যের জন্য ব্যয়িত শ্রমকেও যান্ত্রিক-শ্রম বলা হয়। যান্ত্রিক শ্রমের বিষয় বলা হলো। এইবার দৈহিক শ্রমের বিষয় বলবো। নানাবিধ ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বারা [Tool] কিংবা দৈহিক শক্তিতে কৃত ঐরূপ শ্রম-কার্যকে দৈহিক শ্রম বলা হয়। বাটালি, ছেনি, মাইক্রোমিটার, হাতুড়ি, বিবিধ প্রকার ড্রিল ও রেঞ্চ, স্ক্রু-ড্রাইভার, কর্নিক, ঝুড়ি, কোদালী, সাবল, গাঁতী, স্কেল, করাত প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র যন্ত্র বলা হয়।

দৈহিক বা যান্ত্রিক যে কোনও শ্রম হউক না কেন, উহা মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে, যথা, উৎপাদক শ্রম এবং অনুৎপাদক শ্রম। ইংরাজিতে উহাদের যথাক্রমে প্রোডাকটিভ্ লেবার ও আন-প্রোডাকটিভ লেবার বলা হয়ে থাকে। কর্নিকের সাহায্যে রাজমিস্ত্রির প্রত্যক্ষ রূপে দেওয়াল গাঁথাতে ব্যয়িত শ্রমকে উৎপাদক শ্রম বলা হয়। কিন্তু গাঁথুনির জন্য মশলা তৈরি, ইষ্টক বহন এবং ঐগুলি রাজমিস্ত্রীর নাগালের মধ্যে

পৌঁছুনোর জন্য ব্যয়িত শ্রমকে অনুৎপাদক শ্রম বলা হয়। কোনও মেসিনের সাহায্যে প্রত্যক্ষ রূপে দ্রব্যোৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমকে বলা হয় উৎপাদক শ্রম। কিন্তু ঐ মেসিনে কাঁচা মাল সরবরাহের জন্য ব্যয়িত শ্রমকে অনুৎপাদক শ্রম বলা হয়। ঐ মেসিনে দ্রব্যোৎপাদনের জন্য পরিপূরক অন্য দ্রব্যাদি তৈরি ও উহা যোগানের জন্য ব্যয়িত শ্রমকেও অনুৎপাদক শ্রম বলা হয়। এই বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলার দরকার আছে। তাঁতে প্রত্যক্ষ রূপে বস্ত্র বয়নের কার্যকে উৎপাদক শ্রম বলা হয়। কিন্তু উহার জন্যে প্রথমে রিল তৈরি করে বিম তৈরি করা হয়। এই রিল ও বিম যন্ত্রে বা হাতে তৈরি হলেও ঐ কার্যকে অনুৎপাদক শ্রম বলা হয়। এইরূপে সৃষ্ট দ্রব্যকে আনুসঙ্গিক বা পরিপূরক দ্রব্য বলা হয়। এই সকল পরি-পূরক [বিম আদি] দ্রব্য তাঁতীর জন্য তার তাঁতের নিকট বহন করে নেওয়ার জন্য ব্যয়িত শ্রমকে বলা হবে অনুৎপাদক শ্রম। যান্ত্রিক শ্রমের মধ্যে কর্মকুশলতা বা কর্ম-চাতুর্য পরিদর্শনের সুযোগ কম। কিন্তু দৈহিক শ্রমে ঐ সকল গুণাগুণ প্রয়োগের সুযোগ অধিক থাকে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে যান্ত্রিক-শ্রমের সাথে উৎপাদক শ্রমের এবং দৈহিক শ্রমের সাথে অনুৎপাদক শ্রমের সম্পর্ক অধিক থাকে। সাধা-রণতঃ দৈহিক শ্রমিকরা দৈহিক বলের সাথে সাথে তাদের কাজে ক্ষুদ্র যন্ত্রাদির সাহায্য নিয়েছে। যারা একত্রে উৎপাদক এবং অনুৎপাদক শ্রম-কার্য করে তারাও ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

আধুনিক উদ্যোগ শিল্পে [সম্ভব মত] একদল শ্রমিক অনুৎপাদক শ্রম এবং অপর দল শ্রমিক মাত্র উৎপাদক শ্রমের কার্য করে থাকে। কিন্তু কয়েকটি শিল্পে একই শ্রমিককে উৎপাদক ও অনুৎপাদক—এই উভয় প্রকার শ্রমকার্য করতে হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বস্ত্র-শিল্পের বিষয় বলা যেতে পারে। এই শিল্পে তাঁতীরা তাদের তাঁতে নিজেরা

সূত্র সমাবেশ করে থাকে এবং ঐ একই তাঁতী তার তাঁতের সাহায্যে প্রত্যক্ষ রূপে বস্ত্রোৎপাদন করে থাকে। এই তাঁতে সূত্র সমাবেশের ও সংযোজনার কার্যকে অনুৎপাদক শ্রম বলা হয়। এইখানে তাঁতী তার এই অনুৎপাদক শ্রমকাল যে পরিমাণে কমাতে পারবে ততো বেশি প্রত্যক্ষ রূপে তার বস্ত্রবয়নের জন্য ব্যয়িত উৎপাদক শ্রম-কাল বেড়ে যাবে। এইখানে তাঁতী অভ্যাসজাত কর্মচাতুর্য দ্বারা এই সূত্র সমাবেশ ও সংযোগ ক্ষিপ্র গতিতে সমাধা করে তার এই অনুৎপাদক শ্রম কমাতে পারে। এইখানে অনুৎপাদক শ্রমকাল যে হারে কমবে উৎপাদক শ্রম-কাল সেই হারে বেড়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য শিল্পে এই উৎপাদক এবং অনুৎপাদক শ্রম পৃথক পৃথক স্থানে পৃথক পৃথক শ্রমিকদের দ্বারা সমাধা হয়। এই স্থলে উৎপাদক শ্রমজাত এবং অনুৎপাদক শ্রমজাত দ্রব্যসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার। এখানে অনুৎপাদক শ্রমজাত দ্রব্যের সংখ্যা উৎপাদক শ্রমজাত দ্রব্যের চাহিদা মত তৈরি করা উচিত। অন্যথায় এই বাড়তি দ্রব্য বৃথা গুদামজাত থেকে নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে। যেখানে চারিখানা যান্ত্রিক তাঁতের জন্য দৈনিক বত্রিশ খানি বিম দরকার সেখানে এ জন্য ষাটটি বিম তৈরি করা নিশ্চয়ই নিরর্থক। শ্রমশিল্পের স্বার্থে এ বিষয়ে মালিকদের অবহিত হওয়া উচিত হবে।

[অনুৎপাদক শ্রমজাত দ্রব্যসামগ্রী অযথা জমে গেলে মালিকদের অকারণে শ্রমিক ছাঁটাই-এর সুযোগ আসে। অধিক ক্ষেত্রে অনুৎপাদক শ্রমিকরা কুশলী [skilled] শ্রমিক হয় না। এই জন্য এদের মধ্যে মধ্যে বসিয়ে দিলে প্রয়োজন মত পুনরায় উহাদের সংগ্রহ করা কঠিন হয় না। এই কারণে এই সব অকুশলী শ্রমিকদের মালিকরা স্থায়ী পদে নিযুক্ত করতে চান না এবং মধ্যে মধ্যে ছুতায় নাতায় তারা [সাময়িক ভাবে] তাদের বিতাড়িত

করেন। এই ভাবে অধিকাংশ অকুশলী শ্রমিকদের পদ বহুকাল অস্থায়ী করে রাখা হয়। কিন্তু এভাবে মধ্যে মধ্যে কর্মচ্যুতি ঘটায় বেকার শ্রমিকদের পরিবার পালনে অসুবিধা ঘটে। সাংসারিক ব্যয়-ভার অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে এরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এদের কেহ কেহ জীবনের পূর্বমান বজায় রাখার জন্য অসৎ উপায়ের আশ্রয় নেয়। কিছু কাল অলস জীবন যাপন করাতে পুনরায় তাদের পরিশ্রমী হতে দেরি লাগে। অর্থাভাবে তাদের নিজেদের ও স্ত্রীপুত্রের নৈতিক মান নিম্ন হয়। শ্রমিকদের কর্মে এইরূপ ছাড় ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদক শ্রমের মত অনুৎপাদক শ্রমেরও প্রয়োজন আছে। এই অনুৎপাদক শ্রম ব্যতিরেকে উৎপাদক শ্রমের বিষয় চিন্তা করা যায় না। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এই অনুৎপাদক শ্রমের অযথা আধিক্য দেখা যায়। এইখানে অনুৎপাদক শ্রমকাল কমলে উৎপাদক শ্রমকাল বেড়ে গিয়ে থাকে। এই অযথা অনুৎপাদক শ্রমকাল কমলে শ্রমিকরা উৎপাদক শ্রমে মন দিতে পারে। বহু ক্ষেত্রে অনুৎপাদক শ্রমিকদের যোগান দান কালে বিলম্ব হওয়ার জন্যে উৎপাদক শ্রমিকদের বহু ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই ভাবে বহু উৎপাদক শ্রম-কালের বৃথা অপচয় হয়ে থাকে। কি কি কারণে এই অমূল্য সময় অপচয় হয়ে থাকে তা এইবার বিবৃত করা যাক।

কর্মক্ষেত্রে কাঁচামাল আনয়ন, উৎপাদিত দ্রব্য গুদামে রাখা, ক্ষুদ্রযন্ত্রের জন্য অপেক্ষা করা কিংবা উহার জন্য খোঁজ করা, বড়মিস্ত্রির [ফোরম্যান] সহিত পরামর্শ করা, বা তার আদেশের জন্য অপেক্ষা করা, কিংবা কাঁচা মালের অভাবের জন্য শ্রমিকদের বহু অনুৎপাদক শ্রম বৃথা ব্যয় হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি আনয়নের জন্য ও উহাদের

ব্যবহারোপযোগী করতেও বহু শ্রমক্ষণ বৃথা অপচয় হয়। এই সকল কার্যের প্রয়োজন থাকলেও ইহাতে ব্যয়িত শ্রমকাল কমানো সম্ভব। দেহগত [ম্যানুয়েল] শ্রম এবং যন্ত্রগত শ্রম—এই উভয় প্রকার শ্রমকার্যে অনুৎপাদক শ্রমের অপব্যয় হয়। বহু ফ্যাকটরিতে মোট কর্মকালের প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগ সময় এই ভাবে অপচয় হয়ে থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এইরূপ সময়ের অপচয় শতকরা ৪২, ৫০ এবং ৫৪ ভাগ পর্যন্ত উঠতে দেখা গিয়েছে। আমি আমার নিজের শ্রমশিল্পে এবং কয়েকটি উদ্যোগ-শিল্পে এই সম্বন্ধে সমীক্ষা করেছি। এখানে এইরূপে সময়ের অপচয় সম্পর্কে শতকরা হারের একটি তালিকা [নিম্নে] উদ্ধৃত করা হলো—

অনুৎপাদক শ্রমক্ষণ	দৈহিক শ্রম	যান্ত্রিক শ্রম
কাঁচামাল আহরণে	২৫'০৯	১২'৯১
দ্রব্য অপসরণে	৬'০৩	×
ক্ষুদ্রযন্ত্র আহরণে	৫'০০	১৫'২০
অন্যের পরামর্শ গ্রহণে—	×	৮'১৫
মোট অপচয়	৩৬'১২	৩৬'২৬

এদেশের প্রায় প্রতিটি ফ্যাকটরিতে উৎপাদক শ্রমের শতকরা প্রায় ত্রিশ ভাগ সময় এবং অনুৎপাদক শ্রমের প্রায় সত্তর ভাগ সময় বৃথা ব্যয়িত হয়ে থাকে। কোন্ কোন্ কারণে সাধারণতঃ এইরূপ সময়ের অপচয় হয়ে থাকে তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। এই সময়ের অপচয় যে কিরূপ ক্ষতিকর তা উহা হতে বুঝা যাবে।

(১) বহু ফ্যাকটরিতে অপর্যাপ্ত ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হয়ে

থাকে। এতে শ্রমিকরা ব্যক্তিগত ভাবে ঐ ক্ষুদ্রযন্ত্র নিজেদের অধিকারে রাখতে পারে নি। অপরের যন্ত্র এবং নিজের যন্ত্র ব্যবহারের মধ্যে প্রভেদ আছে। এই সকল যন্ত্র নিজেদের অধিকারে না থাকলে শ্রমিকদের উহাতে সড়গড় ভাব থাকে না। এতে কর্মের গতি ও তৎজনিত দক্ষতা কমে যায়। এই কারণে বহু ডাক্তার বা সার্জেন অপরের ছুরি দ্বারা অপারেশন করতে অপারক হয়। পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্ষুদ্র যন্ত্রের অভাবে শ্রমিকদের বহু জনকে ঐ যন্ত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই পর্যাপ্ত যন্ত্রের অভাব মালিকের প্রতি শ্রমিকদের অশ্রদ্ধা আনে। তদুপরি সুষ্ঠু দ্রব্যাবস্থান ও দ্রব্য-সমাবেশের অভাবে এদের ঐ সকল যন্ত্র আহরণ করতে বা উহাদের জন্য খোঁজাখুঁজিতে শ্রমিকরা যথেষ্ট পরিমাণে অনুৎপাদক শ্রম ব্যয় করে। এইখানে হাতের নাগালের মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকার সেল্‌ফ বা তাকের খোপে খোপে এক-একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র রাখা থাকলে শ্রমিকদের উহা সহজে খুঁজে বার করে আহরণ করতে অধিক সময় নষ্ট হয় না। এই জন্য সেল্‌ফের এক-একটি খোপে এক এক প্রকার ক্ষুদ্র যন্ত্র রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রটি কোন্ খোপে আছে তা জানা থাকলে উহাদের জন্য বাছাবাছি করতে হয় না।

(২) বহু ফ্যাকটরিতে উৎপাদক শ্রমিকদের যোগান দেবার জন্য কাঁচামাল বহু দূর থেকে বহন করে আনতে হয়। এইগুলি কর্মকেন্দ্রের নিকটে মজুত রাখলে বহু অনুৎপাদক শ্রম-ক্ষণের বৃথা অপচয় হয় না। বহু ক্ষেত্রে ফ্যাকটরি সমূহের গঠন-রীতি ও ব্যবস্থাপনা এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। ফ্যাকটরির মূল কর্মকেন্দ্র হতে কাঁচামালের গুদাম বহু দূরে রাখা উচিত হবে না। এখানে দ্বিতলে কাঁচামাল [হাল্কা হলে] রেখে উহা কপি-কলের সাহায্যে অতি দ্রুত নিম্ন তলে কর্ম-কেন্দ্রের সন্নিহিত

স্থানে নামানো যায়। কিংবা উহা [ভারী হলে] একতলের গুদাম হতে লৌহবর্ত্মে রাখা ট্রলি যোগে উহা দ্রুত কর্ম-কেন্দ্রে পৌছানো যায়। দুঃখের বিষয় যে এইরূপ সহজ ব্যবস্থা বহু ফ্যাকটরিতে এখনও করা হয় নি। উপরন্তু ফ্যাকটরির একটি বিভাগের সহিত উহার অপর বিভাগের সহযোগিতা ও যোগাযোগের অভাব দেখা গিয়েছে। এই কারণেও এদেশে বহু অনুৎপাদক শ্রম-ক্ষণের অপচয় হতে দেখা গিয়েছে।

[উপরোক্ত রূপ অবস্থার মধ্যে কর্ম করাতে শ্রমিকরা এমনি অভ্যস্ত যে, ঐরূপ অসুবিধা তারা তাদের এক স্বাভাবিক পরিণতি বলে মনে করে। এইজন্য প্রায় ক্ষেত্রে তারা অভিযোগমুখর হয় নি। এই কারণে ধরে নেওয়া হয় যে তাদের মধ্যে এতে কোনও অসন্তোষের হেতু নেই। কিন্তু উহাদের মনের মধ্যে ইহা এক কদর্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শ্রমিকরা অযথা ফেটিগ্ গ্রস্ত হওয়াতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে। সময়ের এই অপচয়ে মালিকদের মত শ্রমিকদেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কারণ পরিশ্রম-জনিত স্বাভাবিক ফেটিগ্ অপেক্ষা বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা হতে উপগত ফেটিগ্ অধিকতর ক্ষতিকর।

(৩) ফোরম্যান বা বড়মিস্ত্রিদের নিকট হতে বারে বারে উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণেও বহু অনুৎপাদক শ্রম-ক্ষণের বৃথা অপচয় হয়ে থাকে। প্রায় ক্ষেত্রে ক্ষয় প্রাপ্ত মেসিনের যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য শ্রমিকরা বড়মিস্ত্রিদের সকাশে ধর্ণা দেয়। বহু ক্ষেত্রে বড়মিস্ত্রিরা অযথা বিলম্বে এ' বিষয়ে এদের সাহায্য করেছে। কোন্ কাজটি আগে ও কোন্ কাজটি পরে করতে হবে বড়মিস্ত্রিরা তা পূর্বাহ্ণে শ্রমিকদের বলে দেয় নি। কর্মকালে তাদের বারে বারে বিরক্ত করার পর এ সম্বন্ধে তারা এদের নির্দেশ দিয়েছে। পূর্বাহ্ণে পরীক্ষা করে মেসিন সমূহ কার্যকরী করে না রাখাতে যথেষ্ট সময়ের অপচয় ঘটে। এই জন্য যে শুধু ফোর-

মান্য বা বড়মিস্ত্রি দায়ী তা নয়। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকগণ সময় মত এ'বিষয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে নি। এক-এক দিন এক-এক জনকে এক-এক মেসিনে কাজ করতে দেওয়ায় এইরূপ ঘটে থাকে। এতে কোনও একটি মেসিনের উপর শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ভাবে দরদ বা দায়িত্ব থাকে নি। এক-এক জন শ্রমিককে বহু কাল একটি মেসিনে কাজ করতে দিলে সে উহাতে যত্ন নেয় এবং সম্ভব হলে সে নিজেই নিজের মেসিন মেরামত করে নিতে পারে। অতীব নিষ্ঠার সাথে সে তার সেই যন্ত্র পরিষ্কার করে। তার নিজস্ব মেসিনে সামান্য যান্ত্রিক গোলযোগ সে সহজে বুঝে নেয়। তখন সে সেই সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ বড়মিস্ত্রির মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। সময় মত যন্ত্র মেরামত না করলে ক্ষতির মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়। এর ফলে পরে অকারণে এই মেসিন মেরামতির জন্য বহু অর্থ ব্যয় হয়।

উপরোক্ত কু-ব্যবস্থা দূর করলে শ্রমিকদের মত মালিকরাও উপকৃত হবেন। পিস্ রেট বা ফুরনের কাজের শ্রমিকরা এতে অধিক অর্থ উপার্জন করতে পারে। ফ্যাকটরির সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা শ্রমিকদের মনে মালিকদের প্রতি শ্রদ্ধা আনে। কিন্তু উহাদের অভাব শ্রমিকদের মনে তাদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে। মালিকদের প্রতি শ্রমিকদের এই শ্রদ্ধার বা ঘৃণার ফল সুদূর প্রসারী হয়ে থাকে। একজন উৎসাহী ফুরনের কর্মীকে কাঁচা মালের জন্য অপেক্ষা করতে বলা তার পক্ষে অসহনীয়। এই অবস্থাতে কাজ করলে মালিকদের প্রতি শ্রমিকদের যৌথ আনুগত্যের [Morale] হানি ঘটে থাকে। উপরন্তু সমধিক উৎসাহ ও কর্ম-লিপ্সার অভাবে কাজ-কর্মে মন্থর গতি দেখা যায়। কয়েক ক্ষেত্রে এই জন্য অধৈর্য শ্রমিকরা বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছে। বারে বারে ইহা ঘটলে এই স্বভাব তাদের মধ্যে স্থায়ী হয়ে যায়। এ'অবস্থাতে শ্রমিকরা সামান্য কারণে

অভিযোগ মুখর হয়ে উঠে। এই জন্য উৎপাদক কর্মীদের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত কাঁচা মাল কর্মকেন্দ্রে পূর্ব হতে মজুত করা উচিত। উৎপাদক কর্মের জন্য প্রায়োজনীয় আনুসঙ্গিক বা পরিপূরক তৈরি মালও সেখানে শ্রমিকদের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে।

উপযুক্ত রূপ দ্রব্যাবস্থান এবং দ্রব্য-সমাবেশ দ্বারা ইহা সুচারু রূপে করা সম্ভব। এই দ্রব্যাবস্থান এবং উহার সমাবেশের রীতি-নীতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। এক্ষণে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সহজ সত্যটি এ দেশের মালিকদের আজও পর্যন্ত বোধগম্য হলো না। শ্রমিকদের সুবিধাতে যে তাঁদেরও সুবিধা তা তাঁরা বুঝতে চান না।

উৎপাদক এবং অনুৎপাদক শ্রমের স্বরূপ এবং রীতি-নীতি সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার যন্ত্রগত এবং দেহগত শ্রমের স্বরূপ ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে বলা যাক। অধুনাকালে উৎপাদক কার্যের মত অনুৎপাদক কর্মের জন্যও যন্ত্র ব্যবহার হয়। এমন কি, দৈহিক শ্রমের জন্য বহু হস্ত-চালিত সহজ ও জটিল যন্ত্র নির্মিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমরা এখন যান্ত্রিক যুগের মানুষ। এই যন্ত্রের উপকারিতা বা উহাদের গুরুত্ব অস্বীকার করে বর্তমান জগতে টিকে থাকা অসম্ভব।

মানুষের পরিশ্রমজাত ফেটিগ [কর্মক্লান্তি] নিবারণের জন্য সাধারণ বা স্বয়ংক্রিয় এবং সহজ ও জটিল যন্ত্র সমূহের সৃষ্টি হয়েছে। কম পরিশ্রমে স্বল্প কালে অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের জন্য এই যন্ত্র সমূহ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যন্ত্রবিদ্ ইঞ্জিনিয়ারগণ এই যন্ত্রের নক্সা প্রস্তুত কালে কেবলমাত্র যন্ত্রের উৎকর্ষতার বিষয় চিন্তা করেন। কিন্তু যে মানুষ ঐ সকল যন্ত্র পরিচালনা করবে সেই মানুষের বিষয় তাঁরা ভাবেন না। এই সকল যন্ত্র উহাদের চালক মানুষের শক্তি সামর্থ্যের ও সুবিধা

বা অসুবিধার বিষয় চিন্তা করে নির্মাণ করা উচিত হবে। যেহেতু মানুষের দেহকে নূতন করে তৈরি করা সম্ভব নয়, সেহেতু যন্ত্রকে মনুষ্য-দেহের উপযোগী করে গড়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে মানুষ দৈনিক আট ঘণ্টা কাল ঐ মেসিনে নিযুক্ত থাকবে ইঞ্জিনিয়ারগণ তার বিষয় একটুও ভাবেন না।

[এই যন্ত্র তৈরির সময় যন্ত্রবিদ্‌দের সাইকেলের ক্রম-বিকাশ হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রথম সাইকেল উহার চলন-শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করে তৈরি করা হয়। পরে উহা এমন ভাবে তৈরি হয় যাতে চালক সহজে ব্যালেন্স রক্ষা করতে পারে। আরও পরে উহা এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে আরোহী হঠাৎ ভূমিতে পড়ে না যায়। শেষে এমন ভাবে উহা নির্মিত হয় যাতে উহার চালক স্বল্প সময়ে পরিশ্রান্ত না হয়। এই ভাবে ফিক্সড্ হুইল সাইকেল হতে ফ্রি হুইল সাইকেলের সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্পর্কে বুশ্ সিসটেম এবং বল বেয়ারিং-এর প্রভেদের বিষয়ও বলা চলে। সাধারণ প্রেস হতে রোটারি প্রেসের সৃষ্টিও এই একই কারণে হয়েছে।

যন্ত্র নির্মাণকালে যন্ত্রবিদ্‌দের উপরোক্ত তিনটি বিষয় একত্রে মনে রাখা উচিত। যন্ত্রীকে বাদ দিয়ে যন্ত্রের বিষয় চিন্তা করা বাতুলতা। ভুললে চলবে না যে যন্ত্রীদের প্রয়োজনে যন্ত্রের সৃষ্টি। যন্ত্রবিদ্‌রা চান যে যন্ত্র একটুও না থেমে দ্রুত গতিতে চলুক। কিন্তু তাতে দেখা গিয়েছে যে, উহার চালকের পক্ষে ঐ যন্ত্রের বিরাম-হীন গতির সাথে সমান তালে যোঝা সম্ভব নয়। এতে তারা স্বল্পকালে কর্মক্লান্তিতে আক্রান্ত হয়ে বহু দৈব দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। এই সকল উদাহরণ হতে কিরূপ প্রণালীতে যন্ত্র নির্মাণ করা উচিত তা বুঝা যায়। যন্ত্রবিদ্‌দের স্মরণ রাখতে হবে যে যন্ত্রনির্মাণের উদ্দেশ্য শুধু দ্রুত গতিতে দ্রব্যোৎপাদন নয়। শ্রমিকদের পরিশ্রম

লাঘবের জন্য মাত্র মানুষ যন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করেছে। এই একটি মাত্র সুবিধার জন্য সভ্য জগৎ ক্রমান্বয়ে বেকারত্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা সত্ত্বেও মেসিনকে সহ্য করে থাকে। অবশ্য আমার মতে নাগরিকদের বেকারত্বের বিষয় ভেবে পাওয়ার-চালিত মেসিনের সাথে হস্ত-চালিত যন্ত্রের উন্নতি সাধন করা উচিত। যে দেশে মনুষ্য-শক্তি সুলভ তার পক্ষে ইহা অধিক প্রযোজ্য। অন্যথায় জটিল মেসিন যাতে শ্রমিকরা সহজে চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত।]

সকল শ্রমিকের দেহের উচ্চতা একপ্রকার হয় না। এদের বিভিন্ন দৈহিক দৈর্ঘ্যের বিষয় মনে রেখে মেসিনের উচ্চতা খুব উঁচু বা নীচু হওয়া উচিত হবে না। সম্ভব হলে ঐ মেসিনেতে কর্মীদের দেহের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কোনও অংশ উঁচু-নীচু করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অন্যথায় শ্রমিকদের দাঁড়াবার স্থানটি [প্ল্যাটফর্ম] এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে উহা শ্রমিকদের দৈহিক দৈর্ঘ্যের সহিত সামঞ্জস্য রেখে উঁচু বা নীচু করা সম্ভব হয়। কোনও কোনও মেসিনের একটি মাত্র পা'দানি থাকে। কিন্তু দুটি পা'দানি থাকলে পর্যায় ক্রমে ডান বা বাম পা উহাতে রক্ষা করা যায়। এই পা'দানি এতো অপরিসর থাকে যে চওড়া পায়ের চেটো তাতে প্রবেশ করানো যায় না। সকল প্রকার পায়ের চেটো প্রবেশ করানোর মত এই পা'দানি যথেষ্ট চওড়া হওয়া দরকার। কয়েকটি মেসিন দণ্ডায়মান অবস্থাতে চালানোর প্রয়োজন হয়। এ অবস্থাতে কার্যে অমনোযোগী হবার সুযোগ কম থাকে। কিন্তু সম্ভব হলে উহাতে সিট্ [বসবার স্থান] যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। এতে শ্রমিকরা বসা অবস্থাতে মেসিন চালাতে পারে। এই ক্ষেত্রে ঐ সিটের পিছনে হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা উঁচু থাকা ভালো। এতে শ্রমিকরা কর্মকালে সোজা হয়ে বসতে বাধ্য হয়। পিঠ এবং দু'পাশের কাঠ এমন

সোজা করতে হবে যাতে ডানে, বামে বা পিছুতে হেলান দেওয়া যাবে না। এতে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রের মতো শ্রমিকরা আয়েসী হয়ে অমনোযোগী হতে পারে না। অথচ এতে তাদের পরিশ্রমেরও বেশ কিছু লাঘব ঘটে। তবে প্রয়োজন হলে বামে বা ডানে ঘুরার জন্যে ঐ আসনকে ঘূর্ণায়মান আসন করা যায়। মেসিন চালকের দাঁড়াবার বা বসবার স্থান এমন স্থানে থাকা উচিত যেখানে মেসিন উদ্গত অগ্নির আঁচ বা গ্যাস তার অসুবিধা না ঘটায়। পা'দানির প্রয়োজন না থাকলেও পায়ের বিশ্রামের জন্য উহা তৈরি করা উচিত। এই পাদানি এমন লম্বা হওয়া উচিত যাতে শ্রমিকরা প্রয়োজন মত তাতে পা রাখতে বা তারা তাতে পা ছড়াতে পারে। এমন কি, যাদের দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তাদেরও মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের জন্য নিকটে বসবার স্থান থাকা ভালো। কণ্ট্রোল হ্যাণ্ডেল বামে থাকলে মাত্র নেঙাদেরই সুবিধে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু মেসিনে বাম দিকে হ্যাণ্ডেল রাখা থাকে। যন্ত্র নির্মাতাদের শ্রমিকদের এই অসুবিধার বিষয় বুঝা উচিত।

[আমার নিজস্ব ফ্যাকটরিতে আমি প্রথমে বারো হেড্ যুক্ত চারটি টেপ্লুম নির্মাণ করাই। একটি শ্রমিক দুইটি করে এই টেপ্ লুম একত্রে চালাতে পারে। এই ক্ষেত্রে চারটি টেপ্লুমের জন্য আমাকে দুই জন শ্রমিক নিযুক্ত করতে হয়। শীঘ্রই দেখা যায়, একটি লোকের পক্ষে ঐরূপ বারো হেডের একটি টেপলুমও চালানো কষ্টকর। এতে তাদের হৃদপিণ্ডের উপর বারে বারে আঘাত লাগে। উপরন্ত উৎপাদনের হারও লাভজনক হয় না। আমি তখন ঐ চারটি বারো হেডের টেপলুমকে আট হেডের ছয়টি টেপ্লুমে রূপান্তরিত করি। এই বাড়্তি টেপ্লুম দুটির জন্য আমাকে অপর একজন কর্মী নিযুক্ত করতে হয়। এতে শ্রমিকরা অবলীলাক্রমে ও অনায়াসে কাজ করে যেতে থাকে। সেই

সাথে পূর্বাপেক্ষা উৎপাদনের হার বহু গুণে বেড়ে যায়। এইরূপে মেসিনের হেড্ কমানোতে এই ব্যবসায় লাভজনক হয়ে উঠে। এই নূতন ছয়টি মেসিনের জন্য তুইজনের বদলে তিনজন শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে পূর্ব ব্যবস্থা অপেক্ষা এই নূতন ব্যবস্থাতে আর্থিক লাভ অধিক হয়।]

মেসিন সকল এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে তার একদিকে উৎপাদিত দ্রব্য এবং অন্যদিকে তৈরি দ্রব্যসহ কাঁচা মাল রাখার স্থান থাকে। এখানে তৈরি দ্রব্য অর্থে সাক্ষাৎভাবে দ্রব্যোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তৈরি দ্রব্য সমূহকে বুঝায়। যথা, তাঁত-শিল্পে মাকুর জন্য তৈরি সুতা জড়ানো ছোট রিল প্রভৃতিকে তৈরি দ্রব্য বলা হয়ে থাকে। এই উভয় প্রকার দ্রব্যকে এখানে কাঁচা মাল বলা যেতে পারে। এই সকল দ্রব্য রক্ষা করার জন্যে শ্রমিকদের তুই পার্শ্বে প্রয়োজন অনুযায়ী তুটি অর্ধচন্দ্রাকার উঁচু টেবিল রাখা উচিত। এর উপর মেসিন হতে উৎপাদিত মাল [ফিনিসড্ গুড স] নামিয়ে রাখতে ও উহা হতে মেসিনেতে উৎপাদনার্থে কাঁচা মাল উঠাতে শ্রমিকদের অসুবিধা হবে না। অন্যথায় ঐ উৎপাদিত দ্রব্য মেসিন হতে নীচের মাটিতে রাখতে বা সেখান হতে উহার জন্য কাঁচা মাল [কিংবা রিল আদি পরিপূরক দ্রব্য] ঐ মেসিনে উঠাতে শ্রমিকদের বারে বারে নীচু হতে বা নীচে ঝুঁকতে হবে। এই ক্ষেত্রে তারা সহজে পরিশ্রান্ত হয়ে ফেটিগ দ্বারা আক্রান্ত হবে। পরিশ্রম লাঘবের জন্য সৃষ্ট মেসিনে কাজ করেও এই ভাবে শ্রমিকদের পরিশ্রান্ত হয়ে পড়া তুঃখের বিষয়। এইজন্য উপরোক্তরূপ অর্ধ-চন্দ্রাকার তুইটি টেবিল মেসিনের তুই পাশে রেখে শ্রমিকের জন্য [মেসিনের সম্মুখে] বসবার বা দাঁড়াবার স্থান তৈরি হওয়া উচিত। এক দিকের টেবিলে কাঁচা মাল এবং অন্য দিকের টেবিলে ফিনিসড্ গুডস্ রাখলে ফল ভালো হয়।

(১) এক একটি মেসিনের ফুট্ লিভার অতি নীচু দেখা যায়। এতে শ্রমিকদের পা কষ্ট করে নীচে নামাতে হয়। অপর এক মেসিনে এই ফুট লিভার খুব উঁচুতে দেখা গেছে। এতে শ্রমিককে হাঁটু মুড়ে পা রাখতে হতো। ঐখানে দ্রব্য রাখার জন্যে ভালো স্থান ছিল না। এতে দিনে শতবার নীচু হয়ে ভারী দ্রব্য শ্রমিককে তুলতে হতো। এই সকল অ-ব্যবস্থা নিরসনের পর দেখা যায় যে শতকরা বারো ভাগ দ্রব্যোৎপাদন বেড়ে গিয়েছে।

(২) কোনও এক ফ্যাকটরিতে অত্যধিক উত্তাপের জন্য শ্রমিকরা সহজে কর্মক্লান্ত হয়ে পড়তো। এই ক্ষেত্রে ঐ ফ্যাকটরিতে কোণাকার ডবল ছাদ করে দেওয়ার পর এই সমস্যার সমাধান হয়। এর পর একটি বৈদ্যুতিক পাখা সুবিধা মত স্থানে ঝুলানোর পর অবস্থার আরও উন্নতি ঘটে। এর পর দেখা যায় যে ঐ ফ্যাকটরির দ্রব্যোৎপাদনের হার শতকরা ত্রিশ ভাগ বেড়ে গিয়েছে।

সাধারণতঃ শ্রমিকদের শিক্ষা-দীক্ষা, ফ্যাকটরির সুষ্ঠ গঠন এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার উপর [স্বল্পকালে] অধিক দ্রব্যোৎপাদন নির্ভর করে। প্রায় দেখা গিয়েছে অনুৎপাদক শ্রমিকরা কাঁচা মাল বহনে অধিক সময় নিয়েছে। এর ফলে উৎপাদক শ্রমিকদের উহার অভাবে মেসিন বন্ধ করে বসে থাকতে হয়েছে। বহু দূর হতে দ্রব্যাদি বহনের জন্য এইরূপ ঘটে থাকে। বহুক্ষেত্রে শ্রমিকদের সহজ কর্ম-প্রণালী [কর্মচাতুর্য] শিক্ষা দেওয়া হয় নি। এই সকল বিষয়ে ফ্যাকটরি মালিকদের অবহিত হওয়া দরকার।

(৩) কোনও এক ফ্যাকটরিতে পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাবে বহু শ্রমিককে ক্ষণে ক্ষণে কর্মে বিরতি দিতে হতো। উৎসাহী পিস রেটের শ্রমিকদের পক্ষে ইহা অসহনীয় হয়ে উঠে। এর ফলে ঐ সকল কুশলী

শান্ত-স্বভাব শ্রমিকরা কিছু দিন পর অভিযোগ-মুখর হয়ে উঠে। এদের এই ব্যবহার ধীরে ধীরে অন্যান্য শ্রমিকদের উপর অনুরূপ প্রতিক্রিয়া আনে। ইহার ফলে সামগ্রিক যৌথ আনুগত্যের [morale] হানি ঘটে। উপরন্তু এতদ্বারা শ্রমিকদের স্বভাবগত কর্মতাল ও কর্মলিপ্সা বিনষ্ট হয়।

(৪) কোনও এক ফ্যাকটরিতে যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষুদ্র যন্ত্রের অভাব ছিল। মালিকগণ সামান্য খরচ বাঁচাবার জন্য এইদিকে মনোযোগ দেন নি। এতে শ্রমিকদের ঐ সকল যন্ত্রের প্রতি তাদের মালিকানা-বোধ বিনষ্ট হয়। এর ফলে ঐ ফ্যাকটরিতে দ্রব্যোৎপাদনের গতির হ্রাস ঘটে। মালিকদের প্রতি শ্রমিকদের শ্রদ্ধা লুপ্ত হয়। এতে শ্রমিকরা সাক্ষাৎ ভাবে বিদ্রোহী হয় নি বটে, কিন্তু পরোক্ষে এর কুফল ফলতে দেরি হয় নি। এজন্য শ্রমিকদের স্ব স্ব কর্মে আগ্রহ ও তৎপরতা নির্মূল হয়। তৎস্থলে তারা মন্দগতি সম্পন্ন কর্মালস শ্রমিক হয়ে উঠে।

বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত ব্যবস্থাতে ফ্যাকটরি সমূহে দ্রব্যোৎপাদনের হার যথেষ্ট বেড়ে যায়। কিন্তু উহার প্রথম প্রচলনের পর কিছু-কাল ইহার উপকারিতা বুঝা যায় না। এমন কি, কিছু কাল উহাতে ফল পূর্বাপেক্ষা মন্দ হতে পারে। এর কারণ বহুদিন যাবৎ অভ্যাসের দরুণ পূর্ব আদব-কায়দা তাদের এমন মজ্জাগত [দুরস্ত] হয়ে উঠে যে উহা পরিত্যাগ করে নূতন উন্নততর শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণে তাদের অসুবিধা হয়। ধরা যাউক, কোনও শ্রমিক এক হাতে দ্রব্য তুলে উহা বাক্স বন্দী করতে অভ্যস্ত। এখন তাকে দুই হাতে ঐ দ্রব্য তুলতে হলে প্রথম প্রথম বেশ একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু পরে দুই হাতে দ্রব্য তুলাতে সে অভ্যস্ত হলে দেখা যাবে যে, সে পূর্বাপেক্ষা আরও সহজে স্বল্প কালে ও শ্রমে অধিক দ্রব্য তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই সকল ব্যবস্থা দ্বারা

কর্মের গতি বেড়ে যায় এবং উহার দ্রব্যোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে। এতে শ্রমিক ও মালিক উভয়ে লাভবান হয়।

স্টপ্ ওআচ দ্বারা পরীক্ষা করলে এই সব উন্নতি চর্ম চক্ষে ধরা পড়ে। কিন্তু অন্য কারণে আমি শ্রমিকদের কর্মের গতি স্টপ্ ওআচ দ্বারা পরীক্ষা করার পক্ষপাতী নই। এতে অকারণে শ্রমিকরা মালিকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে। ইহার উদ্দেশ্য শ্রমিকদের বুঝিয়ে তাদের অনুমতি নিয়ে মাত্র এইরূপ পরীক্ষা করা যেতে পারে। আমার মতে এ বিষয়ে শ্রমিক-সংস্থার অভিমত পূর্বাহ্নে গ্রহণ করা উচিত। এই ব্যবস্থাতে প্রথম প্রথম উৎপাদনের কিছু বৃদ্ধি ঘটে। শ্রমিকরা তাদের কর্মের গতি নিরূপিত হচ্ছে বুঝে স্বভাবতঃই তাদের ঐ গতি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এতে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে মানসিক ও দৈহিক ফেটিগ্ আসে এবং তাদের অন্তর্নিহিত কর্মলিপ্সা বিনষ্ট হতে থাকে। কর্মরত শ্রমিকরা স্টপ্ ওআচের দিকে লক্ষ্য রাখাতে বহু দৈব-দুর্ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। এতে তাদের চিত্ত দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় এইরূপ ঘটে থাকে। কাজ-কর্ম ব্যতীত অন্যত্র চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে ফল ভালো হয় না। কিছুকাল পরে দেখা যায় যে, এতদ্বারা শ্রমিকদের সামগ্রিক কর্ম-শক্তির হ্রাস ঘটেছে। অধিকন্তু তাদের ওপর সদা লক্ষ্য রাখা হচ্ছে বুঝলে শেষের দিকে তারা মন্থরগতি হয়ে উঠেছে।

উদ্যোগ-শিল্পের শ্রমিকদের যন্ত্রগত শ্রম সম্বন্ধে বলা হলো। এবার উহাদের দৈহিক শ্রম সম্বন্ধে বলবো। ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি ব্যবহারে দৈহিক শ্রমের লাঘব ঘটানো যায়। অনেকে দেখেছেন যে যোগাড়েরা সিঁড়ি ব'য়ে ত্রিতলে ঝুড়িতে ইঁট তুলছে। অথচ ওপরে কপিকল ফিট করে দড়ির সাহায্যে নীচে হতে উপরে ইঁট তুলা সম্ভব। বহু শ্রমিককে আমরা মাথাতে মাটি বইতে দেখেছি। কিন্তু ছোট গাড়িতে উহা রেখে তারা অনায়াসে তা ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। হেঁট হয়ে কোমর বেঁকিয়ে এদেশে শ্রমিকগণ

রাস্তাতে ঝাড়ু দেয়। কিন্তু ব্রাশের মাঝে লগি গুঁজে সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে উহা ঠেলা সহজ। এখানে অস্বাভাবিক ভাবে কোমর বাঁকানোর প্রয়োজন হয় না। সাবেকী জাঁতা-কল, ঢেঁকি প্রভৃতিও নূতন ধাঁচে [হস্ত-চালিত] উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করার দরকার। নূতন ঢেঁকি কলে দুদিক থেকে দুজনে হ্যাণ্ডেল ঠেলে ও টেনে ধান ভানে। এতে হাত ও পা ঠেলার জন্য সমান ভাবে ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু উহাদের দৈহিক ভারও উহাদের সহায়ক হয়ে থাকে। পায়ে বা হাতে উন্নত জাঁতা কলের ফ্রি হুইল ঘুরিয়ে ঐভাবে কাজ করা যায়। কৃষি-ক্ষেত্রে জলসেচ যন্ত্রের সাহায্যে আরও সহজে করা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে এগুলি পাওয়ার-চালিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বীজ-বপণ, কোদালী ও লাঙ্গল চালনা হেঁট না হয়ে চক্র ও হ্যাণ্ডেল যুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে করা চলে।

রাস্তা মেরামতে বহু শ্রমিক একত্রে বহু প্রকার কাজ করে। ঐ সকল কাজের সবই হাল্কা কাজ নয়। উহার কোনটি বা ভারী কাজ হয়ে থাকে। এখানে কর্মীদের দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই সকল কার্য তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উচিত। শক্তিমান লোক শক্ত কাজ সহজে করতে পারে। মেসিন রেকিং, টায়ার ভলকানাইজিং, কেব্‌ল লেইং, রেল-লেইং, গ্যাস ফিলিং প্রভৃতি কাজেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। এ'সব কাজে যে ব্যক্তি বহুক্ষণ হাল্কা কাজ করেছে তাকে ভারী কাজে এবং যে ব্যক্তি ঐ সময়ে ভারী কাজ করেছে তাকে হাল্কা কাজে নিয়োগ করে তাদের কাজের মধ্যে সমতা রক্ষা করা যায়। এইরূপ ব্যবস্থাতে একটি ব্যক্তির উপর অযথা অধিক কাজের চাপ পড়ে না। এই রূপে কর্মের চাপ সকলের উপর সমান ভাবে পড়াতে এদের একজন অপর জন অপেক্ষা অধিক কর্মক্লান্তিতে আক্রান্ত হয় নি। এই ব্যবস্থাতে সামগ্রিক ভাবে দ্রুত গতিতে ঐ সকল কাজ সম্পাদা করা গিয়েছে।

৭

শ্রমিক-সম্পর্ক

শ্রমিক সম্পর্ককে ইংরাজিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন বলা হয়। শ্রমিক-অসন্তোষ মালিক বা শ্রমিক কাহারও পক্ষে কাম্য নয়। বণিকের উন্নতি ক্রেতাদের সন্তোষের উপর নির্ভর করে। পুলিশের কৃতিত্ব জনসাধারণের [পাবলিকের] সন্তুষ্টির উপর। শ্রমিকদের সন্তোষের উপর মালিকের বাড়্-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আপন স্বার্থ সম্বন্ধে সহজ [নর্ম্যাল] মানুষ মাত্রেই সচেতন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদ্যোগ-শিল্পের শান্তি প্রায়ই ব্যাহত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে অকারণে কিংবা সামান্য কারণে ইহা ঘটে থাকে। অথচ মালিকের ও শ্রমিকের উভয়ের স্বার্থের ইহা পরিপন্থী। মালিক ও শ্রমিক আপন দোষ-গুণ সম্পর্কে সচেতন থাকলে অযথা অশান্তি এড়ানো যায়। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক [ইনডাসট্রিয়াল রিলেশন] উন্নত করতে হলে শ্রমিকদের সাধারণ [ব্যক্তিগত] এবং উহাদের দলীয় এই উভয় প্রকার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকা দরকার।

সুষ্ঠু শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক কেবল মাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় না। অর্থ নৈতিক কারণ ব্যতীত আরও বহু কারণ ইহার জন্য দায়ী। সাধারণ মানুষের ধারণা যে কেবলমাত্র শ্রমিকদের ও মালিকদের মধ্যে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্কের উপর সুষ্ঠু শ্রমিক-সন্তোষ নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ইহা সম্পূর্ণরূপ এক ভুল ধারণা। এইখানে শুধু মালিকে-

শ্রমিকে বন্ধুত্ব থাকলে চলবে না। এইখানে শ্রমিকে-শ্রমিকে বন্ধুত্বেরও প্রয়োজন আছে। এই উভয় প্রকার শান্তি শিল্প-ক্ষেত্রে রক্ষিত না হলে উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনের হ্রাস হতে বাধ্য। বর্তমান পরিচ্ছেদে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অসন্তোষ সম্বন্ধে আলোচনা করবো না। এই পরিচ্ছেদে উহাদের মনস্তাত্বিক অসন্তোষের কারণ মাত্র আলোচিত হবে।

সাধারণ মানুষের ন্যায় শ্রমিকরাও বহুবিধ ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সকল ভাবাবেগ প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে জড়িত নয়। ইহার সাথে তাদের বহুবিধ জৈব প্রয়োজনের তাগিদ থাকে। শ্রমিকরাও সাধারণ মানুষের মত প্রেম-প্রীতি-ঘৃণা-গর্ব-ঔৎসুক্য প্রভৃতি মনোবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সকল বৃত্তি নানা কারণে প্রদমিত হয়ে উহাদের মধ্যে বহু মনোজটের [কম্‌প্লেক্স] সৃষ্টি করে। ইহাদের যথাক্রমে (১) মালিকানা-বোধ [Self-assertion], (২) পলায়নী বৃত্তি, (৩) আক্রমণী-স্পৃহা, (৪) সুনাম-প্রিয়তা, (৫) ক্ষমতা-প্রিয়তা প্রভৃতি বলা যায়। এই সকল বৃত্তির অপপ্রয়োগ উদ্যোগ-শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কিন্তু উহাদের প্রয়োগ সুসংহত হলে উহা মালিকের ও শ্রমিকের যথেষ্ট উপকারে আসে। এই বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। এজন্য আমি এগুলির বিস্তারিত আলোচনা করবো।

প্রথমে মালিকে-শ্রমিকে অযথা মনোমালিন্যের মনস্তাত্বিক কারণ সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এর পরে শ্রমিকে-শ্রমিকে বিরোধের মূল কারণ সম্বন্ধে বিবৃত করা হবে। এই সকল কারণ সম্বন্ধে অবহিত থাকলে মালিকে-শ্রমিকে এবং শ্রমিকে-শ্রমিকে বিরোধের মূলগত কারণ [জড়] দূর করা যায়। একমাত্র এই ভাবে শিল্প-ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি রক্ষা

করা সম্ভব। নিম্নে এই সকল বিরোধের অন্যতম কারণ সমূহ বিবৃত করা হলো। মালিক এবং শ্রমিক এদের উভয় পক্ষীয় ব্যক্তির এই সকল আরোগ্য-যোগ্য দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত থাকা দরকার।

(১) মালিকানা-বোধ:—এই মালিকানা বোধকে অধিকার-বোধ বলা যায়। বহু মালিক শ্রমিকদের মালিকানা-বোধের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেন না। এর ফলে কর্মে মন্থরগতি আসে ও তৎজনিত উৎপাদনের হ্রাস ঘটে। সাধারণ মানুষের মত শ্রমিকদেরও ব্যক্তি, দ্রব্য ও মতের ওপর মমতা থাকে। আদি কালের মত জোর করে তারা এগুলির মালিক হতে পারে না। সভ্য জগতে এই মালিকানা-স্পৃহা মমতা-বোধে রূপান্তরিত হয়েছে। এইজন্য এই মালিকানা-বোধকে মমতা-বোধও বলা যেতে পারে। বহুকাল একত্রে কর্মরত শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিয়োগ করলে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এদের পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক মমতা বোধই ইহার অন্যতম কারণ। বদলির প্রয়োজন হলে এদের একদিনে ছত্রভঙ্গ না করে অতি ধীরে ধীরে সহিয়ে সহিয়ে তা করা উচিত। এদের এই মনোবৃত্তির কারণে বিনা পরামর্শে কোনও অধস্তন কর্মীকে হঠাৎ অন্যত্র বদলি করলে শ্রমিকগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। কিন্তু এ কাজ তাদের সাথে পরামর্শ করে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে করলে তারা এজন্য মনঃক্ষুণ্ণ [দুঃখিত] হলেও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে না। শ্রমিকদের নিজস্ব মতামতের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেবার কালেও তাদের সাথে আলোচনা করা ভালো। এরা কোনও ব্যক্তি ও দ্রব্যের মত তাদের নিজের মতকেও ভালবাসে। ফ্যাকটরি এবং উহার দ্রব্য [যন্ত্রাদি] সমূহের উপর তাদের কোনও বৈধ মালিকানা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঐগুলি নিজ হেপাজতে রেখে উহা তারা নিজেদের মনে করে আনন্দ পায়। যে ক্ষুদ্র যন্ত্র [tools] বা মেসিন শ্রমিকরা

কিছুকাল ব্যবহার করে তার উপর শ্রমিকদের একটা মায়া পড়ে যায়। এ জন্য একটি মেসিন হতে অপর মেসিনে নিয়োগ শ্রমিকরা পছন্দ করে না। এর অন্যথা হলে ফ্যাকটরিতে উৎকৃষ্ট পণ্য-দ্রব্যের উৎপাদনের হার কমে যায়। কারণ কিছুকাল পরে শ্রমিকরা তাদের মেসিনের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের ভালবাসতে শুরু করে। এক উকিলের হাতের মামলা অপর উকিলের হাতে দিলে উকিলরাও এই একই কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এ বিষয়ে পুলিশ অফিসার, আইনজীবী এবং শ্রমিকরা একই রূপ স্পর্শকাতর। কোনও এক বালিকার ব্যবহৃত সেলাই-কল বিকল হলে তাকে কাঁদতে দেখা যায় তাকে একটি নূতন সেলাই-কল এনে দিলেও তার কান্না থামে নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে ফোরম্যানরা অকারণে শ্রমিকদের এক মেসিন হতে অপর মেসিনে নিয়োগ করাতে প্রতিষ্ঠান বিশেষে ধর্মঘটের অবতারণা হয়েছে। ফোরম্যান ও বড় মিস্ত্রিদের এইরূপ অবিবেচনা প্রসূত কার্য হতে বিরত থাকা উচিত।

[আমার এ বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। পুলিশে ডেপুটি কমিশনার রূপে একটি জিপগাড়ি ব্যবহার করতাম। বহু সভ্যতা-বিধ্বংসী দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিরোধে আমি এই গাড়িতে ঘটনা স্থলে যেতাম। বহুবার এই জিপ গাড়িটির উপর শক্তিশালী বোমা বর্ষিত হয়েছে। কোনও বোমার স্প্লিন্টারে জিপের দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারে [একটি ঘটনা ব্যতিরেকে] আমি নিজে অনাহত থেকেছি বা সামান্য মাত্র আহত হয়েছি। ঠিক সময়ে ঐ জিপ আমাকে নিরাপদ স্থানে আনতো। দিবারাত্র ব্যবহারে ঐ জিপ আমার অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠে। কিন্তু একদিন হেড্ কোআর্টারের এক আদেশে ঐ পুরানো জিপের বদলে আমাকে এক নূতন জিপ দেওয়া হয়। কিন্তু এ'জন্য আমি কয়

রাত্রি ঘুমতে পারিনি। নির্লজ্জভাবে নিজের কুসংস্কার স্বীকার করে আমাকে ঐ পুরানো জিপ ফেরত নিতে হয়।]

এই কারণে যে শ্রমিক যে মেসিনে অভ্যস্ত, তাকে নিষ্প্রয়োজনে ঐ মেসিন হতে অন্যত্র প্রেরণ করা অনুচিত। এই মালিকানা-বোধ একদিক হতে [উৎপাদন অক্ষুন্ন রেখে] অশেষ উপকার করে। অন্য দিকে ইহা যে কোনও মুহূর্তে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহে দারুণ অশান্তির কারণ ঘটায়।

[শ্রমিকদের এই অধিকার-বোধ অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও উগ্র ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন কম দিলে বা তা দেরিতে দিলে বহু অঘটন ঘটে থাকে। পৃথিবীর বহু বিপ্লব মাত্র অনিয়মিত বেতন প্রদানের জন্য ঘটে গিয়েছে। এই ব্যাপারে স্বল্প মাত্র বিচ্যুতি শ্রমিকরা তাদের অধিকার-হরণের সামিল মনে করেছে। বলা বাহুল্য, বেতন বৃদ্ধি দ্বারা শ্রমিকের নিজের ও পরিবারের আয় বাড়ে। এতদ্দ্বারা সে সমাজে অধিকতর প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। বহু ক্ষেত্রে আয় বাড়া অপেক্ষা প্রতিষ্ঠা অর্জন তাদের কাম্য হয়। এইগুলিকে সে তার ভালো কাজের জন্য প্রাপ্য পুরস্কার মনে করেছে। ভালো কাজের জন্য এই রূপ পুরস্কার পাওয়া তারা একটি অধিকার বলে মনে করে। এই ন্যায়সঙ্গত পুরস্কার হতে অন্যায় ভাবে কেহ বঞ্চিত হলে সে মনে করে যে তার ন্যায্য অধিকার হরণ করা হলো। কোনও দ্রব্য কিনবার ইচ্ছা উহা সম্ভোগ করার ইচ্ছা মাত্র হতে আসে না। অপর কাউকে উহা কিনতে দেখলেও উহা কিনবার ইচ্ছা আসে। এখানে অপর ব্যক্তির মত সে'ও ঐরূপ দ্রব্যের অধিকারী হতে চায়। একে ইংরাজিতে ভ্যানিটি অব্ পজেশন্ বলা হয়। এই জন্য বহু ব্যক্তি বন্দুক না ছুড়েও বন্দুক কিনে। এ সকল দৃষ্টান্ত হতে এই মালিকানা-বোধের বহুবিধ অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।]

ধর্মঘট কালে পুরানো শ্রমিক তার স্থলে নিযুক্ত নূতন শ্রমিককে দেখলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এর কারণ এই যে, ঐ পুরানো শ্রমিক ঐ পদের উপর তার অধিকার বর্তেছে বলে মনে করে। অন্য দিকে মালিকরা মনে করে যে, যথেচ্ছ শ্রমিক নিয়োগে তাদের অধিকার আছে। এই ক্ষেত্রে এই উভয় প্রকার মালিকানা বোধের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনা দরকার। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে বহু ক্ষেত্রে, 'আমাদের মালিক,' এই বলেও শ্রমিকরা গর্ব অনুভব করেছে। শ্রমিকরা মনে করে যে তার অন্য সম্পদের মত তার ঐ পদটিও তার নিজের। এ অবস্থাতে মালিকের বরং খুশি হওয়া উচিত। ইহা উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের সদা সহায়ক। [ধর্মঘটের তিক্ততার পর এই মালিকানা-বোধের জন্য শ্রমিকদের পরানুরাগ ফিরে আসে। এই মালিকানা বোধ কোনও ক্রমে নষ্ট করা উচিত নয়। চাকরিতে স্থায়িত্বে [illegible] শ্রমিকদিগকে কর্ম নিয়োগ এর সদ সদব্যবহার [illegible] না [illegible] রক্ষিত থাকে। এই মালিকানা বোধের কারণে শিল্পী [illegible] শিল্পের জন্য গর্ব অনুভব করে। [illegible] জন্য একটা সৃষ্টির আনন্দ তাকে অভিভূত করে [illegible] ঐ দ্রব্যগুলি আমার হাতের তৈরি—এই [illegible] আমি বহু শ্রমিককে গর্ব করতে শুনেছি। বিগত পুরুষের মালিকার কোনও যশ বিনষ্ট হলে উত্তরাধিকারীদের আমি ক্ষোভ করতে শুনেছি। কিন্তু উহার নিন্দাতা স্বগতঃ রাজমিস্ত্রির অশীতিপর পুত্রকে [illegible] জন্যে আমি চক্ষের জল ফেলতে দেখেছি। বহু অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার এবং ওভারসিয়র তাদের দক্ষতা মূলক পূর্ত কার্যের জন্য আজও গর্বানুভব করে। ইহার দ্বারা মালিকানা-বোধের শক্তি কিরূপ অসীম তা বুঝা যাবে

[বর্তমান কালে একক ভাবে শিল্প-কার্যের জন্য গর্বানুভবের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে। কারণ, উদ্যোগ-শিল্প সমূহে কোনও পণ্য দ্রব্য

একক তৈরি করার সুযোগ নেই। এইখানে পরস্পরের সহযোগিতাতে যৌথ ভাবে দ্রব্য তৈরি হয়। এখানে শ্রমিকরা 'ঐগুলি আমাদের হাতের তৈরি', বা 'ঐগুলি আমাদের ফ্যাকটরির তৈরি দ্রব্য' এই বলে প্রায় গর্বানুভব করে। বাজারে তাদের তৈরি দ্রব্যের প্রশংসা শুনলে মালিকদের মত তারাও গর্বান্বিত হয়ে উঠে।]

শ্রমিকদের প্রতি হুকুম প্রদানের রীতিনীতি, উর্ধ্বতনদের অধস্তনদের প্রতি ব্যবহার এবং বেতন প্রদান কালে ও শ্রমিক ভর্তিকালে ভব্যতার উপর এই 'মালিকানা-বোধের' শুভ সূচনা হয়ে থাকে। শ্রমিকদের পারিবারিক বিষয়ে খোঁজ খবর নিলে এবং উহাদের কাজ-কর্ম বহির্ভূত বিষয়ে সাহায্য করলে ফল সর্বোত্তম হয়। এই বিষয়ে মালিক ও ম্যানেজারদের সদা সচেতন থাকা উচিত।

মালিকে-শ্রমিকে এবং শ্রমিকে-শ্রমিকে সম্পর্ক মধুর করতে হলে উপরোক্ত রূপ কয়েকটি শ্রমিক-মনোবৃত্তির মান একটুও ক্ষুণ্ণ না করে উহার বর্ধন ঘটানো দরকার। কিন্তু উহাদের মধ্যে আরও এমন কয়েকটি বৃত্তি আছে যাহার সুযোগ গ্রহণ না করে মালিকদের উহার আগমনের মূল কারণ সর্বতোভাবে দূরীভূত করা উচিত হবে। শ্রমিকদের মধ্যে পরিদৃষ্ট ঐরূপ দুইটি প্রধান মনোবৃত্তি নিম্নে ব্যাখ্যা সহ উদ্ধৃত করা হলো। মালিকে-শ্রমিকে মধুর সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে হলে শ্রমিকদের এই দুইটি উল্লেখযোগ্য বৃত্তি সম্বন্ধে অবহিত থাকা উচিত। এই বৃত্তি দুইটি শ্রমিকদের মধ্যে অনুশীলনের কারণ যাতে না ঘটে তা দেখা উচিত। যে যে কারণে উহাদের উদ্ভব হয় তা তৎক্ষণাৎ দূর করা দরকার। এই বৃত্তি দুইটিকে বলা হয় পলায়নী বৃত্তি এবং আক্রমণী বৃত্তি [আক্রমণাত্মক স্বভাব]। এই উভয় বৃত্তির বহির্বিকাশের মূল কারণ নির্মূল না হলে মালিকে-শ্রমিকে স্থায়ী সদ্ভাব সম্ভব নয়।

[শিল্পক্ষেত্রে এই অশুভ বৃত্তিদ্বয়ের উপস্থিতির জন্য দায়ী বহুবিধ কারণের বিষয় উল্লেখ করা যায়। উদ্যোগ-শিল্পের ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তি ভর্তি করা ইহার অন্যতম কারণ। ইহারা সর্বক্ষণ অভিযোগমুখর হয়ে থাকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথচ অযোগ্য ব্যক্তি এই শ্রেণীর শ্রমিক। এদের কেহ কেহ নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পন্থায় শ্রমিক ভর্তি দ্বারা ইহার সমাধান হতে পারে। এই দুরবস্থার অপর কারণ শিল্পক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও তৎজনিত অসুবিধা এবং নানা অনাচার, অত্যাচার ও অবিচার। এই সকল কারণ দূরীভূত হলে শ্রমিকদের মনে এই পলায়নী ও আক্রমণী বৃত্তি স্থান পাবে না। এর মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণও বিবেচনা করতে হবে।]

(২) পলায়নী বৃত্তি ঃ—শ্রমিকরা সাহসের অভাবে [কিংবা প্রচণ্ড বাধাতে] আক্রমণে অসমর্থ হলে পলায়নী বৃত্তি দ্বারা অভিভূত হয়। আক্রমণী মনোবৃত্তি ক্রোধ প্রসূত এবং পলায়নী মনোবৃত্তি ভয় প্রসূত হয়ে থাকে। এজন্যে অভাব-অভিযোগ ভারাক্রান্ত শ্রমিকরা সুবিধা মত কর্ম ত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করে। উপযুক্ত কর্মের অভাবে পরিবার ভারাক্রান্ত শ্রমিকরা বহুক্ষেত্রে কর্ম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে পারে না। এক্ষেত্রে দৈহিক পলায়ন সম্ভব না হলেও মনের দিক হতে তাদের পলায়ন সম্পূর্ণ হয়। এখানে কর্মরত থেকেও তারা সর্বক্ষণ অন্যত্র কর্মের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। ফ্যাকটরিতে স্ব স্ব নির্দিষ্ট কাজ-কর্মে তাদের মন বসে না। এর ফলে দ্রব্যোৎপাদনের হার কমে এবং বাতিল দ্রব্যের সংখ্যা বাড়ে। এতে দৈব-দুর্ঘটনারও সংখ্যা বেড়ে যায়।

(৩) আক্রমণী বৃত্তি ঃ—শ্রমিকদের আক্রমণী মনোভাবকে ইংরাজিতে অ্যাগেসিভ্ ইম্পালস্ বলা হয়। আক্রমণী বৃত্তি এবং পলায়নী

বৃত্তি দুইটি বিপরীত ধর্মী মনোবৃত্তি। কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে একটি হতে অপরটি উদ্ভূত হতে পারে। সর্পজাতি আত্মরক্ষার্থে প্রথমে আক্রমণ করে এবং উহাতে বিপদ আছে বুঝলে তখুনি পলায়নপর হয়। অন্য-দিকে পলায়ন পর বিড়াল প্রভৃতি জীব কোণ-ঠাসা হলে আক্রমণ করে থাকে। বিড়াল জীবের কোণ নেওয়া [at bay] যে কিরূপ ভীষণ তা সকলের জানা আছে। এই আক্রমণী-বৃত্তি আদিকালে বস্তু বা ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে ক্ষান্ত হতো। এই সভ্য যুগে ইহা অপরকে অধীন করে বা তার ক্ষতি করে তৃপ্ত হয়। কিন্তু উত্তেজিত শ্রমিকদের অন্তর্নিহিত প্রতি-রোধ-শক্তির অভাব ঘটলে এরা আদি যুগের মত ব্যক্তি ও বস্তুর ক্ষতি করে। কয়েকটি হিংসাত্মক শ্রমিক-ধর্মঘটের ক্ষেত্রে ইহা আমরা পরিলক্ষ্য করেছি। শ্রমিকদের এই আক্রমণী বৃত্তি ক্রোধ প্রসূত হয়ে থাকে। অবিচার ও অসুবিধা এসময় তাদের মারমুখী করে তোলে। কয়েক ক্ষেত্রে ইহা জীবন ও সম্পত্তি নাশেরও কারণ হয়। [কখনও জবরদস্তি করে এরা মালিকদের নিকট হতে দাবি আদায় করতে চেষ্টা করে।]

[সমীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক আক্রমণী স্বভাবের এবং অধিকাংশ শ্রমিক পলায়নী স্বভাবের হয়। এর কারণ এই যে, পারিবারিক দারিদ্র্যে পীড়িত হলেও এদের অধিকাংশের বিচার-শক্তি বজায় থাকে। বিপুলসংখ্যক শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র স্বল্প সংখ্যক বেপরোয়া শ্রমিক একতাবদ্ধ হতে পারে। এই সময় তারা গণ-বাক্‌প্রয়োগ বা মাস সাজেস্‌শন দ্বারা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। এই একতাবদ্ধ সংখ্যালঘু শ্রমিকদের ভয়ে ভীত থাকায় সংখ্যাগুরু শ্রমিক দল তাদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে না। এ অবস্থাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তারা উহাদের অনুবর্তী হয়ে থাকে।]

শ্রমিকদের পলায়নী বৃত্তি ভয় প্রসূত এবং উহাদের আক্রমণী বৃত্তি

ক্রোধ প্রসূত হয়ে থাকে। বহু ক্ষেত্রে এই উভয় বৃত্তির একটিরও বহির্বিকাশ সম্ভব হয় নি। আইন-শৃঙ্খলা [পুলিশ] এবং কর্মচ্যুতির ভয়ে তারা আক্রমণে বা পলায়নে অপারক হয়েছে। আমরা জানি যে ক্রোধ ও ভয়ের একত্রে মিশ্রণ হলে ঘৃণার উদ্রেক করে। [ক্রোধ+ভয়=ঘৃণা] যেহেতু আক্রমণী বৃত্তি ক্রোধ প্রসূত এবং পলায়নী বৃত্তি ঘৃণা প্রসূত, সেই হেতু এই উভয় প্রকার বৃত্তির একত্র মিশ্রণ মালিকের প্রতি এক বিজাতীয় ঘৃণা আনে। উহা অতীব কষ্টদায়ক হলে শ্রমিকরা এ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য উহা তারা ভুলবার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে এই ঘৃণার কারণ বিদূরিত না হয়ে উহা প্রদমিত [ডিপ্রেসড্] হয়। ইহাকে মনোবিজ্ঞানে প্রদমন বা রিপ্রেশন বলা হয়। এই প্রদমিত ঘৃণার কারণে মালিকদের ভালো বা মন্দ প্রতিটি কাজ তারা অপছন্দ করে। ইহাকে এক প্রকার মালিক-বিরোধী কমপ্লেক্স বা মনোজট বলা যেতে পারে। এ অবস্থাতে অকারণে বা সামান্য কারণে শ্রমিকরা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠে। কোনও ভুল বুঝাবুঝি অপসারণে এরা উদ্যোগী হতে চায় না। এরা অদক্ষ ও অনির্ভরযোগ্য শ্রমিকের সৃষ্টি করে থাকে। এর ফলে ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকচ্যুতির হার ও বাতিল দ্রব্যের সংখ্যা বেড়ে যায়। বলা বাহুল্য, এতে মালিক ও শ্রমিক উভয়ে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মালিকে-শ্রমিকে সম্পর্কের বিষয় বিবৃত করা হলো। এবার শ্রমিকে-শ্রমিকে সম্পর্কের বিষয় বলা যাক্। শ্রমিক-সন্তোষ শুধু মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে না। উহা একজন সাধারণ শ্রমিকের সাথে অপর সাধারণ শ্রমিকের সম্পর্কের উপরও নির্ভরশীল। তদারকী কর্মী এবং সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে মধুর সম্পর্কও এ'জন্য প্রয়োজন। এইরূপ সামগ্রিক সন্তোষের অভাবে উহাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার

অভাব ঘটে। এর ফলে উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন নিয়ত ব্যাহত হয়। শ্রমিকে-শ্রমিকে মধুর সম্পর্ক দুইটি মূল বৃত্তির কারণে বিঘ্নিত হয়। উহাদের যথাক্রমে সুনাম-প্রিয়তা এবং ক্ষমতা-প্রিয়তা বলা যেতে পারে। এই দুইটির অপপ্রয়োগ শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয় এনে দিয়ে থাকে। শ্রমিকদের মধ্যে পরিদৃষ্ট এই দুইটি মানসিক বৃত্তি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা করবো।

(৪) সুনাম-প্রিয়তা :—এই সুনাম প্রিয়তাকে লভ্ ফর্ প্রমিনেন্স বলা যেতে পারে। আমি দেখেছি যে উচ্চাভিলাষী কর্মী মাত্রই আত্ম-জাহিরের অভিলাষী হয়। ইহাকে নিজেকে সদা জাহির করার [ফোরফ্রণ্টে স্থাপন] মনোবৃত্তি বলা যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত পদোন্নতির প্রথা শ্রমিকদের সবদা নিজেদের কৃতিত্বকে সব সমক্ষে জাহির করার জন্য ব্যস্ত রাখে। সে যে অপরের অপেক্ষা একজন উপযুক্ত ব্যক্তি তা মালিকের কাছে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। এই উন্মত্ততা সাধারণ শ্রমিক এবং উহাদের তদারকী কর্মীদের মধ্যে সমভাবে দেখা যায়। এতদ্বারা তদারকী কর্মীরা অধস্তন শ্রমিকদের নিকট হতে বাড়তি কাজ আদায় করে মালিকদের খুশি করে। এদের এই দুবলতার সুযোগ গ্রহণ করে মালিকরা এদের মধ্যে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে থাকেন। এর ফলে শ্রমিকদের মনের ও দেহের উপর অযথা চাপ পড়ে। শ্রমিক-সংস্থা [ইউনিয়ন] সমূহের কর্তৃপক্ষের সম্ভব মত ইহাতে হস্তক্ষেপ করে ইহা নিবারণ করা উচিত। এই ব্যবস্থা তদারকী কর্মী এবং সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে থাকে। মালিকদের ইহা কাম্য হওয়া উচিত নয়। ইহা এই উভয় শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে অসহযোগিতা সৃষ্টি করে। এতদ্বারা উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষতি করে থাকে।

(৫) **ক্ষমতা-প্রিয়তা :**—উদ্যোগ-শিল্পে সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে এই ক্ষমতা-প্রিয়তা দেখা যায় [ইহাকে ইংরাজিতে লভ্ ফর্ পাওয়ার বলা যেতে পারে]। এই সুযোগে মালিক ও ম্যানেজারগণ এক শ্রমিককে অপর শ্রমিক দ্বারা প্রয়োজন বোধে শায়েস্তা করে। প্রয়োজন-বোধে শ্রমিকদের মধ্যে এতদ্বারা বিভেদ সৃষ্টি করাও হয়ে থাকে। এই ক্ষমতা-প্রিয়তা তদারকী কর্মীদের অকারণে 'বুলিই'তে [**bully**] পরিণত করে থাকে। প্রকারভেদে এই ক্ষমতা-প্রিয়তার মধ্যে উপকারিতাও আছে। কোনও ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কাঁচামাল এবং মেশিন সমূহের উপর অপ্রতিহত অধিকার বিস্তার করে সন্তুষ্ট। কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে বস্তুর বদলে ব্যক্তির উপর এরা প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। প্রায়শঃ ম্যানেজার, ফোরম্যান এবং তদারকী কর্মীদের এই স্পৃহা মানব-দানবে পরিণত করে। এই ক্ষমতা-প্রিয়তা হতে বহু শ্রমিক নেতারাও মুক্ত নন। এঁরা নিজেদের শ্রমিক-সঙ্ঘের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করার পরও খুশি নন। এঁরা তখন অন্য [বিরোধী] শ্রমিক-সংস্থার উপর আধিপত্য বিস্তার না করা পর্যন্ত শান্তি পান না। শ্রমিকদের নিয়োগকারীদের [মালিক] উপর ক্ষমতার বহর দেখাবার জন্য তারা ব্যগ্র হন। এর ফলে স্ব স্ব ইউনিয়নে অনুরাগী এক দল শ্রমিকের সাথে অপর শ্রমিক দলের সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে। এই ক্ষমতা-প্রিয়তা সামগ্রিক ভাবে শ্রমিক-সন্তোষ বারে বারে বিঘ্নিত করে।

উপরে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হলো। কিন্তু উহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মনোবৃত্তির অতিরিক্ত দলগত মনোবৃত্তিও দেখা যায়। শ্রমিক-সন্তোষ রক্ষাতে অভিলাষী মালিকদের উহাদের এই দলগত মনোবৃত্তি সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া দরকার। এ'ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামতের বদল-বদল করে এরা একটি দলীয় মতামতের সৃষ্টি করে। গণ-

বাক্‌প্রয়োগ [মাস্‌ সাজেস্‌শন্‌] দ্বারা ইহা সৃষ্টি করা হয়। এই ভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থের বদলে দলীয় স্বার্থের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে তারা তাদের চিন্তাধারা একটি মাত্র খাতে প্রবাহিত করে থাকে। শ্রমিকদের এই দলীয় মনোভাব তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা (১) ক্রাউড্‌ টাইপ্‌, (২) ক্লাব টাইপ এবং (৩) কমিউনিটি টাইপ। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে একটি হতে অপরটির বাঁধন আল্গা হয়ে থাকে। শ্রমিকদের এই ক্রাউড্‌ টাইপ্‌ একতা সাময়িক হয় এবং উহার শক্তি যৎসামান্য থাকে। ক্লাব টাইপ একতাতে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা এক কিন্তু অন্যান্য প্রশ্নে তারা বিভিন্নমতি। [এই কারণে সাম্প্রদায়িক ও জাতি-গত প্রশ্নে বহু ধর্মঘট দানা বাঁধে নি।] কমিউনিটি টাইপ্‌ একতাতে শ্রমিকরা নিজেদের একটি গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাণী মনে করে। প্রতিটি বিষয়ে তারা জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে মত প্রকাশ করে। এই ধরনের একতা এদেশের শ্রমিকদের মধ্যে এখনও সৃষ্টি হয় নি। এই তিন প্রকার দলীয় মনোভাবাপন্ন শ্রমিকদের সন্তুষ্টি সাধনের পন্থাও বিভিন্ন রূপের হতে বাধ্য। মালিকরাও শ্রমিকদের এই ক্লাব-টাইপ একতার দুর্বলতার সুযোগ প্রায়ই নেন। এই স্থানে তাঁরা খোঁজ নেন যে কোন্‌ বিষয়ে এরা ভিন্ন মতাবলম্বী। এর পর এদের মধ্যে বিভেদ আনয়ন করা কঠিন হয় না। এক্ষেত্রে মালিকদের উচিত হবে যে তারা কোন কোন্‌ বিষয়ে এক মতাবলম্বী তার খোঁজ রাখা। এই ক্ষেত্রে এঁরা তাদের এই এক মতটিকে বাড়তে সাহায্য করে তাদের সন্তোষ সাধন করতে পারবেন। মালিকদের উদ্‌যোগী হয়ে নিজেদের শ্রমিকদের মধ্যে একতা আনয়ন করা উচিত। এ বিষয়ে যাঁরা ভিন্ন মত অবলম্বন করেন তাঁরা নিজেদের সর্ব-নাশ নিজেরা ডেকে আনেন। আমার মতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত মতা-মত এবং উহাদের দলগত মতামত—তাদের এই উভয় প্রকার মতামতকে

আমাদের সমান সম্মান দেখানো উচিত। এই উভয় মতামতের কোন্ মতটি কখন প্রাধান্য লাভ করবে তা বলা শক্ত। শ্রমিকদের এই উভয় মতামতের সহিত মালিকদের পরিচয় থাকা উচিত।

[এ বিষয়ে মালিকদের নিস্পৃহতা এবং বিরূপতার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি কেন অমনোযোগী তা বুঝি না। মালিক ও শ্রমিকদের ন্যায় শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিরও এই বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য যে, এই ব্যবস্থার উপর শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।]

৮

পরিবেশ

জীব মাত্রেই জৈব কারণে তাদের স্ব স্ব পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থাকে পরিবেশ বলা হয়। উত্তম পরিবেশ স্বল্প কালে অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের সহায়ক। এই পরিবেশ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—মানসিক ও বায়বিক। কর্তৃপক্ষের এবং সহ-কর্মীদের সৎ বা অসৎ ব্যবহার দ্বারা মানসিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়। আমি প্রথমে এই মানসিক পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। কদর্য দৈহিক আবহাওয়ার মত ফ্যাকটরি সমূহে অসহনীয় মানসিক আবহাওয়ারও সৃষ্টি হয়ে থাকে। [ফ্যাকটরির কায়িক পরিবেশ সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করবো।] আলোক-ব্যবস্থা, বায়ু-চলাচল, আর্দ্রতা ও উত্তাপ প্রভৃতি দ্বারা বায়বিক [কায়িক] পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশের উপর শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, দক্ষতা প্রভৃতি নির্ভর করে। ফ্যাকটরি গঠনের কালে ইঞ্জিনিয়ারগণ মনোবিজ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ করলে এ বিষয়ের সুফল হয়। পরিবেশগত মনোবিজ্ঞান বা এনভায়রন্‌-মেণ্ট সাইকোলজি দ্বারা [কেহ কেহ ইহাকে পরিবেশগত ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন] ইহার সমাধান হতে পারে। অন্য দেশে মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ মত ফ্যাকটরি সমূহের নক্সা প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু এদেশের শিল্পপতিগণ এ'সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করেন নি।

(ক) **মানসিক পরিবেশ :—আমরা পরিবেশ শব্দটি দ্বারা শুধু আলোক-**

ব্যবস্থা, উত্তাপ, শব্দ, আদ্র'তা প্রভৃতি দৈহিক ব্যবস্থা বুঝি এবং মনে করি যে উহাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাতে শ্রমিকরা সর্বোত্তম ভাবে কার্য করতে পারে। কিন্তু অনুরূপ ভাবে আকাঙ্ক্ষা, ভয়, আশা, ভাবনা বন্ধুত্ব ও শত্রুতা প্রভৃতি মানসিক পরিবেশও শ্রমিকদের উপর কার্যকরী হয়ে থাকে। শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা এই মানসিক পরিবেশের উপরও নির্ভর করে। শ্রমিকদের এই ব্যক্তিগত বৃত্তি সমূহ পরে উহাদের গণ-চিত্তে স্থায়ী ভাবে স্থান করে নেয়। এর ফলে যৌথ-ভীতি [mass], যৌথ ভাবনা, যৌথ-আনুগত্য [morale] প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এতদ্বারা শ্রমিকে-শ্রমিকে এবং মালিকে-শ্রমিকে সহযোগিতার অভাব ঘটে। কয়েকটি ফ্যাকটরিতে একজন শ্রমিক অপর শ্রমিককে বিশ্বাস করে না। একজন অপর জনকে কোম্পানির দালাল [spy] ভেবে ঘৃণা করে। আবার এমন ফ্যাকটরি আছে যেখানে তারা মিলেমিশে সদ্ভাবের সাথে কার্য করে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা প্রায় পরস্পরের মধ্যে কলহে লিপ্ত হয়েছে। এই কলহজনিত সহযোগিতার অভাবে ঐ ফ্যাকটরিতে বহু কর্মঘণ্টা বৃথা নষ্ট হয়েছে। এই পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনে বিঘ্ন ঘটেছে। বহু ফোরম্যান ও ম্যানেজার শ্রমিকদের মধ্যে এই কলহের বীজ অকারণে রোপণ করে ফ্যাকটরির যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকেন।

এই সকল ফোরম্যান ও ম্যানেজার শ্রমিকদিগকে তাঁদের তাঁবে রাখার জন্য এদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে থাকেন। শ্রমিকরাও নিজেদের দলগত স্বার্থে এইরূপ বিভেদ কামনা করে। কিন্তু এতে অনুৎকৃষ্ট ও অকেজো দ্রব্য সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদন হার কমে যায়। এর ফলে মালিকের লাভ কম হয় এবং শ্রমিকরা কম বেতন পায়। কিন্তু উহার বিপরীত ক্ষেত্রে [দ্বিতীয়োক্ত] শ্রমিকদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকে। সেই ক্ষেত্রে

তারা নিজেদের ভুলচুক শুধরে নেয় এবং তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ফ্যাকটরির কাজ সহজ করে তুলে। ফ্যাকটরিতে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা থাকাতে ঠিক সময়ে ঠিক মাল প্রত্যেকটি বিভাগে পৌঁছে যায়। বহু দ্রব্য পর পর বহু বিভাগের কর্ম দ্বারা [processes] সৃষ্টি হয়। যে কোনও একটি বিভাগের কাজ খারাপ হলে ঐ দ্রব্যটি অনুৎকৃষ্ট বা বাতিল দ্রব্য হয়ে যেতে পারে। এই জন্যে শ্রমিকদের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন অসামান্য।

ফ্যাকটরির কদর্য মানসিক পরিবেশের কারণ সম্পর্কে বহুক্ষেত্রে শ্রমিক-দের প্রতি ফোরম্যানদের অহেতুক দুব্যবহারের বিষয় বলা হয়। কিন্তু এই সকল ফোরম্যান কেন 'বুলিই' [bully] হয়ে উঠে তার হেতু অনু-সন্ধান দ্বারা জানা হয় না। এরূপ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাদের সুপারিশ ম্যানেজাররা কানে নেন না। অথচ উৎপাদন কমলে তাদেরকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। শ্রমিকরা বহু ক্ষেত্রে ভয়গ্রস্ত হয়ে উৎপাদন ইচ্ছা করে কম করে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, একজন অধিক উৎপাদন করলে অপর জন সেই তুলনাতে কম উৎপাদন করলে তাকে ধমকা-ধমকি করা হয়। অথচ তাদের প্রত্যেকের মেসিন সমান ভাবে উৎকৃষ্ট থাকে না। শ্রমিকদের মনে বহু প্রকার ভুল বুঝাবুঝি দ্বারা মনোজট [complex] সৃষ্টি হয়। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের চিত্ত-বিক্ষোভ [emotion] তাদের মনের বিচার-শক্তি [reason] হরণ করে। যে কোনও কারণে শ্রমিক অসন্তোষ ঘটুক না কেন উহা অসন্তুষ্ট শ্রমিককুল সৃষ্টি করে। এর ফলে ফ্যাকটরিতে অনুৎকৃষ্ট ও বাতিল পণ্য-দ্রব্য সৃষ্টি হয়। এই জন্য এই সকল কুপরিবেশের মূল কারণগুলি খুঁজে বার করে উহাদের নিরাময়ের ব্যবস্থা করা উচিত। উপযুক্ত বাকপ্রয়োগ [suggestion] এবং চিত্ত-বিশ্লেষণ দ্বারা

শ্রমিকদের বিবিধ মনো-জট্ দূরীভূত করা উচিত হবে। শ্রমিক-অসন্তোষ সকল ক্ষেত্রে অর্থ-নৈতিক কারণে ঘটে না। পরিবার-ভারাক্রান্ত শ্রমিক অধিক বেতন ও চাকুরির স্থায়িত্ব, ছুটি ও নিরাপত্তা কামনা করে। কিন্তু সেই সাথে কর্মক্ষেত্রে তারা সর্বোত্তম মানসিক পরিবেশও কামনা করে। বহু শ্রমিক উপযুক্ত মানসিক পরিবেশের অভাবে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে দারিদ্র্য পর্যন্ত বরণ করেছে। এ সকল ঘটনা হতে সুষ্ঠু মানসিক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়।

(খ) কায়িক পরিবেশ :—এই কায়িক পরিবেশকে বায়বিক বা দৈহিক পরিবেশও বলা হয়। কদর্য দৈহিক পরিবেশ শ্রমিকদের মনের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া আনে। উপযুক্ত আলোক-ব্যবস্থার অভাবে শ্রমিকদের কাজ-কর্মে অসুবিধা ঘটে। সেই সাথে তাদের মনে বিরক্তিরও সৃষ্টি করে। প্রথমে তারা উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্যের উচ্চ মান রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে তারা কাজ-কর্মে বেপরোয়া হয়ে উঠে। এর পর তারা তাদের কাজের গতি ধীরে ধীরে শ্লথ করে দিয়ে থাকে ম্যানেজারগণ ইহা বুঝলেও মালিকদের এই বাবদে খরচে রাজি করাতে পারে না। এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করা মালিকদের আয়ত্তের মধ্যে আছে বুঝলে শ্রমিকরা অভিযোগমুখর হয়ে উঠে। এইজন্য উৎকৃষ্ট ফ্যাকটরি হতে নিকৃষ্ট ফ্যাকটরিতে কাজে ঢুকলে শ্রমিকরা [প্রথম দিনেতেই] বিক্ষুব্ধ হয়। শ্রমিকরা তাদের ফ্যাকটরিতে সুপরিবেশ দেখলে ফ্যাকটরি সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করে। এবার এই কায়িক পরিবেশ সম্পর্কিত বিবিধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

(১) বায়ু-চলাচল :—ফ্যাকটরি গৃহে শ্রমিকদের সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং দক্ষতা সুষ্ঠু বায়ু-চলাচলের উপর নির্ভর করে। এই বায়ু চলাচল ব্যতীত উহার আর্দ্রতা ও উষ্ণতার উপরও উহাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও

দক্ষতা নির্ভর করে। বায়ু-চলাচলের অভাব শ্রমিকদের মধ্যে কর্মক্লান্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্য আনে। সকলে জানে যে, শ্বাস-ক্রিয়া দ্বারা বায়ুর উপকারী অম্লজান [oxygen] বিনষ্ট হয় এবং তৎপরিবর্তে ক্ষতিকর কারবন-ডায়োক্সাইড্ তৈরি হয়। অন্যদের মতে কারবন-ডায়োক্সাইড্-এর আধিক্য শ্রমিকদের রক্ত বিষাক্ত করে। কেহ কেহ বলেন, দেহ হতে পদার্থ বিচ্ছুরিত হওয়াতে তাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়। এর কারণ যাই হোক, বায়ুর অভাব শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

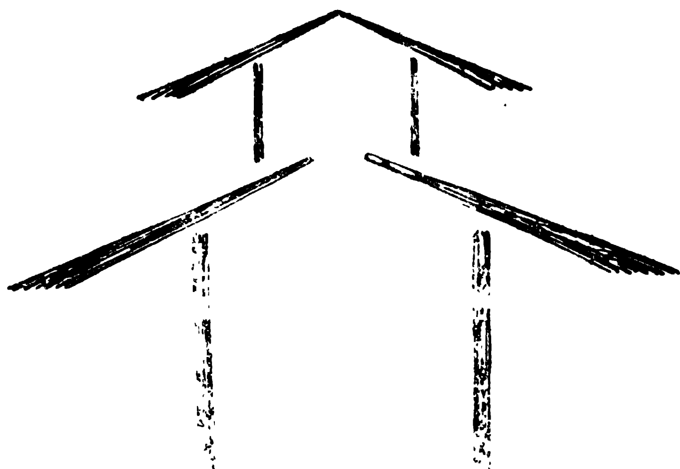
এই দুরবস্থার প্রতিষেধক রূপে প্রত্যেকে বলবেন যে, দূষিত বায়ু বিদূরিত করে যথেষ্ট নূতন বায়ু প্রবেশ করানো হোক। একমাত্র এইভাবে শ্রমিকরা কর্মক্লান্তি হতে রক্ষা পেতে পারে। বায়ু-চলাচল একদিকে দেহ হতে উদ্গত উত্তাপ বিদূরিত করে ও অপর দিক হতে উহা দেহকে অতি-আর্দ্রতা হতে রক্ষা করে। কিন্তু উষ্ণ বায়ু ঘরে প্রবেশ করালে সূতা-কল সমূহে [টেকনিক্যাল কারণে] পণ্য-দ্রব্যের ক্ষতি হয়। আর্দ্রতার অভাবে বয়ন সূতা বারে বারে ছিঁড়তে থাকে। এজন্য সাধারণ ভাবে ফ্যাকটরি কক্ষে অতি মাত্রায় বায়ু না ঢুকিয়ে মাত্র উহার সহজ চলাচলের ব্যবস্থা করা আমাদের মতে উচিত হবে।

আর্দ্র বা উষ্ণ নিশ্চল [still] বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা অবিরত ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করানো অতীব ক্ষতিকর। এতদ্বারা ফুসফুসের ক্ষীণাকার মিউকাসের আচ্ছাদন ভারাক্রান্ত হয়ে শক্তিহীন হয় এবং তজ্জনিত উহা ক্ষতিকর জীবাণুর আদর্শ জন্মস্থান হয়ে উঠে। কিন্তু স্বাভাবিক বায়ু-চলাচল অব্যাহত থাকলে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে মালিক ও ব্যবস্থাপকদের অবহিত থাকা উচিত।

[জীবদেহে অনাবিল জৈব-রসায়ন প্রক্রিয়ার জন্য ক্রমাগত উত্তাপ

তৈরি হয়। এ'জন্য বিশ্রামকালে বা পরিশ্রম কালে [সর্ব সময়ে] আমাদের দেহ হতে কম-বেশি উত্তাপ ক্রমান্বয়ে নির্গত হয়। এই উত্তাপ দেহ হতে এভাবে বাহিরে বিচ্ছুরিত না হলে মানুষের দৈহিক উত্তাপ উহাদের স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা বেড়ে যায়। এর ফলে দেহের উপরি অংশের রক্তধমনী হঠাৎ স্ফীত হয়ে উঠে রক্তকে বাহিরের আপেক্ষিক ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে আনে। এতে দেহের আবশ্যক অংশ হতে রক্ত অন্যত্র সরে আসে। এতে আমরা অকারণে অতি মাত্রাতে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ি। এই ঘর্ম বায়ু-চলাচল দ্বারা অপসারিত না হলে শ্রমিকরা অতি সহজে কর্মক্লান্ত হয়ে পড়ে।]

বায়ু অতি উষ্ণ বা অতি আর্দ্র হওয়া উচিত নয়। ফ্যাকটরি সমূহে তাপের সমতা রক্ষা করা উচিত। কিন্তু অগ্নিউদ্দীপক ফ্যাকটরিতে আর্দ্র-বায়ূ এবং অন্য হাল্কা কর্মশালাতে উষ্ণ বায়ুর প্রয়োজন হয়। অপর দিকে শীতকালে উষ্ণ বায়ু এবং গ্রীষ্ম কালে আর্দ্র বায়ু প্রয়োজন। কিন্তু সুতাকল এবং বস্ত্র-শিল্পে উষ্ণ বায়ু উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। উষ্ণতার কারণে সুতা বারে বারে ছিঁড়ে কাঁচামালের ক্ষতি করে। এজন্য আমি অন্য উপায়ে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছি। আমার নিজস্ব ফিতা-কলে আমি ইহার প্রথম পরীক্ষা করি। প্রতিটি নির্মীয়মাণ ফিতার তলাতে মেসলা করে জল রাখা হয়। এই জল ক্রমাগত বাষ্পে পরিণত হয়ে উহা উপরের ফিতার সুতাগুলিকে আর্দ্র রাখে। এর ফলে শীত-কালে উষ্ণবায়ু কর্মশালাতে ঢুকালে দ্রব্যোৎপাদনের কোনও ক্ষতি হয় নি। [পূর্বকালে ভারতে এই পন্থায় ঢাকাই মসলিন তৈরি করা হতো।] এই কারণে আজও দেওয়াল বিহীন [খুঁটির উপর রক্ষিত] আটচালাতে কর্মশালা স্থাপন করা হয়। এই প্যাগোডাকৃতি আটচালার একটি মডেলের নমুনা প্রদত্ত হলো।



কর্মশালার ছাদ বেশি নীচু হলে উহা উত্তপ্ত [রৌদ্রদগ্ধ] হয়ে ঐ উত্তাপ নিম্নে উহার তপ্ত রশ্মি বিকিরণ করে। এতে শ্রমিকরা বিনা পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত হয়ে গরমে অস্থির হয়ে পড়ে। এই ভাবে দেহের তাপ হারিয়ে তারা সহজে কাবু হয়ে পড়ে। কিন্তু কর্মশালার ঐ ছাদ অতি উঁচু হলে তাপ কমে কিন্তু উহাতে অন্য এক বিপদ ঘটে। নীচের দূষিত বায়ু উপরে উঠে ছাদের নিম্নে থাকে থাকে জমা হয়। সামান্য কয়টি চৌকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেনটিলেটর উহা নির্গত করতে অক্ষম থাকে। [ছাদ নীচু হলে ইহা জানালার পথে বহির্গত হতো।] উহা ক্রমান্বয়ে ছাদের নিম্নে জমা হওয়ার পর এক সময়ে হঠাৎ উহা নীচে নেমে আসে। এই দূষিত বায়ু তখন শ্রমিকরা শ্বাসপ্রশ্বাসে ফুসফুসে ঢুকিয়ে নিজেদের স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়। কিন্তু উপরোক্ত নক্সাতে প্রদর্শিত পন্থায় কর্মশালা নির্মিত হলে এই দূষিত বায়ু উপরে উঠে পরপর দুইটি থাকের বিপুল ফাঁকে

নির্গত হয়ে যায়। ঐ সময় বিশুদ্ধ বায়ুও ত্বরিত গতিতে উহাদের ঐ বিপুল ফাঁকে ঢুকে নীচে নামতে থাকে। এই ভাবে নীচের চারি পাশ হতে এবং সেই সাথে উপরের চারি পাশ হতে যথেষ্ট বায়ু আপনা হতে ঐ কর্মশালা প্লাবিত করে দিতে পারে। এই ভাবে উত্তম বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা যায়। এইরূপে নির্মিত পিরামিডাকার আট-চালাতে ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি বিখ্যাত দ্রব্যসমূহ পূর্বকালে এদেশে তৈরি হতো। অধুনা কালে এই আর্দ্র ও উষ্ণ বায়ুর পরিমাণ ও উহাদের গতি পরিমাপক বহু প্রকার থারমোমিটার আবিষ্কৃত হয়েছে। উহাদের যথাক্রমে কাটাথারমোমিটার, ওয়েট ও ড্রাই বাষ্প থারমোমিটার, উলেন্-উইক্ থারমোমিটার ইত্যাদি বলা হয়। ইহাদের সাহায্যে উষ্ণতা এবং আর্দ্রতার পরিমাণ বুঝে ফ্যাকটরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলম্বন করা যেতে পারে। এইভাবে কর্মশালাতে শ্রমিকচ্যুতি, দৈব দুর্ঘটনা, রোগ-ভোগ, উৎপাদন হ্রাস প্রভৃতি সহজে এড়ানো যায়।

এই বায়ুতে আর্দ্রতা কম এবং শুষ্কতা বেশি থাকা উচিত। উহা অবস্থা-ভেদে উষ্ণ না হয়ে শীতল হলে ভালো। উহাকে নিশ্চল [still] অবস্থাতে না রেখে সদা সচল করতে হবে। এই বায়ু এক প্রকাবের ও এক ভাবের না হয়ে ইহার তাপ স্থানে স্থানে বিভিন্ন হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশে মালিক ও ম্যানেজারগণ বাধ্য না হলে এই সম্বন্ধে মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করেন না।

(২) আলোক-ব্যবস্থা ঃ—বায়ু-চলাচলের অভাব শ্রমিকদের দেহ ও মনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তজ্জনিত স্বল্প কালে উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ব্যাহত হয়। কিন্তু উপযুক্ত আলোক-ব্যবস্থার অভাব প্রত্যক্ষ রূপে উদ্যোগ-শিল্পের ক্ষতি সাধন করে। দুঃখের বিষয় যে ফ্যাকটরি-সমূহে এই অত্যাবশ্যক আলোক-ব্যবস্থারই অভাব দেখা যায়।

এই আলোক ব্যবস্থা দ্বারা মূল কর্মকেন্দ্রে পর্যাপ্ত আলোক পৌছানো দরকার। বলা বাহুল্য যে, ইহা অতি স্বল্প কিংবা অতি উগ্র হলে শ্রমিকদের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা ঘটে। এতে উৎকৃষ্ট ফ্যাকটরিতে দ্রব্যোৎপাদন ব্যাহত হয়। মানুষের চক্ষুর মণি ধীরে ধীরে কম বা বেশি আলোকে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু ইহা সীমিত না হলে চক্ষুতে অযথা চাপ পড়ে। স্বাভাবিক দিবালোক ফ্যাকটরির জানালার ধারে কর্মরত শ্রমিকদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ঐ দিবালোক উহার অভ্যন্তর ভাগে কম হয়। এ'ক্ষেত্রে ছাদের স্কাইলাইট্ হতে আলো এলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। বহু ক্ষেত্রে জানালাতে ধুলা জমতে দেওয়া হয় এবং দ্বিবালও কালো হয়ে উঠে। এই অবস্থাতে ঐ জানালা ও দ্বিবালের মলিন রঙ প্রায় শতকরা ৪৩ হতে ৯০ ভাগ আলো [শুষে] নষ্ট করে। এই জন্য দ্বিবাল সমূহ কখনও ছাই রঙের হতে দেওয়া উচিত হবে না। আলোক বিচ্ছুরণের জন্য উহা সবদাই ধবধবে সাদা রঙের হওয়া উচিত। বর্ষাকালে ও বৈকালে পর্যাপ্ত দিবালোক পাওয়া যায় না। উপরন্তু পার্শ্ববর্তী অট্টালিকা সমূহও [ব্যাড প্ল্যানিঙ্] এই দিবালোক অবরুদ্ধ করে।

উপরোক্ত কারণে ফ্যাকটরি সমূহে কৃত্রিম আলোকের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ একটি জোর শক্তি সম্পন্ন আলো ছাদের নীচে টাঙানো হয়। কিন্তু উহাতে চতুষ্পার্শ্বে ছায়া পড়ে ও তজ্জনিত অসুবিধা ঘটে। কয়েকটি টিউব বাল্ব লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি রাখলে এই অসুবিধা দূর হয়। আমার মতে একটি অতি জোর আলোর স্থলে তিনটি কম জোর আলো ক্রশ করে রাখলে ছায়া কম পড়ে। এ'ছাড়া ধারে ধারে আলোক রাখা যেতে পারে। আলোক বিচ্ছুরণের জন্যে পিছনে আয়না বা চকচকে খোল রাখা ভালো। কিন্তু উহা একীভূত

হয়ে উগ্রভাবে চক্ষুকে পীড়িত করলে চলবে না। আমার মতে কম উজ্জ্বল আলো সমান্তরালে যথাযথ স্থানে রাখলে ফল উত্তম হয়। ফ্যাকটরির অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী আলোক সমাবেশ করা উচিত। আলোকের অসুবিধা শ্রমিকদের কর্মক্লান্তি এবং শিরঃপীড়ার কারণ হয়। স্বল্পালোকে জোর করে উত্তম কাজ করবার চেষ্টা করলে এই অবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষণে এই কৃত্রিম আলোক কিরূপ আলোক হওয়া উচিত তা আলোচনা করা যাক। রৌদ্রালোক, স্কাইলাইট, বৈদ্যুতিক আলোক, গ্যাসের আলোক প্রভৃতি বিভিন্ন আলোকের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। রাত্রে কৃত্রিম আলোকে ক্রীত পোশাক প্রায় দিনের আলোতে ভালো লাগে না। রঙ তৈরির কারখানাতে এইরূপ তারতম্য লোকসানের কারণ ঘটায়। অধুনা বহু প্রকার ডে-লাইট-ল্যাম্পের সৃষ্টি হয়েছে। উহারা যথাসাধ্য আলোক হতে পীত রশ্মি কমিয়ে দেয়। এই প্রকার আলো বহুলাংশে দিবালোকের সমতুল হয়ে উঠে। এই প্রকার আলোর আরও উন্নতি ঘটলে এক দিন এই সমস্যার সমাধান হবে। আমার মতে রাত্রে এই প্রকার কৃত্রিম দিবালোকেরই ব্যবস্থা করা উচিত।

(৩) শব্দ রোধ :—ফ্যাকটরিসমূহ হতে পুরোপুরি শব্দ নিরোধ সম্ভব নয়। মেশিন থামালে এই বিরক্তিকর শব্দও বন্ধ হয়। কিন্তু উহা থামলে কারখানাও বন্ধ হয়। এই শব্দাপেক্ষা তজ্জনিত স্পন্দন [ভাইব্রেশন] আরও খারাপ। এই শব্দ দ্বারা ইঁদুর প্রভৃতি জীবের ক্ষতি হয় নি। কিন্তু এই শব্দ ও স্পন্দন একত্রে উহাদের নিহত করেছে। এ'জন্য মেশিন এমন মজবুত করে শক্ত ভূমিতে স্থাপন করতে হবে যাতে ঐ মেশিনের কোনও অংশ এবং তৎসহ শ্রমিকদের দাঁড়াবার প্ল্যাটফর্ম একটুও না কাঁপে। তবে মেশিনের নির্মাণ কৌশল দ্বারা উহা হতে

নির্গত শব্দ যথেষ্ট রূপে কমানো যায়। অনাবিল শব্দে মানুষ শীঘ্রই অভ্যস্ত হয়ে উঠে। আমি এক ভদ্রলোককে একদিন জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম,—'আচ্ছা! আপনার এই রেল লাইনের ধারের বাড়িতে রেলের শব্দে রাত্রে ঘুম হয়?' এই ভদ্রলোক একটু হেসে উত্তরে আমাকে বলেছিলেন,—'প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হতো। কিন্তু এখন রেলের শব্দ না শুনলে ঘুম হয় না।' বলা বাহুল্য, অনাবিল ও অভ্যস্ত শব্দ অসুবিধার কারণ হয় না। কিন্তু ছাড়া ছাড়া [ইর্‌রেগুলার ও ইনটারাপটেড্] অনভ্যস্ত শব্দ পীড়াদায়ক হয়। ফ্যাকটরির অভ্যন্তরে বাহির হতে কোনও শব্দ এলে উহা বিরক্তিকর হয়। কিন্তু ফ্যাকটরির অভ্যন্তরের [অভ্যস্ত] শব্দ ক্ষতিকর হয় নি। তত্রাচ এই শব্দ যথাসম্ভব কমানো উচিত। মোটর চালকগণ জানেন যে, শ্রমিকরা গাড়ির হর্নে সরে যায় না। এর কারণ বাহিরে এসেও যন্ত্রের ঘর্ ঘর্ ধ্বনি তাদের কানে লেগে থাকে। এইজন্য বহুক্ষণ বাহিরের কোনও শব্দ তারা ঠিক ভাবে শুনে না। বহু শ্রমিক ফ্যাকটরি কক্ষে শব্দের মধ্যে পরস্পরের সাথে উচ্চৈঃস্বরে বাক্যালাপ করে। এর ফলে বাহিরে এসেও ঐ ভাবে উচ্চনাদে তারা কথা বলেছে। এই জন্য তারা অতি শীঘ্র ফেটিগ্ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সম্বন্ধে শ্রমিকদের সাবধান হওয়া উচিত। উত্তাল শব্দের মধ্যে নিম্ন স্বরে কথা কইলে বরং তা ভালো শুনা যায়। এ'জন্য শব্দবহুল ফ্যাকটরিতে প্রয়োজন হলে নিম্ন স্বরে কিংবা ইশারাতে কথা বলা ভালো।

৯

দৈব-দুর্ঘটনা

এই দুর্ঘটনাকে ইংরাজিতে অ্যাকসিডেন্ট বলা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য যে, অ্যাকসিডেন্টের কারণে শ্রমিকদের মত মালিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই দৈবদুর্ঘটনার জন্যে মালিকদের ক্ষতি পুরণ বাবদ অর্থ দিতে হয়। শ্রমিকরা চিরজীবনের মত ইহাতে বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে। তারা এতে কর্মে অক্ষম হলে তাদের রুজি রোজগার নষ্ট হয়। এর ফলে অপরের গলগ্রহ হয়ে এরা মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে। মালিকদেরও এজন্য বহু দ্রব্য ও যন্ত্র ধ্বংস হয়ে থাকে এবং তজ্জনিত তাদের উৎপাদন হ্রাস হয়ে থাকে। উপরন্তু নূতন শ্রমিক নিযোগ ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষা বাবদ তাদের বহু ক্ষতি হয়। উদ্যোগ-শিল্পে এই দৈব-দুর্ঘটনা নিবারণের প্রয়োজন সর্বাধিক। বর্তমান প্রবন্ধে দৈব-দুর্ঘটনার মূল কারণসমূহ এবং উহার সংখ্যা কমানোর উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করবো। তৎসহ কতো প্রকার দৈব-দুর্ঘটনা উদ্যোগ-শিল্প ক্ষেত্রে দেখা যায় তাও বলবো। সাধারণতঃ বহু প্রকারের দৈব-দুর্ঘটনা দেখা যায়, যথা (১) যান্ত্রিক, (২) বৈদ্যুতিক, (৩) দ্রব্যগত, (৪) কায়িক ইত্যাদি। মালিকদের অবহেলা এবং শ্রমিকদের অসাবধানতাও নিবারণ-যোগ্য বহু দৈব দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

(১) যান্ত্রিক দুর্ঘটনা :—শ্রমিকদের অসাবধানতাবশতঃ তাদের

দেহাংশ যন্ত্রে প্রবিষ্ট হলে দৈব দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রের দোষের জন্য বিনা দোষে শ্রমিকদের আহত হতে হয়। দৈব-দুর্ঘটনার কারণে যন্ত্র বিকল হলে কিংবা উহা বিনষ্ট হলে মালিকের আর্থিক ক্ষতি হয়। কিন্তু সেই সাথে শ্রমিকের জীবনহানি ও অঙ্গহানিরও সম্ভাবনা আছে। প্রথমোক্ত দৈব-দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতি অর্থের দ্বারা পূরণ করা যায়। কিন্তু শ্রমিকদের দৈহিক ক্ষতি অর্থ দ্বারা পূরণ করা যায় না। [আর্থিক ক্ষতি পূরণ এখানে নগণ্য।] বলা বাহুল্য যে, জীবন ও হৃত অঙ্গ ফিরে পাওয়া সম্ভব হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের কোনও প্রশ্ন থাকতো না। বহু ক্ষেত্রে মেসিন খারাপ হয়েছে বা তা খারাপ হতে চলেছে বুঝেও ফোরম্যানরা তা মেরামত করার প্রয়োজন মনে করেননি। শ্রমিকদের এতে কাজ করতে প্রায়ই তাঁরা মানা করেন নি। এমন কি এই সম্পর্কে শ্রমিকদের তাঁরা সাবধান পর্যন্ত করেন নি। এই সব বিপদ সঙ্কুল যন্ত্র অভিজ্ঞ শ্রমিকদের বিনা বিপদে চালাতে দেখে তারা ধরে নেন যে নবাগতরাও উহা অনুরূপ ভাবে চালাতে পারবে। এর ফলে নবাগত তরুণ শ্রমিকরা ঐ কষ্টসাধ্য যন্ত্রগুলি চালাতে গিয়ে প্রায় দৈব-দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। প্রায়শঃ ঐ সকল যান্ত্রিক গোলযোগ এই নবাগত তরুণ শ্রমিকদের পূর্বাহ্নে জানানো হয় নি। বহু নবাগত যুবককে সম্ভাব্য যান্ত্রিক বিপদ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়াও হয় না। এইজন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা তারা অবলম্বন করে নি। এইবার এই যান্ত্রিক দৈব-দুর্ঘটনা নিবারণের বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে বিবৃত করা যাক।

ধারালো ফলা যুক্ত গিলটিন যন্ত্রসমূহে এমন লৌহ-ফ্রেম যুক্ত থাকা উচিত—যাতে ঐ ক্ষুরধার ফলক পতনের সাথে কর্মরত শ্রমিকের দেহ উহা দূরে সরিয়ে দিতে পারে। কিংবা ঐ সকল যন্ত্র এমন লম্বা স্লিট্ যুক্ত ঢাকনা দ্বারা আবৃত রাখতে হবে যাতে কর্তনার্থে লৌহ-সিট্ উহাতে ঢুকানো

গেলেও কোনও অঙ্গ তাতে ঢুকবে না। এতদ্‌ব্যতিরেকে বিপদ সঙ্কুল যন্ত্রাদির চতুর্দিকে লোহার রেলিঙ্‌ দ্বারা ঘিরে রাখা ভালো।

[বহুক্ষেত্রে বহুকাল মেসিনের বিভিন্ন স্ক্রু ও নাট্‌বোল্ট্‌ পরীক্ষা করে আঁটা হয় না। অথচ বহুকাল ব্যবহারে উহারা সাধারণ কারণে উপর্যুপরি জার্কিঙ্‌-এর জন্য আলগা হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকরা জানেন যে, উষ্ণতা ধাতুর প্রসারণ এবং শৈত্য উহার সঙ্কোচন ঘটায়। এজন্য শীতকালে ঐ আলগা নাট্‌-বোল্ট্‌ হঠাৎ পড়ে যায় না। গ্রীষ্মকালে মেটালের প্রসারণে ঐ আলগা নাট্‌-বোল্ট্‌ খসে পড়ে। তজ্জনিত কব্জাগুলি খসে মেসিনে ঢুকে যায়। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সমগ্র মেসিন ভেঙে-চুরে দৈব দুর্ঘটনা ঘটায়। প্রকৃত বিষয় না বুঝে একত্রে এতোগুলি মেসিন ভাঙার কারণ স্বরূপ কর্তৃপক্ষ উহাকে স্যাবোটেজ ভাবেন। কিন্তু দেখা যায় যে উপরোক্ত কারণে গ্রীষ্ম শুরু হওয়ার সাথে সাথে একত্রে বহু মেসিন ঐ ভাবে ভেঙে পড়ে।]

সহজ যন্ত্রসমূহে নবাগত যুবক শ্রমিকদের এবং জটিল যন্ত্রসমূহে পুরাতন অভিজ্ঞ শ্রমিকদের নিয়োগ করা ভালো। যুবকরা প্রায় অহেতুক সাহসিকতা [Bravado] দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বেপরোয়া ভাব থাকে। কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতার সাথে এই সব ত্রুটি তারা শুধরে নেয়। এজন্য বিপজ্জনক যন্ত্রাদিতে মাত্র অভিজ্ঞ শ্রমিকদেরই নিয়োগ করা উচিত। এইভাবে বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য উপযুক্ত শ্রমিক নির্বাচন দ্বারা দৈব দুর্ঘটনা নিবারণ করা যায়।

[কয়টি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে স্বল্প দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মজদুরকে যন্ত্রে তৈল দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করা হয়। ঐ ব্যক্তি চোখে ঝাপসা দেখাতে তৈল-ক্যান যন্ত্রের ফ্রেমে না রেখে যন্ত্রের মধ্যে ফেলেছে। এর ফলে

সমুদয় যন্ত্রটি ভেঙে-চুরে গেছে। কিন্তু মালিকরা একে স্যাবোটেজ বলে ধরে নেন।]

যান্ত্রিক গোলযোগের সামান্য মাত্র সম্ভাবনা থাকলে উহা মেরামত না করে কোনও শ্রমিককে ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত হবে না। এজন্য দ্রব্যোৎপাদন ব্যাহত হলে তজ্জনিত ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া উচিত। নবাগত শ্রমিকদের যন্ত্রের সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। খুব বেশি পাকাপোক্ত না হলে কোনও শ্রমিককে একক ভাবে বিপজ্জনক যন্ত্র চালাতে দেওয়া অন্যায়। তাদের সাথে এক অভিজ্ঞ শ্রমিককে মোতায়েন রাখা ভালো। এই অভিজ্ঞ শ্রমিককে নবাগত শ্রমিকের বিপদ কোথায় তা সরজমিন বুঝিয়ে দিতে হবে। এইরূপ শিক্ষাকে বিপদ-নিবারণ শিক্ষা বলা যেতে পারে। যন্ত্র-পরিচালনা শিক্ষা এবং বিপদ-নিবারণ শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দরদের অভাবে মালিকগণ একটু মাত্রও অবহিত হতে চান না।

বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রবিদ্‌গণের শ্রমিক-দরদী মন না থাকাতে যন্ত্র নির্মাণকালে তাঁরা উহার পরিচালকদের বিপদাপদ সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। তাঁদের মতে যন্ত্রের দ্বারা সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে চিন্তা করলে অধিক উৎপাদনশীল যন্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। উহাতে যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস ঘটবে। আমি মনে করি যে, এই উভয় বিষয় স্মরণ রেখে যন্ত্রবিদ্ ইঞ্জিনিয়ারদের যন্ত্র নির্মাণ করা উচিত হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজন মত তাঁরা দেহ-বিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানী পণ্ডিতদের সাহায্য নিতে পারেন। যন্ত্রের সামান্য একটি লিভার একটু এদিক ওদিক করে স্থাপন করলে বহু দৈব-দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। যাঁরা যন্ত্রকে অ্যাক্সিডেণ্ট প্রুফ করে তৈরি করেন তাঁরা জাতির নমস্য ব্যক্তি। এজন্য বহু প্রকার দুর্ঘটনা প্রতিরোধক বা অ্যাক্সিডেণ্ট গার্ড তৈরি করা যেতে পারে।

বহু ক্ষেত্রে বলা হয় যে দৈব-দুর্ঘটনা প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের দোষে হয়নি। এঁদের মতে বহু দৈব-দুর্ঘটনা আশাতীত ভাবে [অজ্ঞাত-কারণে] ঘটে থাকে। এইরূপ দৈব-দুর্ঘটনা যথাযথ সাবধানতা সত্ত্বেও ঘটে। এইজন্য উহা নিবারণ করা মানুষের সাধ্যাতীত।

আমার মতে আমাদের সীমিত [limited] বিদ্যাবুদ্ধির জন্যে আমরা এইরূপ বলি। আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে উহাদের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। এজন্য প্রতিটি দৈব-দুর্ঘটনার জন্য [যন্ত্রগত ও উহার ফিটিং গত] কারণ যথাযথ ভাবে তদন্ত করা উচিত। এই তদন্ত শুধু মাত্র এই সব যন্ত্র বা দ্রব্য সম্বন্ধে করলে চলবে না। এই তদন্তে ঐ সকল যন্ত্রের উপকরণ [যে বস্তু দ্বারা উহা তৈরি] সম্বন্ধেও তদন্ত করতে হবে।

(২) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা :—বৈদ্যুতিক অ-ব্যবস্থাতে ও ভূল ভ্রান্তির জন্যে উদ্যোগ-শিল্পে বহু দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। বৈদ্যুতিক তার স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা এদেশে বিরল নয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও উহার তার স্থাপন ও ব্যবহারে একটু সাবধানতা গ্রহণ করলে উহা নিবারণ করা যায়। প্রায়ই শুনা যায় যে বৈদ্যুতিক তার উহার স্তম্ভ বিচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়াতে এই দৈব-দুর্ঘটনা ঘটেছে। বহুকাল ব্যবহারে পদার্থ মাত্রই কম জোর হয়ে যায়। কিন্তু উহা কতটা কম জোর হলো তা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা হয় না। উপরন্তু শ্রমিকরা প্রায়ই রবারের জুতা, দস্তানা এবং রবার আবৃত হ্যাণ্ডল যুক্ত প্লাস ব্যবহার করেন না। অধিক ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ধ্বংসকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে এবং উহার আধারভূত যন্ত্রের কার্য-কারণ সম্বন্ধে—সমধিক জ্ঞানের অভাবে মানুষ তার মহা কল্যাণকর এই বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা নিহত হয়েছে।

(৩) দ্রব্যগত দুর্ঘটনা :—কোনও ভারী দ্রব্য মস্তকে পড়লে শ্রমিকদের

আহত বা নিহত হতে হয়। ক্রেনের তার ছিঁড়ে প্রায় এইরূপ অঘটন ঘটেছে। এর কারণ,ঐ তার যথাযথ ভাবে প্রতি দিন পরীক্ষা করা হয় না। বহু ক্ষেত্রে মেসিন হতে দ্রব্য বা পদার্থ [তরল] ছিটকে পড়ে শ্রমিকদের আহত করে। ত্রুটিপূর্ণ মেসিন চালানোর জন্যে যত্র তত্র ইহা ঘটে থাকে। উপর হতে পড়া ইঁট, পাথর ও মাল দ্বারাও বহু ব্যক্তি আহত হয়েছে। এইরূপ বিপদের সম্ভাব্য স্থান ঘিরে রাখলে অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এইরূপ বিপদ এড়াতে পারে। মই ও ভারাতে উঠবার কালে উহাদের ক্ষমতা ও অবস্থা সম্বন্ধে প্রায়ই বিবেচনা করা হয় না। ভাগ্যবিশ্বাসী ভারতীয় শ্রমিকরা সর্ব বিষয়ে তাদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকে।

[নিরাপত্তা সপ্তাহ বা সেফটি উইকের প্রবর্তন করে প্রায়ই শ্রমিকদের তাদের দৈব-দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ সকল বিপদ নিবারণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তারা শিক্ষা পায় না। কেবল মাত্র 'বিপদ—বিপদ' বলে ভয় দেখালে ফল আরও খারাপ হয়। এতে শ্রমিকরা অযথা ভীত হয়ে মনোবল হারায় এবং এতদ্বারা দৈব-দুর্ঘটনার কারণ ঘটায়। এইভাবে কাজ করলে শ্রমিকরা বিপদে পড়বে না—এইটুকু মাত্র তাদের বুঝিয়ে বলা দরকার। কিন্তু বিভিন্ন যন্ত্রের বিপদ বিভিন্ন হওয়ায় শ্রমিকদের বিভিন্ন দলকে পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার। এইজন্যে এদের এক এক দলের জন্য পৃথক পৃথক ক্লাশে পৃথক পৃথক শিক্ষা দেওয়া দরকার। কিন্তু আমি দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, এ বিষয়ে কতৃপক্ষের প্রোপাগাণ্ডা করার ঝোঁক অধিক। বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের এতে কোনও উপকার হয় না।]

(৪) কায়িক দুর্ঘটনা :—শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক কারণে দৈব-দুর্ঘটনা ঘটলে উহাকে শ্রমিক-বিজ্ঞানে কায়িক দৈব-দুর্ঘটনা বলা

হয়ে থাকে। আমরা গৃহ-নির্মাণ রত বহু মিস্ত্রিকে উঁচু ভারা হতে পড়ে মৃত্যু বরণ করতে দেখেছি। বহুক্ষেত্রে বৃষ্টির জন্যে পিছল বা মসৃণ হওয়াতে ইহা ঘটে থাকে। অতএব নিশ্চয়ই ইহা নিবারণ-যোগ্য—বহু ক্ষেত্রে ক্রেনের দড়ি ছিঁড়ে পড়াতে বা বংশ বা লৌহদণ্ড ভাঙাতে ভারী দ্রব্য দ্বারা পিষ্ট হয়ে এরা আহত হয়েছে। মাল-মশলা নিকৃষ্ট হওয়াতে বহু শ্রমিক ভেঙ্গে পড়া পাঁচিল বা ছাদ চাপা পড়ে আহত হয়েছে। বয়লার ফেটে শ্রমিকদের আহত হওয়া কোনও এক স্বাভাবিক ঘটনা নয়। ঐ বয়লার ফাটার কারণ এবং উহার সম্ভাবনা না বুঝার জন্য কেহ না কেহ দায়ী। অসাবধানতা বশতঃ এদের দেহাঙ্গ যন্ত্রে ধৃত হওয়াতে বহু শ্রমিক আহত হয়েছে। আঁট সাঁট হাফপ্যাণ্ট ও গেঞ্জি না পরে ঝলঝলে ধুতি আদি পোশাক পরে কাজ করলে এরূপ প্রায়ই ঘটে। যন্ত্রের দোষের বদলে শ্রমিকের নিজ দোষে দৈব-দুর্ঘটনা ঘটলে ইহাকে কায়িক দৈব-দুর্ঘটনা বলা হবে। এইরূপ বহু দৈব-দুর্ঘটনা শ্রমিকদের অমনোযোগিতার জন্যেও ঘটে গিয়েছে। একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিক বৎসরের পর বৎসর বিনা বিপদে কাজ করেছে। তা সত্ত্বেও সে একদিন হঠাৎ এক নিদারুণ দৈব দুর্বিপাকে পড়ে গেল। এই ক্ষেত্রে নিজের উপর অতি বিশ্বাস থাকা এবং দারুণ যান্ত্রিক গোলযোগ অগ্রাহ্য করার জন্যও এরূপ ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তার অমনোযোগিতা ও বেপরোয়া ভাবই এর একমাত্র কারণ। কিন্তু একজন মনোযোগী ও সাবধানী প্রবীণ শ্রমিকের মধ্যে এই অসাবধানতা ও অমনোযোগিতা কেন এল? এইরূপ অকস্মাৎ দৈব-দুর্ঘটনার পর ইহা আমাদের তদন্ত করে বার করা উচিত। শ্রমিক-দের এই কায়িক দৈব-দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ সমূহ নিম্নে বিবৃত করা হলো।

(ক) দুর্ঘটনা প্রবণতা :—এই দুর্ঘটনা প্রবণতাকে ইংরাজিতে বলা যায় প্রোন্নেস [Pronness]। এক একজন শ্রমিকের মধ্যে এই দুর্ঘটনা প্রবণতা থাকে। এ'জন্য আমরা একই ব্যক্তিকে বারে বারে দুর্ঘটনাতে পড়তে দেখি। দুর্ঘটনা ভীতি এদের মধ্যে খুব বেশি দেখা গিয়ে থাকে। প্রোপাগাণ্ডা মূলক দুর্ঘটনা সম্পর্কিত পোস্টার এদের ভীতি আরও বাড়িয়ে দেয়। [ইহার প্রতিষেধক পূর্বে বলা হয়েছে।] সকল ক্ষেত্রে ইহা যে বিচার-বুদ্ধির [জাজমেণ্ট] অভাবের জন্য হয় তা নয়। বহু ক্ষেত্রে এরা এদের কর্মতালকে যন্ত্রের গতির সাথে মিলাতে পারে নি। কয়েক ক্ষেত্রে এদের রি-অ্যাকশন টাইম অতি মাত্রাতে দুর্বল থাকে। এজন্য প্রয়োজন মত এরা ত্বরিত গতিতে হাত বা পা সরাতে পারে নি। এই সকল দুর্ঘটনাপ্রবণ ব্যক্তিরা উদ্যোগ-শিল্পে অনুপযুক্ত শ্রমিক। শ্রমিক ভর্তি কালে এদের বাদ দেওয়া উচিত। কিংবা এদের হাল্কা মেসিন বা অন্য নিরাপদ কার্যে নিযুক্ত করা উচিত।

[শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া-শক্তি বা রি-অ্যাকশন টাইম মাপার জন্যে মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্র আছে। যন্ত্রের বোতামে হাত রেখে এদের উপরের আলো জলা মাত্র তা টিপতে বলা হয়। এই আলো দেখা এবং বোতাম টেপার মধ্যে ব্যয়িত সময়কে ঐ ব্যক্তির রি-অ্যাকশন টাইম বলা হয়। ইহা ঘূর্ণমান ড্রামের কার্ডে বা অন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থাতে ধরা পড়ে। এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগকে এক সিগমা বলা হয়। এই সিগমার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত বি-অ্যাকশন টাইম পরিমাপ করা যায়।]

এতদ্‌ব্যতিরেকে বহু শ্রমিক স্নায়ু-দৌর্বল্য, লো বা হাই ব্লাড্ প্রেশারে ভুগে থাকে। এই রোগ কার মধ্যে কখন আসে তা জানা যায় না। এ জন্য মধ্যে মধ্যে শ্রমিকদের দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা দরকার।

(খ) অসাবধানতা :—বহুক্ষেত্রে শ্রমিকরা হাফ্ প্যাণ্টের বদলে কাপড় পরে কাজ করেছে। এর ফলে এদের কাপড়ের খুঁট যন্ত্রের দাঁতে আটকে গিয়েছে। ক্ষতিকর ধুলা, ধোঁয়া, বায়ু এড়ানোর মত নিবারক-পরিচ্ছদ তারা পরিধান করে নি। আশ্চর্যের বিষয় যে, রবার গ্লোভ্ ও জুতা না পরে এদের পাওয়ার হাউসে কাজ করতে দেওয়া হয়। এদের ব্যবহৃত প্লাস-এর ডাঁটি রবার দিয়ে মোড়া থাকে নি। বহু ক্ষেত্রে এদের ব্যবহৃত চক্ষুর গগল্‌স্ [চশমা] ভাঙা থাকাতে অগ্নিশিখার ছুটন্ত কণিকাতে তারা অন্ধ হয়েছে। ছোট ছোট ধাতুর কণিকা হতে চক্ষু রক্ষা করার জন্য জালিযুক্ত দুর্ঘটনা নিবারক চশমা এদের দেওয়া হয়না। উপরন্তু এদেশের শতকরা ৪০ ভাগ শ্রমিকের চক্ষু খারাপ থাকে। প্রোটিনহীন খাদ্য গ্রহণ এবং অতি পরিশ্রম এর জন্য দায়ী। চক্ষু হানি অপেক্ষা মৃত্যুও বোধ হয় মঙ্গলকর হয়ে থাকে। নকল হাত-পা দ্বারা হয়তো কাজ চালানো যায়। কিন্তু নকল চোখ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। শ্রমিকদের প্রদত্ত গ্যাস-মাস্ক, রবার দস্তানা ও লৌহ শিরস্ত্রাণ ত্রুটি পূর্ণ হয়ে থাকে।

(গ) কর্ম-ক্লান্তি :—বহু ক্ষেত্রে দৈহিক, মানসিক ও স্নায়বিক কারণে দৈহিক দুর্ঘটনা সমূহ ঘটে থাকে। এই কর্মক্লান্তি শ্রমিকদের সহসা অন্যমনস্ক করে তুলে। ঘরের সদ্য ঘটা অশান্তি বহু ক্ষেত্রে হঠাৎ-দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এই দৈহিক, মানসিক এবং স্নায়বিক কর্মক্লান্তির স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কয়েক ক্ষেত্রে দ্বিধা বিভক্ত মনোযোগ [ডিভাইডেড্ অ্যাটেন্‌শন্] এবং হঠাৎ চিত্ত-বিক্ষোভ এবং অসুস্থতার কারণেও দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে। এজন্য অসুস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা কর্ম করানো অনুচিত হবে। বহু ক্ষেত্রে ফেটিগ্ কমানোর জন্য ফ্যাকটরিতে রেডিও যোগে গীতের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ইহা মাত্র হাল্কা যন্ত্র-সঙ্গীত হলে ফল উত্তম হয়। কিন্তু কণ্ঠ-সঙ্গীতে এর ফল

বিপরীত হয়ে থাকে। কর্মকালে এ গানের কথা বুঝার চেষ্টাতে এদের মনোযোগ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে থাকে। এই কারণেও বহু দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

(ঘ) দৃষ্টিহীনতা:—বহু শ্রমিকের দৃষ্টিশক্তি কম থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে উহা শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি হয়। কিন্তু এ বিষয়ে যথোচিত পরীক্ষা না করে তাদের ভর্তি করা হয়। এই দৃষ্টি-শক্তির স্বল্পতার কারণেও বহু দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। দৈহিক কো-অর্ডিনেশনের অভাবও এই দৈব-দুর্ঘটনার কারণ হয়েছে। কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতা উদ্যোগ-শিল্পে দৈব-দুর্ঘটনার প্রধান কারণ।

(ঙ) মনো-প্রদমন:—বহু শ্রমিক [মেয়েদের মধ্যে অধিক] একটু ভীতু স্বভাবের হয়ে থাকে। কিন্তু কার্য কালে তারা জোর করে তাদের ভীতি প্রদমন করে। কিন্তু এই প্রদমিত ভয় তাদের দুর্বল মুহূর্তে কখন যে বার হবে তার স্থিরতা নেই। এই প্রদমিত ভয়ের হঠাৎ বহির্বিকাশের কারণেও বহু দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এই ভয় প্রদমিত না করে আত্মবিশ্লেষণ ও বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা উহা বিদূরিত করা উচিত।

(চ) অস্থিরতা:—বাটী ফিরার তাগিদে বা অন্য কারণে শ্রমিকদের মনে অস্থিরতা আসে। প্রায় দেখা গিয়েছে যে ডে-সিফটের [দিবা] শেষে এবং নাইট সিফটের প্রথমে অধিক দৈব-দুর্ঘটনা হয়। ডে-সিফটের কর্মীরা শান্ত মনে প্রথমে কাজ শুরু করে। কিন্তু শেষের দিকে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠে। বহুক্ষণ কর্মবিরতির পর নাইট-সিফটের কর্মীরা কার্যে এসে প্রথমে উত্তেজিত থাকে। কিন্তু ভোরের শান্ত পরিবেশ তাদের শান্ত করে। বাড়ি ফিরার তাগিদ,

কিংবা ক্ষুধার উদ্রেক, স্বাভাবিক বায়ু চলাচল এবং উপযুক্ত রূপ আলোক এবং উত্তাপ বা শৈত্য শ্রমিকদের দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সকল পরিবেশ সম্ভূত প্রতিকূল বা অনুকূল ব্যবস্থার উপর এই দৈব-দুর্ঘটনা ঘটা বা না ঘটা নির্ভর করে। অসুবিধার মধ্যে কাজ করলে কিংবা কর্মচাতুর্যের অভাব ঘটলে এবং দাঁড়াবার বা বসবার বেকায়দাতেও দৈহিক ভারসাম্য হারিয়ে বহু শ্রমিক দুর্ঘটনাতে পতিত হয়েছে।

(ছ) স্বয়ংক্রিয়তা :—বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পেশীর অতি স্বয়ংক্রিয়তা দৈব দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে হঠাৎ এদের এক মেসিন হতে অপর মেসিনে কাজ করতে দেওয়া হয়। পূর্ব মেসিনে সৃষ্ট [অভ্যস্ত] কর্মতাল এবং স্বয়ংক্রিয়তা নূতন মেসিনে খাপ খাওয়াতে সময় লাগে। কিন্তু ঐ জন্য যথেষ্ট সময় এদের না দিয়ে এদের উৎপাদন বাড়াতে বলা হয়। পেশীর এই অতি স্বয়ংক্রিয়তার জন্যে এরা অতর্কিতে নিজেদের হাত বা পা এগিয়ে বা পিছিয়ে এনেছে। এর ফলে এরা অতর্কিতে দৈব-দুর্ঘটনাতে পতিত হয়েছে।

(জ) পরিবেশ :—চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অনুক্রমিক বোধ-কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কে আছে। অতি শব্দের মধ্যে থেকে কিংবা অন্ধকারে বহু কাল কাজ করলে মস্তিষ্কের ঐ সকল বোধ-কেন্দ্র নিস্পৃহ হয়ে উঠে। ইহার দ্বারা শ্রমিকদের মধ্যে মানসিক বধিরতা বা দৃষ্টি-হীনতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে সতর্কীকরণী শব্দ সময় মত এরা শুনতে পায় নি। অন্ধকারে বা স্বল্প আলোকে কাজ করলে ঐ আধ-আঁধার [আলো-ছায়া] তাদের মধ্যে দৃষ্টিভ্রম আনে। এতে দূরের দ্রব্য কাছে ও কাছের দ্রব্য দূরে এবং উঁচু দ্রব্য নীচে এবং নীচু দ্রব্য উঁচুতে মনে হয়। এই কারণে তারা প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনে অপারক হয়েছে। কম-বেশি উত্তাপ ও আলোছায়া জনিত বিভিন্ন স্তরের আলো ও বায়ুর

বিভিন্নরূপ ঘনত্বের জন্য বায়বীয় মরীচিকা কিংবা রিফ্র্যাকশন সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। খনিগর্ভে [মাইন] কর্মরত শ্রমিকদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। বাহিরের সমুজ্জ্বল দিবালোক হতে হঠাৎ খনিগর্ভের অন্ধকারে এসে চক্ষু অভ্যস্ত না করে চলা-ফেরাতেও বহু খনি-শ্রমিক দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

(ঝ) মতিভ্রম :—কখনও কখনও মানসিক কারণে শ্রমিকদের মতিভ্রম হয়। এই সময় মরণ যেন তাদের নিজের কাছে ডাকতে থাকে। এ সময় এরা এমন কাজ করে যা স্বাভাবিক মনে তারা করে না। কোনও উঁচু ছাদে উঠে কেহ নীচুতে 'লাফাই-লাফাই' মনে করলে লাফাবার এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাদের পেয়ে বসে। রাত্রে গভীর জলাশয়ের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকলেও এইরূপ অনুভূতি মনে স্থান পায়। এই সময় কোনও কারণে মনের প্রতিরোধ-শক্তি দুর্বল হলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরা বহু অঘটন ঘটিয়ে ফেলে। কিন্তু ইহার মূলে থাকে অন্য কারণে আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রসূত কোনও এক প্রদমিত মনো-জট [কমপ্লেক্স]। মনোবিশ্লেষণ দ্বারা শ্রমিকদের এই সব মনোজটের মূল কারণ খুঁজে বার করে বাক্-প্রয়োগ দ্বারা তাদের নিরাময় করা যেতে পারে।

বি: দ্র:—মানসিক বধিরতা এবং দৃষ্টিহীনতা প্রাপ্ত কয়জন শ্রমিককে পরীক্ষার জন্য শব্দবহুল আধ-অন্ধকার ফ্যাকটরি হতে সরিয়ে এনে আমার গ্রামের নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রে আমি পাঠাই। এই সাথে তাদের হরমোন ইনজেকশন এবং প্রোটিন খাদ্য প্রদান করা হয়। ফলে, মস্তিষ্কস্থ তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি সম্পর্কিত বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অনুক্রমিক বোধ-কেন্দ্রগুলির উপর চাপ না পড়াতে ঐগুলি পুনরায় সতেজ হয়ে উঠে। এই ভাবে এরা ধীরে ধীরে ঐ সকল মানসিক রোগ হতে মুক্ত হয়। এই পরীক্ষা

হতে বুঝা যায় যে ঐন্দ্রিক দৃষ্টিহীনতা এবং বধিরতার মত মানসিক বধিরতা ও দৃষ্টিহীনতারও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু উহা ঐন্দ্রিয়িক বধিরতা এবং দৃষ্টিহীনতা হলে তাহা দৈহিক চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করার প্রয়োজন হয়। এজন্য ছয় বৎসর অন্তর এদের ঐন্দ্রিক দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি সম্বন্ধেও নিশ্চিত হবার জন্য ডাক্তারী পরীক্ষা করানো উচিত।

[পরিসংখ্যা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে তাপমাত্রা এবং ফেটিগ বাড়ার সাথে দৈব-দুর্ঘটনার সংখ্যাও বেড়ে যায়। জোর করে সামান্য উৎপাদন বৃদ্ধি বহু সংখ্যক দৈব-দুর্ঘটনার কারণ হয়। প্রখর গ্রীষ্মের দুপুর বেলাতে দৈব-দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যায়। এই সব অসুবিধাতে ওদের অভ্যস্ত হওয়ার পর অবশ্য ঐরূপ দুর্ঘটনা কম ঘটে।

মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে আপন তাঁবে এনে উদ্যোগ-শিল্পে উহাকে আজ নিয়োগ করেছে। তাই সে নিজ সৃষ্ট এই নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে বাধ্য। অন্যথায় সে নিজের সৃষ্টি দ্বারা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য আমাদের প্রধান কর্তব্য এই নূতন পরিবেশের উপযুক্ত করে শ্রমিকদের তৈরি করা। এজন্য যথেষ্ট গবেষণা করার প্রয়োজন আছে। 'এইটুকুর জন্যে বেঁচে গেছে' কিংবা 'যাক্! স্বল্প আঘাতে রক্ষা পেল', ইত্যাদি বাক্যালাপ সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রায় শুনা যায়। কিন্তু এইরূপ অহেতুক আত্মশ্লাঘার দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান হয় না। ইহার নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু উহা সুষ্ঠু ভাবে করতে হলে ফ্যাকটরি সমূহের দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা [ফ্রিকোয়েন্সি] প্রথমে বার করতে হবে। ইহা ব্যতিরেকে এ সম্পর্কে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্ভব নয়। ফ্যাকটরি'তে দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা অধিক হলে বুঝতে হবে যে ঐ স্থানের ব্যবস্থাপনাতে যথেষ্ট গোলযোগ আছে।

এইবার ঐ দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা [frequency] বার করার উপায় সম্বন্ধে আমি আলোচনা করবো। কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মী সম্বলিত ফ্যাকটরিতে সংঘটিত দৈব-দুর্ঘটনার সংখ্যা দ্বারা এই দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা নির্ধারিত হয়। ধরা যাউক সম্বৎসরের মধ্যে এক হাজার কর্মী সম্বলিত ফ্যাকটরিতে পাঁচ শত দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হলো। এখানে দৈব দুর্ঘটনার বাৎসরিক উগ্রতা ধরা যেতে পারে [১০০০ – ৫০০=৫০০] পাঁচ শত। কিন্তু এতো সহজে ফ্যাকটরিতে দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা সুচারুরূপে নির্ণয় করা যায় না। কারণ, বৎসরের প্রতিটি দিনের প্রতিটি ক্ষণ ঐ সংখ্যক শ্রমিকরা ফ্যাকটরিতে শ্রম করে নি। ধরা যাউক, এক হাজার শ্রমিক সপ্তাহে মাত্র এগারো সিফটে কাজ করেছে। এর পর দেখতে হবে তারা ঐরূপ কতো সপ্তাহ কাজ করেছে। ধরা যাউক, অনুসন্ধানে জানা গেল যে তারা বৎসরে মাত্র ঐ ভাবে সপ্তাহ প্রতি ১১ সিফট করে ৫১ সপ্তাহ কাজ করলো। এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সারা বৎসরে মাত্র [৫১ × ১১ × ১০০০= ৫৬১০০০) পাঁচ লক্ষ একষট্টি হাজার ওআর্কার সিফট কাজ করেছে। এই ভাবে অঙ্ক কষে বুঝা যায় যে এক হাজার শ্রমিক বৎসরে পাঁচ লক্ষ একষট্টি হাজার সিফট কাজ করে মাত্র পাঁচশত দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু দৈব- দুর্ঘটনার ফ্রিকোয়েন্সি বা দুর্ঘটনা-উগ্রতা বার করতে হলে প্রতি সিফটে কতো ঘণ্টা কাজ করা হলো তা অগ্রে বার করা দরকার। ধরা যাউক, এই শ্রমিক বৎসরে একান্ন সপ্তাহ এবং প্রতি সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা কাজ করেছে। তাহলে তারা এক হাজার ঘণ্টা কাজের মধ্যে কতোগুলি দৈব-দুর্ঘটনা ঘটালো ? এই তথ্যটি দৈব-দুর্ঘটনার ফ্রিকোয়েন্সি বার করার জন্য প্রথমে জেনে নিতে হবে। [৫১ × ৪৮ × ১০০০]। এই হিসাব মত ঐ ফ্যাকটরির বাৎসরিক দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা হবে

$\frac{৫১ \times ৪৮}{১০০০}$ = ২'৪৪৮। এইভাবে আমরা দৈব-দুর্ঘটনার বাৎসরিক উগ্রতা [**frequency**] অনুধাবন করে ফ্যাকটরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি।

খনি-গর্ভের দৈব-দুর্ঘটনার জন্য অধিক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকরা দায়ী থাকেন। [কোনও স্থানে বিপদ জ্ঞাপক পাগলা ঘণ্টার ব্যবস্থা আজও করা হয় নি। উপরের সাথে নীচে টেলিফোনের সংযোগও থাকে না।] মালিকের অতি মুনাফা লাভের স্পৃহা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হয়। এইজন্য মজবুত শালবল্লী ছাদে লাগিয়ে উহার ধ্বস নিবারণ করা হয় না। বহু ক্ষেত্রে খনিজ দ্রব্য অপসারণের পর উহার ফাঁক যথাযথ ভাবে বালু দ্বারা ভর্তি করা হয় নি। এমন কি স্বাভাবিক কয়লা বা খনিজ দ্রব্যের স্তম্ভগুলি পর্যন্ত অপসারণ করা হয়। [মাটির তলাতে দ্রব্য না থাকলেও মালিকরা কর্মীদের বলেন যে উহা আরও বেশি উঠানো হয় না কেন ?] সামান্য গ্যাস জাত হলে উহার বৃদ্ধি অনুধাবন না করে উহাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ইলেকট্রিক টর্চের আলোর বদলে আজও কেরাসিনের আলো ব্যবহার করা হয়। ধূমপান আদি সেখানে যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। দায়িত্বশীল অফিসারগণ কখনও মাটির উপর হতে উহার নীচে নামতে চান না। শ্রমিকদের আত্ম-রক্ষার্থে গ্যাসমাস্ক প্রভৃতি এবং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাদি তাদের সাথে দেওয়া হয় না। খনি আইন লঙ্ঘন করার জন্যে অধিক ক্ষেত্রে দৈব-দুর্ঘটনার কারণ হয়। কনট্রাক্টারের অধীনে নভিশ কর্মী নিয়োগ খনি-দুর্ঘটনার অপর এক কারণ।

১০

শ্রমিক-ভর্তি

সাধারণতঃ ফ্যাকটরিতে কর্মের প্রয়োজনে কোনও এক পদ [post] সৃষ্ট হয়। পরে ঐ পদের জন্য উপযুক্ত কর্মীকে নির্বাচন করা হয়। এখানে কর্মের প্রয়োজনে পদ সৃষ্টি করে ঐ পদেব প্রয়োজনে কর্মী সংগৃহীত হয়। অধুনা দেখা গিয়েছে যে স্বজন পোষণের জন্য প্রথমে একজন কর্মী [মানুষ] ঠিক করা হয় এবং তারপর ভাবা হয় যে তাকে তার উপযুক্ত কি পদ দেওয়া হবে। এর পর ঐ পদের উপযুক্ত কোনও কর্ম ঠিক করা হয়। এখানে কর্মীর প্রয়োজনে পদ এবং ঐ পদের প্রয়োজনে কর্ম তৈরি হয়েছে। সাধারণতঃ স্বজন-পোষণ [নেপোটিজম্] বললে আমরা যা বুঝি তদপেক্ষা এই ব্যবস্থা আরও ক্ষতিকর। এখানে কয়েকজন ব্যক্তিকে নিষ্প্রয়োজনে কাজে বহাল করে অর্থের অপচয় করা হয়।

[কয়েক ক্ষেত্রে ষ্টিল কণ্ট্রোলারকে ফিসারি এক্সপার্ট এবং ফিসারি এক্সপার্টকে ষ্টিল কনট্রোলার করা হয়। এরূপ অবস্থাতে ফলাফল সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। মহাযুদ্ধের সময় এরূপ ঘটনার বিষয় শুনা গিয়েছে। এর ফলে কাজ মন্দ না হলেও ভালো হয় নি। কারণ ঠাট বজায় রাখতে অযথা ব্যয়ভার বেড়ে গিয়েছে। এই অবস্থাতে হেড ক্লার্করা সেখানে প্রকৃত কর্মকর্তা হয়ে উঠে।]

বহু স্থলে কাজ-কর্মে অপারক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। ফলে

সহকর্মীদিগকে নিজেদের কাজ-কর্মের সাথে ঐ ব্যক্তিরও কাজ-কর্ম করে দিতে হয়। উপরন্তু তার অকাজগুলি সারবার জন্যে তাদের বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়। এই অবস্থাতে কর্মচারীদের যৌথ-আনুগত্যের [morale] হানি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সাম্প্রদায়িক নিয়োগ প্রথার প্রচলন থাকা কালীন প্রায়ই এইরূপ ঘটনা ঘটতো। ভুলে গেলে চলবে না যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনও এক দয়া-দাক্ষিণ্যের স্থান নয়।

কারখানাসমূহে তিনটি প্রধান উপাদানের প্রয়োজন, যথা—(১) কাঁচামাল, (২) যন্ত্রপাতি এবং (৩) মানুষ। ইংরাজিতে একে পঞ্চ 'এম্' কার [M] বলা হয়,—মেন্ [men], মনি [money], মেশিন, মাইণ্ড ও মেটিরিয়াল। এই প্রবন্ধে আমি মাত্র উপরোক্ত কয়টি প্রধান উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক নিয়োগের রীতি-নীতি আলোচনা করবো। উদ্যোগ-শিল্পে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক উপাদান বাছাই-এর কাজে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বিত হয়। কারখানার বীক্ষণাগারে কাঁচামাল সমূহ পরীক্ষা না করে তা ক্রয় করা হয় নি। উপরন্তু কর্মকর্তারা ঐ কাঁচা-মালের বাজার দর সম্বন্ধে যাচাই করে তবে তা ক্রয় করেন। কোন যন্ত্রপাতি ক্রয় কালে ইঞ্জিনিয়ারগণ দ্বারা উহাদের উৎকর্ষতা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কারখানায় প্রকৃত সম্পদ শ্রমিক বাছাই করার কোনও সুব্যবস্থা এদেশে নেই।

এদেশের ফ্যাকটরির মালিকরা ভুলে যান যে, সকল ব্যক্তি সকল কাজের উপযুক্ত হতে পারে না। যে ব্যক্তি করনিক রূপে অকৃতকার্য হয়েছেন, সেই ব্যক্তি একজন দক্ষ কারিগর রূপে খ্যাতিলাভ করেছেন। একজন যন্ত্রবিদ্ ফ্যাকটরির এক বিভাগে দক্ষতা দেখালেও সে উহার অন্য বিভাগে অনুরূপ ভাবে দক্ষতা দেখাতে পারে নি। এজন্য সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগী দুই ব্যক্তি পাশাপাশি বসে কাজ করেও সমান

দক্ষতা দেখায় নি। এর কারণ এই যে, প্রতিটি মানুষের মানসিক ও দৈহিক শক্তি সামর্থ্য ও উহাদের গঠন প্রতিটি কাজের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। এই কারণে বহু ব্যক্তি ফ্যাকটরির কাজে অসফল হয়ে কর্মত্যাগ করে চলে যায়। কিংবা কর্তৃপক্ষ লোকসান বাঁচাবার জন্যে তাকে কর্ম হতে বরখাস্ত [পদচ্যুত] করতে বাধ্য হয়।

এই কারণে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ না করলে মালিকরা সবিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। প্রথমতঃ এতে তাদের ফ্যাকটরিতে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর সংখ্যা কমে যায়। দ্বিতীয়তঃ সেখানে অযথা শ্রমিকচ্যুতির হার [লেবার টার্ন আউট] অতি মাত্রাতে বেড়ে যায়। এই শ্রমিকচ্যুতির হার না কমলে উদ্যোগ-শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। এই শ্রমিক-চ্যুতির জন্য মালিকরা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন।

[শ্রমিক প্রবেশের সহিত শ্রমিক নির্গমনের তুলনা করে ফ্যাকটরি সমূহের বাৎসরিক শ্রমিকচ্যুতির হার বার করা হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত রূপে অঙ্ক কষে শ্রমিকচ্যুতির বাৎসরিক হার নিরূপিত হয়।

শ্রমিক প্রবেশ——————১০০
শ্রমিক নির্গমন——————৬০
শ্রমিক চ্যুতি——————৪০

সারা বৎসর ১০০ জন শ্রমিক ভর্তি হলে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ৬০ জন শ্রমিক চলে গেলে ঐ ফ্যাকটরির বাৎসরিক শ্রমিকচ্যুতির হার হবে ৪০ জন। ইংরাজিতে এইরূপ শ্রমিকচ্যুতিকে বলা হয় লেবার টার্ন আউট। এই বাৎসরিক শ্রমিকচ্যুতির হার বেশি হলে বুঝতে হবে

যে ঐ শিল্পের প্রশাসন ব্যবস্থাতে গলদ ঢুকেছে। এর আশু প্রতিকার না হলে সর্বনাশ আগতপ্রায়।]

বিঃ দ্রঃ—কর্মক্ষেত্রে কাজ-কর্মে অপারক হলে সকল শ্রমিক তাদের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যায় না। কিংবা তারা অদক্ষতার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিতাড়িত হয় না। কেউ কেউ কোনও প্রকারে অন্নসংস্থানার্থে তদারকি কর্মীদের অনুগ্রহে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে সকল অসুবিধা সহ্য করে স্বস্থানে রয়ে গেছে। কিন্তু মনের দিক হতে তারা সকল সময় পলায়নপর থাকে। জোর করে কর্মরত থাকাতে তাদের কাজকর্ম ভালো হয় না। শেষ-বেশ এদের বহু ব্যক্তি সুবিধা মত অন্যত্র কাজ নিয়ে চলে যায়। তার ফলে উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন অতি মাত্রাতে ব্যাহত হয়। বহু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের অবিচার ও উৎপীড়নের জন্য বহুজন পদত্যাগ করেছে। এইরূপে শ্রমিক নিষ্ক্রমণের হারকেও বলা হয় শ্রমিকচ্যুতি।

শ্রমিক-চ্যুতির হার বেশি হলে উদ্যোগ-শিল্পে ক্ষতি অসীম। শ্রমিকচ্যুতি জনিত ক্ষতি সম্বন্ধে মালিকদের কোনও ধারণা নেই। এজন্য এই বিষয়ে তাঁরা মনোযোগী হন নি, বরং প্রয়োজনানুযায়ী নিষ্ক্রান্ত শ্রমিকদের স্থলে তাঁরা অবলীলাক্রমে নূতন শ্রমিক নিয়োগ করেছেন। এঁদের কেউ কেউ এও মনে করেন যে এতে লাভ বৈ ক্ষতি নেই। নূতন শ্রমিকের পে-স্কেল নিম্ন হতে শুরু হওয়ায় এতে তাঁরা লাভবান। উপরন্তু স্থায়ী পদে নিযুক্ত হতে এঁদের দেরি হলে কোম্পানির যথেচ্ছাচারের সুবিধা। এ'জন্য কেউ ফ্যাকটরির কর্মে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলে এঁরা উদ্বিগ্ন হন না। [আজকাল একবার ভর্তি করে শ্রমিক ছাঁটাই-এর আইনগত অসুবিধা আছে।] কিন্তু অন্য দিক হতে এঁরা এজন্য ভীতিপ্রদ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এই ক্ষতি সম্পর্কে বিবিধ তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা

হলো। এতে বুঝা যাবে যে, শ্রমিকচ্যুতির ফলে লাভের বদলে লোক-সান হয়ে থাকে।

(১) প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও শিক্ষার [অভ্যাস] অভাবে নূতন শ্রমিকরা ক্ষিপ্রগতিতে স্বল্পকালে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে পারে নি। স্বল্প সময়ে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের জন্য যে কর্মচাতুর্য ও ক্ষিপ্রতা [ক্ষিপ্রগতি] প্রয়োজন তা অর্জন করা সময় সাপেক্ষ হয়ে থাকে। বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রের উৎকর্ষতার অভাব দক্ষ শ্রমিকরা কর্মচাতুর্য দ্বারা পূরণ করে নেয়। কিন্তু পুরানো শ্রমিকদের স্থলাভিষিক্ত নবাগত শ্রমিকরা এই বিষয়ে অপারক হয়।

(২) প্রয়োজনীয় অভ্যাস, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাবে দৈব দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। বহু শ্রমিক এইরূপ দুর্ঘটনাতে আহত হলে কাজ-কর্মের অসুবিধা হয়। [অভিজ্ঞতার অভাবে মেশিনসমূহ এরা ভাঙলে দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষতি হয়ে থাকে।] উপরন্তু এ'জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ মালিকদের বহু অর্থ প্রদান করতে হয়। ঘন ঘন দুর্ঘটনা সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনে। এমন কি সুদক্ষ কারিগরদের মনেও উহা ভীতির সঞ্চার করে।

(৩) শ্রমিক-নিয়োগ বিভাগের কর্মীদের শ্রমিক নিয়োগ কালে উহাদের সহিত মুলকাত [প্রার্থী-সাক্ষাৎ] করতে হয়। এই বাছাই-এর কাজে তাদের যথেষ্ট মেধা ও সময় নষ্ট করতে হয়েছে। উপরন্তু সংশ্লিষ্ট করনিকদের এই জন্যে বহু কাগজ-পত্র [ফর্ম] নষ্ট ও সময় ব্যয় করতে হয়েছে। যে কোনও কারণে ফ্যাকটরিতে শ্রমিক চ্যুতি হোক না কেন সাধারণ দৃষ্টিতে উহা শ্রমিক-ছাঁটাই-এর পর্যায়ভুক্ত হয়। এইজন্য মালিক-দেরও এতে কম বদনামের ভাগী হতে হয় নি। চতুর্দিকে রটে যায় যে অমুক প্রতিষ্ঠানে কোনও ভালো লোক টেঁকে থাকতে পারে না।

(৪) বিতাড়িত শ্রমিকদের স্থলাভিষিক্ত নবাগত শ্রমিকদের শিক্ষাদানের জন্য ফোরম্যান ও বড়ো মিস্ত্রিদের বহু কর্মকাল অযথা নষ্ট হয়। এই সময় বারে বারে এদের কাজের উপর লক্ষ্য রাখতে হওয়ায় তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ-কর্ম ভালো করে করতে পারে নি। সারা বৎসর এই ভাবে মূল্যবান সময় বিনষ্ট হলে মালিকগণ সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। উপরন্তু শিক্ষণ কালে এরা যথেষ্ট কাঁচা মাল নষ্ট করে। এই সময় এরা বহু বাতিল সামগ্রী ও নিম্নমানের দ্রব্য তৈরি করে।

উদ্যোগ-শিল্পের উপরোক্ত রূপ আর্থিক ক্ষতি ব্যতীত এর দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এই ভাবে বারে বারে বরখাস্ত ও বিতাড়িত হলে তরুণ শ্রমিকদের মনে অক্ষমতার গ্লানি ও আত্মধিক্কার আসে। অথচ উহারা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সফল হতে পারতো। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেধাবী বালকরা বারে বারে এই ভাবে বরখাস্ত হলে বেপরোয়া হয়ে এদের অনেকে অপরাধী-জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়। এক শ্রেণীর অপরাধী সৃষ্টির ইহা অন্যতম কারণ। বলা বাহুল্য যে, না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে হারানো আরও কষ্টকর। কয়েক ক্ষেত্রে ইহা দেশের মধ্যে অযথা বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছে।

অধুনা শ্রমিক আইনে একবার কোনও শ্রমিককে ভর্তি করা হলে তাহাকে সহজে কর্মচ্যুত করা যায় না। তাকে চার্জসিট দিয়ে বহু কানুন মেনে লেখাপড়ার পর বরখাস্ত করতে হয়। এতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের অনুসরণ করতে হওয়ায় বহু কাল অতিবাহিত হয়। এতদ্ব্যতিরেকে বরখাস্ত শ্রমিকদের শ্রমিক-আদালতে অভিযোগ দায়ের করারও অধিকার আছে। এই বাবদ আইনজীবী দ্বারা মালিক পক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে বহু অথ ব্যয় হয়ে থাকে। এই বিচার বা তদন্ত শেষ না

হলে তাদের স্থানে কর্মী নিয়োগ সম্ভব নয়। [উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে কনসিলিয়েশন অথরিটিও আছেন। এঁরা নানা ভাবে বরখাস্ত শ্রমিককে পুনর্বহাল করানোর চেষ্টা করেন।] উপরন্তু শ্রমিক সঙ্ঘগুলি হতে এইরূপ বরখাস্ত কালে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করা হয়। হঠাৎ কর্মচ্যুত হলে বরখাস্ত কর্মীদের স্ত্রী-পুত্রের অশেষ দুর্গতি হয়। এরা আত্মীয়বর্গের আশ্রয় থেকে বার হয়ে ঐ সময় স্বাধীন ভাবে বাস করায় পুনরায় তাদের পূর্বস্থানে তারা ফিরে যেতে পারে না। এই জন্য তাদের পুনর্বাসনের তখন প্রশ্ন আসে। অন্যত্র চাকুরি যোগাড় করাও অতো দিন পবে তাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠে। এই ভাবে কাউকে বরখাস্ত হতে দেখলে কর্মরত দক্ষ শ্রমিকবা সহকর্মীদের উপব সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে। মূল কারণ বুঝবার চেষ্টা না করে তারা মালিকদের উপব বিরূপ হয়। তারা ফ্যাকটরির লাভ-লোকসানের সহিত সম্পর্ক রহিত হওয়ার জন্যে এইরূপ ঘটে।

উপরোক্ত কারণে খুব বেশি অসহনীয় না হলে কর্তৃপক্ষ কোনও শ্রমিককে একবার ভর্তি করে তাকে ছাঁটাই করতে আগ্রহী হন না। ব্যবস্থাপকগণ ও তদারকী কর্মীরা বহুক্ষেত্রে ঝামেলা এড়ানোর জন্য এদের বরদাস্ত করেছেন। এর ফলে বহু অদক্ষ কর্মী তাদের কর্মে বহাল থেকে গিয়েছে। আজকাল শুধু ওআর্ক ফ্যাকটরিতে ভালো কাজ হয় না। বহু দক্ষ কর্মীর সাথে মাত্র চার জন অদক্ষ কর্মী নিযুক্ত থাকলেও ঐ টিম্-কর্মীদের যৌথ কর্মে অবনতি ঘটে। এর ফলে সামগ্রিক ভাবে কাজ কর্মে নীচুমানের আবির্ভাব হয়।

সুষ্ঠু ভাবে [বৈজ্ঞানিক পন্থাতে] উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ দ্বারা মাত্র এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। সুষ্ঠু ভাবে কর্মী নিয়োগার্থে বহু প্রকার পদ্ধতির প্রচলন আছে। সাধারণতঃ প্রার্থী-সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরীক্ষা, অ্যাপ্রেন্টিস গ্রহণ এবং বুদ্ধি পরিমাপ

প্রভৃতি দ্বারা দক্ষ কর্মীদের নিয়োগ করা হয়। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থাতে নির্বাচিত উপযুক্ত কর্মীদের বিভিন্ন প্রকার ফ্যাকটরির উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলা সম্ভব। এইবার আমি এই প্রার্থী-সাক্ষাৎ এবং বুদ্ধি-পরিমাপ প্রভৃতিতে অবলম্বিত কলা-কৌশল এবং রীতি-নীতি সম্বন্ধে এই পুস্তকের পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

১১

প্রার্থী-সাক্ষাৎ

সাধারণতঃ প্রার্থী-সাক্ষাৎ দ্বারা [ইনটারভিউ] উদ্যোগ-শিল্পের উপযুক্ত শ্রমিক ভর্তি করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রার্থী-সাক্ষাৎ প্রথাতে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। এক নম্বর প্রার্থীর সহিত মূলকাতের সময় কর্মকর্তার যে মনোভাব থাকে উনবিংশতম প্রার্থীর সাথে মূলকাতের সময় তাঁর সেই মনোভাব থাকে না। কারণ সময় প্রবাহ মানুষের ব্যাক্তিত্বের মুহুর্মুহু পরিবর্তন ঘটায়। কয়জন অসফল কর্মপ্রার্থীর সহিত মূলকাতের পর অপর জন সামান্য পারদর্শিতা দেখালে তুলনামূলক ভাবে তাকে উত্তম মনে হয়। এতদ্ব্যতিরেকে বচনবাগীশ ব্যক্তিরা প্রায়ই কাজ-কর্মে দক্ষতা দেখাতে পারেনি। বহু ব্যাক্তি পুঁথিগত বিদ্যা সুষ্ঠুভাবে কপচে গেলেও কার্যক্ষেত্রে সে অপদার্থ প্রমাণিত হয়েছে। প্রার্থী-সাক্ষাৎ কালে প্রতিটি প্রার্থীর মানসিক [তৎকালীন] অবস্থা সুঠাম থাকে নি। এ'জন্য প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানে তারা অপারক হয়েছে।

[অধুনা কালে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাহুল্যের জন্যে প্রত্যেককে সাক্ষাদাগারে ডাকা সম্ভব নয়। এদের বহু লোককে 'প্রোসেস্ অব এলিমিনেশন' দ্বারা বাদ দেওয়াব প্রয়োজন হয়। এই জন্যে প্রথমে দেখা হয় যে এদের মিনিমাম কোআলিফিকেশন তথা য়ুনিভার্সিটির সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি আছে কিনা? এর পর মাত্র ঐ সকল ব্যক্তিদের একত্রে

লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই লিখিত পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। এর পর সাক্ষাতের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিদের অ্যাপ্রেন্টিস রূপে নিযুক্ত করে তাদের ঐ বিশেষ কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবণতা আছে কি'না তা দেখা হয়। তারপর এই শিক্ষা-নবীশের কাজে উত্তীর্ণ ষ্যক্তিদের প্রতিষ্ঠানের পদ সমূহে স্থায়ী রূপে নিধুক্ত করা হয়।]

এ দেশের বহু মনীষী এই প্রার্থী-সাক্ষাৎ প্রথার পক্ষপাতী নন। এঁরা শিক্ষানবীশ রূপে কর্মপ্রার্থীদের নিয়োগ কবে তাদের কাজ দেখানোর সুযোগ দিতে চান। এই শিক্ষানবীশদেব ইংরাজিতে অ্যাপ্রেণ্টিস্ বলা হয়। এই সকল শিক্ষানবীশরা অসফল হলে কর্ম হতে তাদের বরখাস্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে যে অতি খারাপ কাজ না দেখালে ফোরম্যানরা তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন নি। মোটামুটি ভাবে কার্যক্ষম বিনয়ী শিক্ষা-নবীশদের তাঁরা প্রায়ই বরদাস্ত করে থাকেন। এই কারণে বহু ব্যক্তি নিজেদের দক্ষ কর্মী রূপে তৈরি করে নিতে পারেন নি। উপবন্ত দুইটি বা চারিটি শিক্ষানবীশের পদে ভর্তি হবার জন্যে শত শত ব্যক্তি আবেদন করে। এদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষানবীশ রূপে নিয়োগ কবা সম্ভব নয়। এতো-গুলি প্রার্থীর মধ্যে থেকে কয়জনকে মাত্র এঁদেব বেছে নিতে হয়। এই ক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনীত করতে হলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তিদের লিখিত পরীক্ষাব পর উহাদের প্রার্থী-সাক্ষাৎ একান্ত প্রয়োজন। এই দিক হতে বিচার করলে প্রার্থী-সাক্ষাৎ প্রথার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

[কয়েকটি ক্ষেত্রে দক্ষতা নির্ণয়ার্থে পদ-প্রার্থীদের সরাসরি পরীক্ষা করা চলে। একজন টাইপিস্টকে টাইপ করতে বলে কিংবা ড্রাইভারকে

গাড়ি ড্রাইভ করতে বলে এই পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের দীর্ঘস্থায়ী ধৈর্য ও চরিত্র এতদ্বারা জানা যায় না। স্বল্প মেয়াদী দক্ষতা এবং দীর্ঘ মেয়াদী দক্ষতার মধ্যে প্রভেদ আছে। বহুকাল কর্মরত থাকলে অবশ্য দক্ষতা অর্জিত হতে পারে। কিন্তু এই মধ্যবর্তী কালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এ'জন্য যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।]

অধুনা পদ-প্রার্থীদের সংখ্যা এতো অধিক হয়েছে যে ত্রিস্তর [**Three tyre**] পদ্ধতিতে এদের বহু ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া দরকার হয়। প্রথমতঃ এদের বিভিন্ন য়ুনিভারসিটি প্রদত্ত সার্টিফিকেট ও প্রশংসা-পত্র সমূহ এবং তাদের আবেদন-পত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি বিচার করে বহু প্রার্থীকে বাতিল করা যেতে পারে। এর পর বাকি বহু ব্যক্তিকে লিখিত পরীক্ষার দ্বারা বাতিল করা হয়। কিন্তু এই লিখিত পরীক্ষা প্রতিযোগিতা মূলক হওয়া উচিত নয়। কারণ, এইরূপ পরীক্ষাতে প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়া ব্যক্তিরা অন্য বিষয়ে পারদর্শিতা নাও দেখাতে পারে। এই লিখিত পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে কয়জন শ্রেষ্ঠমন্য ব্যক্তিকে মাত্র প্রার্থী-সাক্ষাতের জন্য ডাকা হয়। এই ভাবে শত শত ব্যক্তিকে এড়িয়ে মাত্র দশজনকে শিক্ষা-নবীশের কাজে নিয়োগ করা যায়।

এই পন্থা ভালো কি মন্দ তা বাৎসরিক শ্রমিক-চ্যুতির হার পরিলক্ষ্য করে বুঝা যায়। এই অবস্থাতে প্রায় শ্রমিক-চ্যুতির হার অধিক দেখা যায়। প্রায় ক্ষেত্রে এরা দক্ষ শ্রমিক রূপে নিজেদের তৈরি করতে অপারক হয়েছে। অবৈজ্ঞানিক ভাবে প্রার্থী-সাক্ষাৎ এবং অভিজ্ঞতার অভাবই এজন্য দায়ী। বহুক্ষেত্রে তাঁরা বাগ্মিতা ও বহিঃ-চাকচিক্যতে মোহিত হন। কয়েক ক্ষেত্রে এদের রাজনীতি এবং খেলা-ধুলা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। এঁরা ভুলে যান যে এখানে তাঁদের কোনও সুবক্তাকে কিংবা খেলোয়াড়কে বা শিক্ষককে মনোনীত করতে

বলা হয় নি। এখানে মাত্র কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী উপযুক্ত প্রার্থীদের ঐখানকার পদ [post] বিশেষের উপর যথেষ্ট আগ্রহ আছে বা নেই তা বুঝতে বলা হয়েছে। প্রার্থী নির্বাচকরা ভুলে যান যে প্রার্থীদিগকে পূর্ব শিক্ষা-দীক্ষা ভুলিয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত করা চাই। এখানে তাদেরকে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, ঐরূপ ভাবে নিজেদের নূতন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মত মানসিক অবস্থা তাদের আছে কি'না? প্রার্থী-সাক্ষাৎ দ্বারা পদ-প্রার্থীদের দৈহিক ও মানসিক গঠন ঐ সকল পদের উপযোগী কিনা তা প্রার্থী-নির্বাচকদের সর্বাগ্রে বুঝতে হবে। ঐ সকল কর্মের প্রতি প্রার্থীদের আগ্রহের অভাব থাকলে তাদের পক্ষে সুদক্ষ কর্মী হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রার্থীদের পারিবারিক ও স্বকীয় [স্ব-অর্জিত] চিত্ত-প্রস্তুতি [প্রিডিসপোসিশন্] কোন খাতে বহে মাত্র এইটুকু অবহিত হওয়া দরকার। বহু ব্যক্তি একটি বিশেষ বিষয়ে নানা কারণে চিত্ত-প্রস্তুতি অর্জন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে অভ্যাস দ্বারা উহা তারা দ্রুতগতিতে বর্ধিত করতে সক্ষম। এইখানে কোনও বহির্জাগতিক জ্ঞান গরিমার প্রশ্নোত্তর অবান্তর প্রথা। ভুলে গেলে চলবে না যে সকল ব্যক্তি সকল পদের উপযুক্ত নয়। এই সব ভুলের জন্য যাকে উপযুক্ত মনে করা হয় সে অসফল এবং যাকে অনুপযুক্ত মনে করা হয় সে ঐ বিষয়ে সফলতা লাভ করে থাকে।

[বহু ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা জানা গিয়েছে যে, কোনও এক উপযুক্ত-মন্য ব্যক্তি বহুবার বহু স্থানে চাকুরি করেছে। এমন কি, এই বিষয়ে সে বহু প্রশংসা-পত্রও দেখিয়েছে। কিন্তু সে কেন এক জায়গাতে টিকে না থেকে বার বার অন্যত্র কর্মের জন্য চেষ্টা করেছে? এই বিষয়

ঐ পদ-প্রার্থী নিজে না বুঝলেও সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের বুঝে নিতে হবে যে তার মানসিক গঠন শিল্পক্ষেত্রে স্থায়ী ভাবে কাজ করার উপযুক্ত কিনা? এখানে তাকে কম বেতনে নিয়োগ করলে সে সুযোগ মত অন্যত্র চাকুরি করবে। কোনও পদের পক্ষে ওভার-কোআলিফাইড প্রার্থীদের নিয়োগ কালেও কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা ভালো।]

প্রায়ই কর্মকর্তারা কোন এক সুদর্শন যুবককে দেখে বলে থাকেন,— 'বাঃ! ভেরি স্মার্ট বয়! আচ্ছা! কাল থেকে তুমি কাজে যোগদান ক'রো।' অন্য বিষয়ে ঐ যুবক বুদ্ধিমান ও কর্মতৎপর হলেও শিল্পক্ষেত্রে সে হয়তো পারদর্শিতা দেখাতে পারে না। এই জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থাতে প্রার্থী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

[সিলেকশন বোর্ড সমূহে অন্তত একজন সংশ্লিষ্ট কর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ রাখা হয়। কিন্তু কোনও প্রার্থী তাঁর আত্মীয় বা বন্ধুপুত্র হলে ঐ ব্যক্তিকে বোর্ডে গ্রহণ করা উচিত নয়। এখানে প্রার্থী দুরূহ প্রশ্নের শেখানো উত্তর মুখস্থ বলে সকলকে মুগ্ধ করে দিতে পারে। কয়েক ক্ষেত্রে এলাহাবাদ বোর্ডের এবং কলিকাতা বোর্ডের বিশেষজ্ঞ মেম্বার পরস্পরের সাথে বন্দোবস্ত করে নিজ নিজ ক্যানডিডেটদের ব্যাক্ করেছেন। এইরূপ অসাধুতা হতে এই বোর্ডকে সাবধানে মুক্ত রাখতে হবে।]

প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থী সাক্ষাৎ-এর বৈজ্ঞানিক পন্থা সমূহ এইবার আলোচনা করবো। কারখানাতে এবং অফিস কিংবা কোনও সংস্থাতে কর্মী-নির্বাচন কালে প্রথমে নির্বাচকদের এই প্রার্থী-সাক্ষাৎ কাজের জন্য নিজেদের যথোচিত ভাবে প্রস্তুত করা উচিত হবে। প্রথমে তাঁদের জানা দরকার যে কোনও এক পদের উপযুক্ত প্রার্থীর কি কি গুণ থাকা উচিত। কি কি গুণ বা দোষ থাকার জন্য কর্মীরা সফল বা অসফল হয়

তা তাঁদের পূর্ব হতে জানা প্রয়োজন। এইজন্য সরজমিন তদন্ত দ্বারা তাঁদের জানতে হয় ফ্যাকটরি সমূহে কি কি দোষে কর্মীদের বিতাড়িত করা হয়। এই সাথে তাঁদের এ'ও জানতে হবে যে কি কি গুণের জন্যে তারা ঐখানে সুনাম অর্জন করেছে। বলা বাহুল্য, প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিটি কাজের জন্য উপযুক্ত হয় না। একটি কাজে যে-কোনও এক ব্যক্তি অসফল হলেও অন্য একটি কর্মে সেই ব্যক্তি সুনাম অর্জন করে। অধিক ক্ষেত্রে প্রার্থী-সাক্ষাৎ দ্বারা কর্ম-প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় যে নির্বাচকরা কি জানার উদ্দেশ্যে কি প্রশ্ন করবেন পূর্ব হতে সেই সম্বন্ধে একটি প্ল্যান তৈরি না করে প্রার্থীদের সহিত সাক্ষাৎ করে থাকেন। এর ফলে বহু এলোমেলো প্রশ্ন প্রার্থীদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কি জানার উদ্দেশ্যে ঐ প্রশ্ন করা হলো তা প্রথমে প্রার্থীদের বুঝতে দিতে হবে। এই সকল প্রশ্ন যথেষ্ট পরিমাণে ভাব-প্রকাশক এবং বোধাত্মক হওয়া উচিত। এইজন্য সুপরিকল্পিত ভাবে শব্দ চয়ন করে বাক্য-বিন্যাস করা চাই। কারণ, মনে যা ভাবা হয় তা প্রায়ই ভাষায় প্রকাশ পায় না। প্রার্থীদের ঘাবড়ানির ভাব [নারভাসনেস্] প্রথমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিদূরিত করতে হবে। এ'জন্য তাদেরকে প্রথমে জটিল প্রশ্ন না করে খুব সহজ প্রশ্ন করা উচিত। এই-ভাবে মানসিক ভারসাম্য তাদের আয়ত্তে এলে তাদেরকে জটিল প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু কেবল সাক্ষাৎকার দ্বারা উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করা যায় না। তড়িৎ ঘড়িৎ পুঁথিগত বিদ্যা কপচাতে পারলেই এই সব প্রার্থী সুদক্ষ কর্মী হতে পারে না। সাক্ষাৎকার দ্বারা তাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে কিছুটা হয়তো ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে কোনও কর্মে প্রবণতা না থাকলে সকলের বুদ্ধি-মত্তা সকল বিষয়ে কার্যকরী হয় না। এইখানে তাদের ধৈর্যশক্তি,

পরিশ্রমের ক্ষমতা, চিত্তের একাগ্রতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতা, উদ্ভাবনী শক্তি, অবলোকনের শক্তি [অবসারভেশন্], বিচার বুদ্ধি,কর্মতালের সাম্য, রি-অ্যাকশন টাইম [প্রতিক্রিয়া শক্তি] এবং দায়িত্ব বা সততা ও আনুগত্য প্রভৃতির প্রশ্নও জড়িত আছে। পুঁথিগত বিদ্যাতে পারদর্শী পণ্ডিত প্রার্থীরা সরজমিন কার্যক্ষেত্রে সফল নাও হতে পারে। এক ব্যক্তির বেশভূষা ও কথাবার্তা হতে সে প্যাকিঙ বা ড্রেসারের কাজ ভাল পারবে তা কারুর পক্ষে ধারণা করা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্বেও সাক্ষাৎকারের কার্যকারিতা সম্বন্ধে অস্বীকার করা যায় না।

বি : দ্র :—সহস্র সহস্র পদ-প্রার্থী হতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছতে হলে প্রথমে লিখিত পরীক্ষা করা হয়। ইহাকে সাধারণ ভাষাতে গ্রুপ্ টেষ্টিঙ বলা হয়। এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের প্রার্থি-সাক্ষাৎ দ্বারা ব্যষ্টি পরীক্ষা [ইনডিভিজুয়েল টেস্ট] করা হয়। এতদ্বারা পদ-প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। কিন্তু এতে বহু উপযুক্ত পদ-প্রার্থী বাদ পড়ে। প্রার্থীদের সংখ্যা খুব বেশি হলে এ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। পদ-প্রার্থীদের হাতে-কলমে কাজ-কর্ম করতে বলে তাদের দক্ষতা পরীক্ষা করা চলে। কিন্তু এতে তাদের সহনশীলতা, পরিশ্রম শক্তি, কর্মোদ্যম, সহযোগী মনোভাব, চিন্তাধারা প্রভৃতি গুণাগুণ বুঝা যায় না। এজন্যে শিক্ষানবীশ বা অ্যাপ্রেন্টিস্ নিয়োগের ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয়। এখানেও দেখা গিয়েছে যে খুব অদক্ষ না হলে ফোরম্যানরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দেন নি। এর ফলে কারখানাতে বহু অদক্ষ কর্মী রয়ে যায়।

এজন্যে পদ-প্রার্থী নির্বাচনে মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কোনও এক পদের উপযুক্ত মানসিক ও দৈহিক-

গঠন কারুর আছে কিনা তা মনোবিজ্ঞানীরা নানা রূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা জানাতে সক্ষম। এইরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের আপন স্বার্থে দ্রুতগতিতে কাজ-কর্ম শিখে তাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে তাদের উচিতমত আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধেও অবহিত হতে হবে। কারণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরনের পক্ষে ছোট কারখানা উপযুক্ত স্থান নয়। এক্ষেত্রে তারা সর্বদা অন্যত্র চাকুরির সন্ধান করবে। এর ফলে কর্মশালার কাজ-কর্মে তাদের একাগ্রতা থাকে না। কারখানাতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং উহার তৎকালীন পরিধি ও কর্মী সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। তা' না হলে প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে ঐ সকল পদ-প্রার্থীদেরও ক্ষতি করা হয়।

এইরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা ব্যতীত শ্রমিকদের মানসিক ও দৈহিক প্রতিক্রিয়া কাল [**Reaction Time**] শিল্প ক্ষেত্রের উপযুক্ত কি'না তা যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। যে কার্যে বারে বারে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তাতে শ্রমিকদের মানসিক প্রতিক্রিয়া-কালের অধিকারী হওয়া দরকার। এখানে শ্রমিকদের কোনও এক প্রশ্ন করলে সে কতো শীঘ্র তার উত্তর দিলে তা স্টপ্ ওআচ দ্বারা পরিমাপ করে এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার কাল নির্ণয় করা হয়। এইখানে প্রশ্ন করার এবং উহার উত্তর পাওয়ার মধ্যবর্তী সময়টুকু ঐ শ্রমিকের মানসিক প্রতিক্রিয়া কাল রূপে বিবেচিত হবে। বিপজ্জনক যন্ত্র সমূহে কার্যরত শ্রমিকদের দৈব-দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য শক্তিশালী দৈহিক প্রতিক্রিয়া-কালের অধিকারী হওয়া দরকার। শক্তিশালী রি-অ্যাকশন টাইমের অধিকারী শ্রমিকরা বিপদ দেখা মাত্র দ্রুত গতিতে তাদের হাত বা পা সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। শ্রমিকদের কায়িক প্রতিক্রিয়া পরিমাপের জন্য বহুবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিপদ

দেখা ও অঙ্গ সরানোর মধ্যবর্তী সময়টুকু ঐ শ্রমিকের দৈহিক প্রতি-ক্রিয়া কাল রূপে বিবেচিত। এক সেকেণ্ডের এক হাজার অংশের এক ভাগকে সিগমা বলা হয়। ঐ সিগমা'র পরিপ্রেক্ষিতে এই দৈহিক প্রতিক্রিয়া কালের পরিমাপ করা হয়। এই পুস্তকের ১২৬ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত এই প্রকার ব্যবস্থা বহু উচ্চশিক্ষিত উপযুক্ত প্রার্থীর মনোনীত হয় নি। এঁরা প্রায়ই ফ্যাকটরির নাম না জেনে দরখাস্ত পাঠাতে চান নি। এই জন্য নিয়োগকর্তাদের পূর্বাহ্ণে তাঁদের আত্মপরিচয় দেওয়া উচিত হবে। কোনও ক্ষেত্রে মালিকরা অন্য ফ্যাকটরি হতে দক্ষ কর্মীদের অধিক বেতনের লোভ দেখিয়ে ভাঙিয়ে এনে নিজেদের ফ্যাকটরিতে ভর্তি করে নেন। কিন্তু এরূপ মনোবৃত্তি সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই আখেরে ক্ষতিকর হয়।

এইখানে দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের ফ্যাকটরি সমূহে আজও পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক রীতিতে শ্রমিক ভর্তি করা হয় না। এইখানে [সাধারণতঃ] কিরূপ পদ্ধতিতে শ্রমিক ভর্তি করা হয় সেই সম্বন্ধে এইবার আমি নিম্নের পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবো।

(১) সাধারণতঃ শ্রমিকরা ফ্যাকটরি গেটের নিকট বিশেষ বিশেষ দিনে কর্মের জন্য ভিড করে দাঁড়ায়। ফ্যাকটরির লেবার অফিসারগণ দরোয়ান দ্বারা তাদেরকে ভিতরে ডাকিয়ে এনে তাদের মধ্য হতে কুশলী বা অকুশলী কর্মী নির্বাচন করেন। ঐ সময় ভিড়ের চাপে উপযুক্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই ভিতরে ঢুকতে পারে না। এই সুযোগে বহু লড়াকু প্রকৃতির অপরাধমুখী ব্যক্তি কর্মে বহাল হয়েছে।

(২) বহু ক্ষমতাসীন সরকারী কর্মচারী এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যক্তি তাঁদের পোষ্যবর্গকে বা পরিচিতদের ভর্তি করার জন্য ম্যানেজার-

দের অনুরোধ করেন। বহু প্রকার বাধ্য-বাধকতা থাকাতে এঁদের প্রেরিত প্রার্থীরা অনুপযুক্ত হওয়া সত্বেও বাধ্য হয়ে তাদের ভর্তি করতে হয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এদের ভর্তি করার ফলে ঐ সকল ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সাথে মালিকদিগের ও ম্যানেজারের মনোমালিন্য ঘটেছে। কারণ, ঐ সকল অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ফ্যাকটরিতে নিযুক্ত করা উপযুক্ত ও দক্ষ শ্রমিকগণ পছন্দ না করাতে শ্রমিক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি এদের অদক্ষতার জন্যে শেষ-বেশ এদের এঁরা বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। এই জন্য প্রায়ই ঐ সকল ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা অন্যত্র দূর স্থানে বদলি হওয়া মাত্র তাঁদের আত্মীয়দের নানা কারণে [অকারণেও] বরখাস্ত করা হয়। কয়েক ক্ষেত্রে এদের ভর্তি করানোর পর এদের পদোন্নতির জন্যও তাগিদ এসে থাকে।

(৩) কর্মরত শ্রমিকদের অনুরোধে তাদের উপযুক্ত আত্মীয়দের মধ্য হতে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। বহু শ্রমিক তাদের পোষ্যদের বা ঘরিয়াকে বিনা বেতনে তাদের তাঁবে মেসিনে নিযুক্ত রেখে তাদেরকে উহা চালাতে শেখায়। এই ভাবে দক্ষতা অর্জন করলে এদের নিয়ম মত ভর্তি করা হয়। আপন আত্মীয় হওয়াতে উহাদের শিক্ষার জন্য ঐ সব স্থায়ী কর্মীরা তাদের ভালো রূপে কাজ শেখায়। জুট মিল সমূহে তাঁত-ঘরে ও স্পিনিঙে এইরূপ প্রথা বহু দিন যাবৎ চালু আছে। এই ব্যবস্থাতে এদের জন্য পৃথক শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

(৪) কনট্রাকটারগণ তাদের নিজেদের নিযুক্ত শ্রমিকদের মিলের মধ্যে এনে ঐখানকার কাজ-কর্ম করে। এই কনট্রাকটারগণের কেহ কেহ ফ্যাকটরির মাসিক মাহিনার চাকুরিয়া এবং এদের কেহ কেহ কনট্রাক্ট বেসিসে লেবার সাপ্লাই করে ও তাদের কাজের তদারকী করে ঐখানকার কাজকর্ম করে দেয়। কিন্তু তাদের অধীন কর্মীরা কোনও ক্ষেত্রেই ঐ

সকল ফ্যাকটরির চাকুরিয়া নহে। কনট্রাক্টারদের কনট্রাক্ট ফুরোলে তারা তাদের দক্ষ কর্মীদের সাথে করে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়।

[ফ্যাকটরি অ্যাক্টের অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যার উর্ধ্ব সংখ্যক কর্মী বহাল করলে ঐ প্রতিষ্ঠান ফ্যাকটরি অ্যাক্টের মধ্যে পড়ে। এতে ফ্যাকটরি অ্যাকট্ অনুসারে বহুবিধ আইন-কানুন এদের মেনে চলতে হয়। এইজন্য এরা এই ফ্যাকটরি অ্যাক্ট্ এড়াবার জন্য কয়েকটি কনট্রাকটারের [ঠিকাদার] মারফৎ তাদের নিযুক্ত কর্মীদের দ্বারা ঐ ফ্যাকটরির উৎপাদন কার্য সমাধা করে। অবশ্য কেবলমাত্র মাঝারি এবং ছোট ফ্যাকটরির মালিকগণ এরূপ সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম। এই সকল ঠিকাদারগণ তাদের তাঁবের লোক হলে বার্ষিক আয় ভাগা-ভাগি করে আয়কর প্রভৃতি কর বকলমে কমানো সম্ভব।]

কোলিয়ারি অঞ্চলে কয়লা খনিতে এই প্রকার ঠিকাদারী প্রথার বহুল প্রচলন আছে। মজদুরগণ এদের আজ্ঞাবাহীরূপে কাজ করে। এই সকল ঠিকাদারের মধ্যে পুরুষদের মত নারীরাও আছে। পুরুষ ঠিকাদারদের অধীনে পুরুষ কর্মী এবং নারী ঠিকাদারদের অধীনে নারী কর্মী বহাল থাকে। পুরুষ ঠিকাদাররা প্রায়ই মজদুরদের দ্বারা ব্যক্তি-গত চাষবাস এবং গৃহকর্মাদি বিনা বেতনে করিয়ে নেন। উপরন্তু কোম্পানির প্রদত্ত এদের বেতনেরও কিছু অংশ নিজেরা আত্মসাৎ করেন। নারী ঠিকাদারদের কেহ কেহ ভীষণ প্রকৃতির দুশ্চরিত্রা ও মদ্যপায়ী হয়ে থাকেন। এঁদের কেহ কেহ ভয় ও লোভ দেখিয়ে এঁদের অধীন কুলি-কামিনীদের দুশ্চরিত্রা করে তুলেন।

[অনেক ফ্যাকটরির মালিক লেবার ট্রাবল এড়াবার জন্যে এই ঠিকাদারী প্রথার পক্ষপাতী। কারণ, সাক্ষাৎ ভাবে মজদুরদের সাথে মূল প্রতিষ্ঠানের কোনও সম্পর্ক থাকবার কথা নয়। এদের বেতন

বৃদ্ধি প্রভৃতি যা কিছু ঝামেলা ঐ সকল ঠিকাদারদের স্কন্ধে তাঁরা চাপাতে চান। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মূল কর্মকেন্দ্র অবরোধ করে ঐ বকলম প্রথার প্রকৃত নায়ক মালিককেও তাদের নিযুক্ত ঠিকাদারদের সাথে উত্ত্যক্ত করে। কারণ, এই বকলম তথা বেনামী প্রথার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তারা অবহিত আছে।

(৫) আড়কাঠি :—এই আড়কাঠি প্রথা এককালে ভারতে প্রচলিত ছিল। ঐ সময় ভারতের বহু দূর প্রদেশে চা-বাগিচার কাজে কিংবা আফ্রিকা, সিংহল প্রভৃতি স্থানের জন্য শ্রমিক সংগ্রহ কষ্টসাধ্য ছিল। এ'জন্য এই সকল আড়কাঠিগণ দেশের স্থানে স্থানে আড়কাঠি-ঘাঁটি স্থাপন করে শ্রমিকদের লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে [বালকদের চুরি করে] জমায়েত করতো। এর পর এদেরকে তারা দীর্ঘ পাঁচ বা দশ বৎসরের চুক্তি-নামাতে টিপ সই দিতে বাধ্য করে দূর দূর স্থানে পণ্য দ্রব্যের মত চালান দিত। এই দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিনামার অজুহাতে বহু বৎসর তাদের দেশে ফিরতে দেওয়া হত না।

(৬) চাকুরি-সংস্থা—এই চাকুরি সংস্থাকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বলা হয়। উপযুক্ত স্থানীয় প্রার্থীদের জন্য কর্ম-সংস্থান করার জন্য ইহার সৃষ্টি। কারণ স্থানীয় যুবকদের কর্ম সংস্থান না হলে স্থানীয় শান্তি বিনষ্ট হয় এবং তৎসহ স্থানীয় অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। এরা কয়েকটি সঙ্গত কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে সরকার-বিরোধী দলের সৃষ্টি করে। এদের কেহ কেহ প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয়ে উঠে। এদের বাসভূমিতে ফ্যাকটরি স্থাপিত হলে এদের বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য এর ক্ষতিপূরন স্বরূপ এরা তাদের বাটীর কাছে চাকুরি পেতে চায়। স্থানীয় ব্যক্তিদের চাকুরিতে অগ্রাধিকার দেওয়াতে সুবিধাও আছে। এদের রাহাখরচ বাবদ

অর্থব্যয় করতে না হওয়ায় এরা স্বল্প বেতনে সন্তুষ্ট থাকে। যাতায়াতে পরিশ্রান্ত না হওয়াতে এরা কর্ম-ক্লান্তিতে ভুগে না। কিন্তু বহু বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান মালিকদের সহিত সহযোগিতা করেন না। এতে এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত কর্মসংস্থান বুরোর আত্মীয় ও স্বজন-পোষণের অসুবিধা হয়ে থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে এই সকল সংস্থার অধি-কর্তারাও সকল প্রার্থীর প্রতি সমান সুবিচার করেন নি। অবশ্য এইরূপ অভিমত সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

[প্রায় ক্ষেত্রে কর্মবহুল ফ্যাকটরিতে শিক্ষানবিশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু নিতান্ত আপন ব্যক্তি না হলে কেহ কাহাকেও সুষ্ঠু ভাবে শিক্ষাও দেয় না। উপরন্তু এই শিক্ষণ কালে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। এই সকল ফ্যাকটরি কারুর বাটীর কাছে না থাকলে সেখানে অবৈতনিক ভাবে শিক্ষা লাভ [গাড়িভাড়ার অভাবে] সম্ভব হয় না। এই জন্যে বহু সংখ্যায় বিভিন্ন শ্রমশিল্পের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষণ-শিবির পল্লীতে পল্লীতে স্থাপন করা উচিত।]

অসাধু ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের দ্বারা উৎকোচ গ্রহণান্তে শ্রমিক নিয়োগের কাহিনীও শুনা গিয়েছে। এই প্রথা বহাল থাকায় বহু অসংশ্লিষ্ট পেশাদারী দালাল-অপরাধীর সৃষ্টি হয়েছে। এরা ইতিমধ্যে সারা দেশে এক মহা অমঙ্গলকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই উৎকোচ গ্রহণান্তে সংগৃহীত অদক্ষ কর্মিগণ উদ্যোগ-শিল্পে আজ এক মহা অভিশাপ। কয়েক ক্ষেত্রে এরা এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অর্থের বলে ফ্যাকটরিতে নিযুক্ত হয়ে থাকে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে নিম্ন পদের কর্মচারীদের উপর এক শ্রেণীর শ্রমিকদের নিয়োগ করার ভার থাকে। কিন্তু সুষ্ঠু ভাবে কর্মী নিয়োগে এদের কোনও জ্ঞান নেই। কেবলমাত্র

সৎ ও জ্ঞানী-গুণী দায়িত্বশীল কর্মচারীদের উপর যে কোনও প্রকার কর্মী নিয়োগের ভার থাকা উচিত।

প্রার্থী-সাক্ষাৎকালে কর্মপ্রার্থীদের নানা ভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়ে থাকে। ইনটেলিজেন্স টেস্টের বাংলা পরিভাষা বুদ্ধি-পরিমাপ। সাক্ষাৎকালে নানা প্রকার বচন বিন্যাস দ্বারা প্রার্থীদের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। প্রার্থী-সাক্ষাৎ কালে পদপ্রার্থীদের দুই প্রকার প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, যথা—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। 'হিমালয়ের উচ্চতা কি ? ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীর নাম কি ?' এই সকল সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত পরোক্ষ প্রশ্ন। হিমালয়ের উচ্চতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তার উত্তর হবে —'যে কোনও ভূগোলের পুস্তকে উহা লিখা আছে। আমি উহার মোটামুটি উচ্চতা বলতে পারি।' কোনও একটি তথ্য কার লেখা ও উহা কোন্ পুস্তকেব কোথায় আছে—তা ত্বরিত গতিতে কেউ বলে দিলে তাকেই আমরা বিদ্বান ব্যক্তি বলবো। অযথা প্রতিটি বিষয় মনে রেখে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়। অপরদিকে ডাক্তারকে দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং যন্ত্রবিদকে যন্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে উহাকে আমরা প্রত্যক্ষ প্রশ্ন বলি। কিন্তু কারুর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে হলে তাকে পরোক্ষ প্রশ্ন করা হয়। পরোক্ষ প্রশ্নতে ঠকানোর প্রশ্নের অবতারণা না করে কয়েক প্রকার মন-গড়া ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা উচিত। 'এইরূপ এক ঘটনা কর্মস্থলে ঘটলে তুমি সেই স্থলে কি করবে ?' —একমাত্র এইরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দ্বারা কর্মপ্রার্থীদের ঐ পদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপ করা সম্ভব। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বহুল প্রচলিত কাহিনী এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

"'কোনও এক ফ্যাকটরির কর্মকর্তা তাঁর কোআর্টার হতে রাত্রি দুই ঘটিকাতে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরবার জন্য বার হন। তাঁর

মোটর ঐ ফ্যাকটরির গেটে এলে ঐখানে পাহারারত দ্বারবান তাঁর মোটর কিছুক্ষণ সেখানে আটকে রেখে বলেছিল, 'সাব! এই মাত্র স্বপ্ন দেখলাম যে আপনার মনোনীত ট্রেনটিতে এক ভীষণ কলিশন হবে। ঐ ট্রেনে উঠলে আপনার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটবে।' সাহেব তার কথা না শুনে স্টেশনে এসে শুনলেন যে ঐ ট্রেন কিছুক্ষণ আগে ছেড়ে দিয়েছে। এই ট্রেন ফেইল হওয়াতে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন! এমন সময় তিনি শুনলেন যে পরবর্তী স্টেশনের কাছে ঐ ট্রেনে এক ভীষণ কলিশন হওয়াতে প্রতিটি যাত্রী নিহত বা আহত হয়েছে। এর পর বাড়িতে ফিরে সাহেব ঘটনাটি তাঁর স্ত্রীকে শুনিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'আচ্ছা! এখন ঐ দ্বারবান সম্বন্ধে আমার কর্তব্য কি?' মেমসাহেব এই প্রশ্নের উত্তরে কৃতজ্ঞ ভাবে স্বামীকে বললেন,'ওকে এখুনি সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দাও। ও তোমাকে আটকানোর জন্যে দেরি হওয়ায় তুমি ট্রেন ফেইল করেছো। এ দিক হতে ও তোমার জীবনকে রক্ষা করেছে।' এখন এই কাহিনীর সূত্র ধরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে মেমসাহেব যাই বলুন না কেন, এক্ষেত্রে ফ্যাকটরির ঐ কর্মকর্তা সাহেবের কর্তব্য কি হবে? এর একমাত্র উত্তর হবে যে, পাহারারত অবস্থাতে রাত্রে ঘুমানোর জন্য [ঘুমালে লোকে স্বপ্ন দেখে] ঐ সাহেবের পক্ষে ঐ দরোয়ানকে তখুনি বরখাস্ত করা উচিত হবে।"

বহু ক্ষেত্রে ধাঁধার আকারে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করা হয়েছে। 'কড়ির মা'র তিনটি ছেলে। তাদের দুজনের নাম, এক কড়ি ও দুকড়ি। এদের তৃতীয় জনের নাম কি?' অবশ্য এর একমাত্র উত্তর হবে—কড়ি। কারণ ঐ প্রশ্নের মধ্যেই বলা হয়েছে, 'কড়ির মা'র' ইত্যাদি। এখানে বিবেচ্য বিষয় হবে এই যে, কতো শীঘ্র যথার্থ উত্তর পাওয়া গেল। কারণ, এমন বহু কাজ আছে যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়ে থাকে। 'হোয়াট

ইজ দি ডিফারেন্স বিট্‌উইন স্টেশনমাস্টার অ্যাণ্ড স্কুলমাস্টার ? ওয়ান মাইণ্ডস্‌ দি ট্রেন অ্যাণ্ড আদার ট্রেনস্‌ দি মাইণ্ড।' 'হোয়াট্‌ ইজ্‌ দি ডিফারেন্স্‌ বিট-উইন ফুটবল এণ্ড দি প্রিন্স ? ওয়ান ইজ থ্রোন টু দি এয়ার অ্যাণ্ড দি আদার ফ্রম এয়ার [Heir] টু দি থ্রোন [Throne]।' এ ধরনের জামাই-ঠকানো প্রশ্ন কদাপি কাউকে জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না। কিন্তু 'কাগজের সাথে কাপড়ের প্রভেদ কি ?' এরূপ প্রশ্ন এদের যথাযথ ভাবে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

কোনও কর্মের প্রতি কারুর প্রবণতা [ইন্‌নেট এবিলিটি] এবং অভ্যাস-অর্জিত দক্ষতার প্রভেদ আছে। কোনও কর্মের প্রতি প্রবণতার অধিকারী ব্যক্তি উহা অভ্যাস দ্বারা বহু গুণে বাড়াতে পারে। এই ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ হয়ে উঠে। কিন্তু বিভিন্ন কর্মে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এজন্য যে ব্যক্তি এক বিষয়ে দক্ষ সে ব্যক্তি অপর এক বিষয়ে দক্ষ হয় না। উপরন্তু একটি কর্মে যার প্রয়োজনীয় প্রবণতা আছে অপর এক কাজে তার সেই প্রবণতা নেই। এজন্যে একটি কাজে অদক্ষ হলেও সে অপর কাজে দক্ষতা দেখায়। কিন্তু এও দেখা যায় যে সমান সুবিধাভোগী হওয়া সত্ত্বেও একদল কর্মী অপর দল অপেক্ষা ভালো কাজ দেখায়।

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই দক্ষতা কি ভাবে তারা প্রমাণ করে ? ধরা যাউক, দুই জনকে কাজ-কর্মে সমান সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে একজন প্রার্থী সহজ কাজ মাত্র ভালো পারে। কিন্তু অন্যজনে সেই সাথে কঠিন কাজও ভালো পারে। এ ক্ষেত্রে শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ বিবেচিত হবে। ধরা যাউক, কতকগুলি কার্য সমান ভাবে কঠিন কার্য। একদল লোক অপর দল অপেক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে ঐ কাজ অধিক সংখ্যাতে

করলো। এই ভাবে অধিক সংখ্যক কাজে সক্ষম ব্যক্তিদের আমরা অধিক দক্ষ বলবো। সমান সুবিধাভোগী কর্মীদের মধ্যে একদল মন্থর গতিতে দ্রব্যোৎপাদন করে, কিন্তু উহাদের অপর দল ঐরূপ দ্রব্যোৎপাদন দ্রুত গতিতে সমাধা করে। এ ক্ষেত্রে শেষোক্ত দ্রুতগতি-সম্পন্ন কর্মীদের আমরা অধিক দক্ষ বলবো। এইরূপ পন্থাতে সমান সুবিধাভোগী কর্মীদের দক্ষতার মান নির্ণয় করা যেতে পারে।

এইবার বিবেচ্য বিষয় এই যে, শ্রমিকদের মধ্যে কে দক্ষ, কে বা অদক্ষ হবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা পূর্ব হতে কিরূপে বুঝা যেতে পারে? শ্রম-বিজ্ঞানীদের মতে বুদ্ধি পরিমাপ, প্রবণতা পরীক্ষা [স্পেশাল অ্যাপ-টিটিউড্] এবং দৈহিক পরিক্রমণ পরিলক্ষ্য করে ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব। ডাইস্ ও অন্য দ্রব্য সাহায্যে কিণ্ডারগার্টেন প্রথাতে নির্মিত বস্তুকে ভেঙে দিয়ে উহা পুনর্গঠন করতে বলে কেহ কেহ সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে এদের পরীক্ষা করেন। উপরন্তু বহুবিধ ধাঁধার প্রশ্ন তৈরি করেও এদের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করা হয়। বহু ক্ষেত্রে যন্ত্র বিশেষের পার্ট্স্ গুলি একত্রিত করতে বলে কোনও কর্ম সম্পর্কিত কর্ম-প্রবণতা পরীক্ষা করা যায়। এখানে দেখা হয় যে, এরা কেমন সাবলীল ভাবে আগ্রহ সহকারে ঐ যন্ত্রাংশ সমাবেশের কাজ করতে পারলো। স্ক্রু ড্রাইভার সহযোগে স্ক্রু ড্রাইভ করতে বলে কিংবা হাতুড়ি দ্বারা পেরেক পুরতে বলে শ্রমিকদের কর্মচাতুর্য এবং তৎসহ বল-বুদ্ধি পরীক্ষা করা যায়। এই সব কাজে পেশী ও স্নায়ুর শক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে তার মধ্যে আছে কিনা, এদের কাজের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ চাতুর্যপূর্ণ গতি পরিলক্ষ্য করে তা বুঝা যায়।

[কোনও এক কর্মের প্রতি কোনও এক প্রার্থীর প্রবণতা মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে পরীক্ষা করার রীতি আছে। ডাক্তারকে তার নিত্য সঙ্গী

স্টেথিসকোপ বা ডাক্তারি যন্ত্র আগ্রহান্বিত করে। কিন্তু ঐগুলি দেখলে একজন উকিল একটুও আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিন্তু ঐ উকিল আইন পুস্তক এবং আদালতের রায় সম্বন্ধে অত্যধিক ভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে। এই আগ্রহ মানুষের মুখে চোখে নির্ভুল ভাবে ফুটে উঠতে বাধ্য। মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রে দৈহিক কম্পন দ্বারা উহা আরও সুঠাম ভাবে ধরা পড়ে।

এই কারণে প্রার্থীদের কেউ একটি আরমেচার দেখালে অত্যধিক আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে। কেউ বা তাতে নির্লিপ্ত ভাব দেখায় বা ভীত হয়ে উঠে। এই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায়, প্রথমোক্ত ব্যক্তির মধ্যে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হবার উপযুক্ত পরিজ্ঞান ও প্রবণতা আছে। এই জন্য ঐ ব্যক্তিকে এই কাজে ভর্তি করে নেওয়া উচিত।]

করনিকদের কাজ-কর্ম দেহগত শ্রমিকদের মত হয় না। এদের দ্রুত গতিতে চিঠি-পত্র ড্রাফট করতে হয়। এজন্য এদের মধ্যে ভাষার জ্ঞান অধিক থাকা চাই। এদের বহু জনকে একত্রে নিম্নোক্ত লিখিত প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করা যেতে পারে। এখানে কয়েকটি বিদেশীয় ইংরাজি প্রশ্ন উদ্ধৃত করলাম। অনুরূপ ভাবে দেশীয় ভাষাতেও প্রশ্নাদি চয়ন করা যেতে পারে। কিন্তু বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রে নাগরিকদের এই সকল প্রশ্নোত্তর আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরাজিতে তৈরি করা ভালো।

(১) টেনডর অ্যাণ্ড টাফ্ আর ওআর্ডস্ অফ্ [অপোসিট্, সেম্] মিনিঙ্!—আণ্ডারলাইন কারেক্ট্ আনসার। (২) গুড্ ইজ্ টু ব্যাড্ অ্যাজ্ হোইট্ ইজ্ টু [ক্লিন্, ব্ল্যাক্, উইকেড্, বেস্ট] ।—আণ্ডার-লাইন দি কারেক্ট্ আনসার। (৩) দি ম্যান [রোড, ফেল, অর্ ক্লাইম্বড্] অফ্ হিজ্ বাইসেকেল অ্যাণ্ড্ [কিয়োর্ড, ব্রোক্, চেঞ্জড্] হিজ্

আর্ম ।—আণ্ডারলাইন কারেক্ট্ ওয়ার্ডস্। [৪] মিক্সড্ সেনটেন্সেস : নাইট অ্যাট্ স্লিপ্ টাইম ইজ্ দি টু বেস্ট্।—রি-অ্যারেঞ্জ দি সেনটেন্স্ অ্যাণ্ড সে ওয়েদার ইট ইজ ট্রু অর ফলস্। [৫] রিসিনিঙ্: খ' আছে গ-এর পশ্চিমে এবং গ আছে ক-এর পশ্চিমে। তাহলে ঐ 'ক' ঐ গ-এর উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে না পশ্চিমে আছে ?

মানুষের এই বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করার পর উহা কোন খাতে যেতে চায় বুঝা দরকার। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে বালকের উপযুক্ত জীবিকা [**Career**] কি হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে তার উপর নানা রূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা নির্দেশ দেওয়া সম্ভব। সাধারণ ভাবে বলা হয় যে মানুষের স্বকীয় হবি[**Hobby**] সমূহ পরিদৃষ্টে ইহা বলা যায়। কিন্তু বহু ব্যক্তি গৃহে টেবিল-চেয়ার যন্ত্র দ্বারা তৈরি করতে ভালোবাসে। কিন্তু তাকে ছুতার মিস্ত্রি হতে বললে সে আঁৎকে উঠে উহার প্রতিবাদ করবে। কারণ, মনে মনে সে নিজেকে একজন ভবিষ্যৎ হাকিম রূপে কল্পনা করে থাকে। এই দিক হতে বিচার করলে বুঝা যায় যে মানুষের ভবিষৎ জীবিকা পূর্ব হতে নিরূপণ করা অতো সহজ কার্য নয়। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে সঠিক ভাবে জীবিকা নির্বাচন না হলে মানুষের জীবন ধারণ দুর্বহ হয়ে উঠে। বহু ব্যক্তি অপছন্দকর জীবিকার মধ্যে নিজেকে জোর করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টাতে মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে। কেহ কেহ এই অবস্থাতে ঐ অপছন্দকর কর্ম পরিত্যাগ করে অপরাধী জীবন যাপন করতে শুরু করে। বহু ছাত্রের অঙ্ক শাস্ত্র বিভীষিকা হলেও ইতিহাস বা সাহিত্যে সে অতীব মনোযোগী। এরা সায়েন্স নিলে হয় তো এদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যেতো। কিন্তু আর্টস্ গ্রহণ করে এরা বড়ো জজ বা হাকিম হয়েছে। বহু ছাত্র লেখাপড়াতে অপদার্থ প্রমাণিত হলেও সে একটি গাড়ি মেরামত ত্বরিত গতিতে করেছে। এখানে বুঝা যায় যে

তার পক্ষে মেকানিকের জীবিকা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে ঘড়ি নির্মাতা, ইলেকট্রিসিয়ান, প্লামবার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে কি'না তা কে বলে দিতে পারে? ঘটনাচক্রে সে ইহার একটি বা অপরটি গ্রহণ করে এবং এতে সে হয় কৃতকার্য, নয় অকৃতকার্য হয়। কারণ, ইচ্ছামত প্রতিটি ক্ষেত্রে মনোনীত জীবিকার সন্ধান করতে পারা দুষ্কর। বহু ক্ষেত্রে পদপ্রার্থীদের কোন পদে নিযুক্ত হবার জন্যে সাধ থাকলেও সাধ্য থাকে না। কারুর পক্ষে ধাত্রী হবার ইচ্ছা হলেও তার উহার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা-বুদ্ধি থাকে নি। এইখানে একই গ্রুপের [ধরনের] অন্তর্গত বিভিন্ন শাখায় কার্যের মধ্যে একটিকে তার সুযোগ-সুবিধা ও বিদ্যা-বুদ্ধি মত বেছে নিতে হবে। এর পর এই মনোনীত কর্ম-গ্রুপের পেশার প্রতি তাহার প্রবণতাকে অভ্যাস দ্বারা উহার অন্তর্গত নির্দিষ্ট কার্যটিতে [শাখা] নিয়মিত-ভাবে মন বসাতে হবে। এইভাবে মূল বৃক্ষের [গ্রুপ] উপাসক মানুষটি তার ঐ নির্দিষ্ট শাখাকে ভালবাসতে শেখে। একই বৃক্ষের একটি শাখার বদলে অপর শাখা গ্রহণে তার খুব অসুবিধা হয় না। এই জন্যে কারুর হাকিম হবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে অবস্থা গতিকে পুলিশ-সুপার হলে তার কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার পক্ষে একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হওয়া সাধ্যাতীত হতো। এইজন্যে প্রথমে বিবিধ জীবিকা সমূহকে তাদের সান্নিধ্য অনুযায়ী এক-একটি গ্রুপে প্রথমে ভাগ করে নেওয়া দরকার। এমন কি সম্ভব হলে উহাদের কম-বেশি সাদৃশ্যানুযায়ী বিবিধ শ্রেণীতেও ভাগ করতে হবে। এর পর বিবেচনা করতে হবে যে ঐ বালকের ঐ সকল মূল বিভাগ এবং উহার শ্রেণী ও উপশ্রেণীর কোনটির উপর তার স্বাভাবিক আকর্ষণ বেশি

মাত্রাতে আছে। এই জীবিকা সম্পর্কিত বিভাগ ও উহার শ্রেণী ও উপশ্রেণী সৃষ্টির পন্থা নিম্নে প্রদর্শিত হলো।

জীবিকা

হাকিমী	প্রফেসারী	করনিক	ডাক্তার	ইঞ্জিনিয়ার
পুলিশী	ওকালতী	সেলস্ম্যান	বিজ্ঞানী	কৃষিবিদ্যাবিদ্

বহু ক্ষেত্রে পিতা যে কাজ করে তাতেই সে তার পুত্রকে নিয়োগ করে। বহু পিতা আবার নিজে যে কাজ করে তাতে তার পুত্রকে আনতে চায় না। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে নিজ নিজ কার্যে কেউ খুশি থাকে না। কোনও বালক বাড়ির কাজ সারবার জন্যে কারপেনটার হতে চায়। কোনও বালিকা রুগ্না মাকে নার্স করবার জন্যে নার্স হতে চায়। এই প্রকারের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে এই সম্পর্কে ধর্তব্যের মধ্যে আনা উচিত হবে না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে কেহ নিজে কার্পেন্টার না হলে কোনও বালক কারপেন্টার হবার উপযুক্ত কিনা তা বলতে পারে না। বহু ক্ষেত্রে শিক্ষক বা পিতামাতা তাদের নিজেদের ইচ্ছাকে পুত্রের উপর চাপাতে চায় এবং এদের কেহ কেহ সেই ভাবে তাদের পুত্র-কন্যাকে গড়ে তুলে। আমি মনে করি যে, কোনও কর্ম-গ্রুপের উপর বালকের স্বাভাবিক কর্ম-প্রবণতা দেখা গেলে বাক্-প্রয়োগ দ্বারা [সাজেসশন] উহার যে কোন শাখা কর্মের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করা সম্ভব। অবশ্য এ বিষয়ে উহাদের মানসিক ও দৈহিক গঠন অনুকূল হওয়া চাই।

কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন কালে তাদের জন্মগত ভাবে প্রাপ্ত এবং অভ্যাস দ্বারা অর্জিত কর্ম-প্রবণতা সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া উচিত। এই জন্যে কিরূপ পারিবারিক পরিবেশে সেই ব্যক্তি বর্ধিত সেই সম্বন্ধে কিছুটা খোঁজ-খবর করা যেতে পারে। উচ্চপদস্থ কর্মী নির্বাচনে ইহার প্রয়োজন সর্বাধিক। এর পর কি কি গুন ঐ প্রার্থীদের মধ্যে থাকা উচিত তার একটি তালিকা তৈরি করার প্রয়োজন, যথা—ক, খ, গ, ঘ গ্রুপ ইত্যাদি। প্রতিটি কর্ম-প্রার্থীকে সাক্ষাতের পর উহাদের প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক নম্বর দিতে হবে। এর পর ঐগুলি একত্রে যোগ দিয়ে দেখতে হবে যে কোন্ প্রার্থীর যোগফল সর্বাপেক্ষা অধিক হলো। এইভাবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি পর্যায় ক্রমে প্রয়োজন মত প্রার্থীদের মনোনীত করা যায়। কয়েক ক্ষেত্রে প্রার্থী-নির্বাচনার্থে কয়েক জনের একটি বোর্ড তৈরি করা হয়। এই-খানে তাদের পৃথক পৃথক ভাবে ঐ রূপে নম্বর দেওয়া যোগফলের সমষ্টিগত যোগফল দ্বারা উপরোক্ত পন্থাতে কর্ম-প্রার্থী নির্বাচন করা যেতে পারে।

প্রার্থী-নির্বাচক বোর্ডগুলির সদস্যগণ সুশিক্ষিত হলেও তাঁরা প্রত্যেকে সাধারণ মানুষ থাকেন। এ'জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দাপছন্দ এবং বহু-বিধ চিত্ত-প্রস্তুতি থাকে। এই জন্য প্রার্থী-সাক্ষাৎ কক্ষে প্রত্যেকের ধরন-ধারণ, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ভঙ্গি এবং তাদের চেহারার সুঠাম ভাব তাঁদের আগ্রহান্বিত করে। প্রায়শঃক্ষেত্রে এই সকল নির্বাচকগণ ইংরাজিনবীশ [অ্যাঙ্গলিসাইজড্] হয়ে থাকেন। এমন কি, এঁদের কেউ কেউ ভারতীয় পরিবেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ মানুষ।

[কোন এক যুবক বার দুই পাবলিক নির্বাচক সংস্থাতে

উপস্থিত হলেও মনোনীত হন নি। আমি প্রকৃত অবস্থা বুঝে তাঁকে এইরূপ এক উপদেশ দিই : 'মশাই ! রাতে বাউণ্ড এবং দিনে রৌদ্রে বার হওয়া বন্ধ করুন। রাত জেগে ও রোদে পুড়ে চেহারা আলুসেদ্ধ হয়ে গেছে। ঐ ইংরাজিনবীশ সদস্যরা আপনাকে দেখা মাত্র দুর্বৃত্ত মনে করে। অতএব ঐ বোর্ড বসার পূর্বে এক মাস ছুটি নিয়ে রৌদ্রবিহীন ঘরে অবস্থান করুন। রাতে মুখে পমেটম মেখে ভোরে উঠে কিউটি-কুরাস সোপ্ দ্বারা মুখ ধোবেন। এইভাবে আপনার মুখ যুবজনোচিত তুলতুলে হলে ইস্ত্রি-করা য়ুরোপীয় পোশাকে আপনাকে ইয়ং ও স্মার্ট দেখাবে।' পরের বার আমার উপদেশ মত কাজ করে নির্বাচক বোর্ডে হাজির হওয়া মাত্র তিনি উর্ধ্বতন পোস্টের কর্মে নির্বাচিত হন।]

আদালতে জেরার উত্তর দেবার সময় সাক্ষীদের ভাবতে হয় যে, বিপক্ষ পক্ষীয় উকিলবাবু ঐ প্রশ্নটি তাদেরকে কি উদ্দেশ্যে করলেন। তেমনি ভাবে নির্বাচক বোর্ডের সদস্যগণও একটা কিছু বুঝবার উদ্দেশ্যে পদ-প্রার্থীদেরকে ঐরূপ নানা প্রশ্ন করে থাকেন। পঠদ্দশায় [প্রাক্ স্বাধীনতা কালে] আমাকে কোনও এক সরকারী নির্বাচক বোর্ডে হাজির হতে হয়। জবরদস্ত পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট ঐ বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। হঠাৎ তিনি সকলকে সচকিত করে আমাকে ঐ সময় [পরাধীন ভারতে] একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসেছিলেন : 'আচ্ছা ! তোমাদের জাতীয় সঙ্গীত কি ?' তাঁর এই প্রশ্নের নির্গলিত উদ্দেশ্য বুঝতে আমার দেরি হয় নি। এই প্রশ্নের উত্তরে 'আমাদের জাতীয় সঙ্গীত—বন্দেমাতরম' এই কথাটি বললে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ইংরেজ-বিদ্বেষী মনে করতেন। 'আমাদের জাতীয় সঙ্গীত নেই' কিংবা 'গড সেভ্ দি কিঙ্ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত'—তাঁর প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ কোনও উক্তি করলে তিনি বুঝতেন যে আমার আত্মসম্মানবোধ এবং

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব নেই। এই বিপজ্জনক অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আমি সহজ সরল ভাবে তাঁর প্রশ্নের এইরূপ এক উত্তর দিই—"আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা' এই গানটি।" আমার এই উত্তর শুনা মাত্র স্যার চার্লস্ টেগার্ট বোর্ডের অপর দুইজন সদস্যের অভিমতের তোয়াক্কা না রেখে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেছিলেন: 'ওয়েল বয়! উই হ্যাভ্ সিলেক্টেড্ ইউ।'

বহু ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির কোনও কর্মে অসাফল্য নিশ্চিত রূপে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রায় দেখা যায় যে, ঐ ব্যক্তি কিছুকাল পরে ঐ নির্দিষ্ট কর্মে শ্রেষ্ঠ কর্মী হয়ে উঠে। এর কারণ এই যে, মানুষের বহু শ্রেষ্ঠ গুণ ও কর্মশক্তি নানা কারণে প্রদমিত অবস্থাতে থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে এদের অনেকের কাজকর্মে স্লো কিন্তু সিওর ভাব দেখা যায়। বাল্যকালে সুযোগের ও উৎসাহের অভাব এবং নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা এদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে। কিন্তু অনুকূল অবস্থাতে এদের এই মনোজট ধীরে ধীরে অপসারিত হলে তাদের প্রদমিত সদ্গুণ ও কর্মশক্তি তারা ধীরে ধীরে ফিরে পায়। এই ক্ষেত্রে অন্যদের অপেক্ষা আরও দ্রুত গতিতে কর্মক্ষেত্রে তারা সফলতা লাভ করেছে। এইরূপ প্রদমিত বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মশক্তি কারুর মধ্যে আছে কিনা তা মনোবিজ্ঞানীরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা বলে দিতে সক্ষম হন।

[বহু ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা গিয়েছে যে, কোনও এক পদ-প্রার্থী বহু স্থানে চাকরি করেছে। প্রতিটি স্থান হতে সে বহু প্রশংসাপত্রও সংগ্রহ করেছে। কিন্তু এখানে বুঝতে হবে যে, ঐ ব্যক্তি কেন একটি স্থানে বহু বৎসর টিকে থাকে নি। এ'জন্য আণ্ডার-কোআলিফায়েড্ ব্যক্তির মত ওভার-কোআলিফায়েড্ ব্যক্তিদেরও পরিহার করা উচিত।]

শ্রমিকদের ভর্তিকালে তাদের সাথে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করা উচিত। ভর্তির পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তারা বাইরের লোক [আউট-সাইডার] হওয়া সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে এদের বসবার স্বব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয় নি। এতে যা বিরূপতা সৃষ্টি করা হয় তা ভর্তির পরেও সদা জাগ্রত থেকে অশ্রদ্ধার ভাব আনে। উপরন্তু নির্বাচকগণ প্রায়ই প্রার্থীদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে থাকেন। আমার মতে কর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নের বাইরে অন্য কোনও প্রশ্ন তাদেরকে না করাই ভালো। কর্মপ্রার্থীর যেন ধারণা না হয় যে, তাকে এখানে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এতে উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ প্রার্থীরা নিজেদের অপমানিত মনে করেন। তাদেরকে বুঝতে দিতে হবে যে তাদের নিকট হতে শুধু সংবাদ [ইনফরমেশন] সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রতিটি প্রশ্ন বুঝে উত্তর দেবার জন্য তাদেরকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া চাই।

সাধারণতঃ (১) চমৎকার, (২) সর্বোত্তম, (৩) মন্দ নয় এবং (৪) অতি খারাপ—এইরূপ বিভাগে প্রার্থীদের বিভক্ত করলে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন কালে স্থবিধা হয়। কিন্তু এজন্য নির্বাচকদের নিজেদেরও যথেষ্ট গুণাগুণের অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এমন এক ব্যক্তিকে নির্বাচক-বোর্ডের সদস্য করা উচিত। প্রার্থীদের কি কি গুণ থাকা চাই তার একটা তালিকা পূর্বাহ্ণে তৈরি করতে হবে—যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যা, ব্যক্তিত্ব, বংশ ইত্যাদি। নির্বাচক-বোর্ডের সদস্যগণ পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ ধারণানুযায়ী তাদের নামের পাশে উপরোক্ত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তাদের প্রতিটি খাতে নম্বর বসাবেন। পরে তাঁদেব প্রত্যেকে এই সকল নম্বর যোগ দিয়ে যোগফল তৈরি করবেন। এখানে নির্বাচক-বোর্ডের সদস্যদের প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকারের যোগফল একত্রিত করে পর পর প্রার্থী মনোনয়ন করা যেতে পারে।

[কোনও এক কারখানাতে কর্মীদের কি কি দোষের জন্য বরখাস্ত করা হয় এবং তাদের কি কি গুণের জন্য তাদের প্রমোশন দেওয়া হয় সেইগুলি সাবধানে অনুধাবন করলে বিশেষ বিশেষ কর্মেতে প্রার্থীদের কি কি গুণ থাকা উচিত তার একটা ধারণা করা যায়। প্রার্থী নির্বাচক-বোর্ডের সদস্যদের এই সকল গুণাগুণ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে অবহিত হওয়ার দরকার। প্রার্থী নির্বাচকদের আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, এদের প্রতিটি ব্যক্তি নিষ্প্রয়োজনে একসাথে বহু গুণের অধিকারী হতে পারে না। অবশ্য এদের কয়েকটি গুণ নির্বাচন কালে থাকা চাই-ই। অন্য গুণাগুণ কর্মকালে তাদের অর্জন করার মত ক্ষমতা আছে কিনা—এইটুকু শুধু তাদেরকে প্রার্থী-সাক্ষাৎ দ্বারা কর্ম-প্রার্থীদের নিকট হতে জেনে বা বুঝে নিতে হবে।]

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, বেকার সমস্যা সঙ্কুল ভারতবর্ষে কর্মপ্রার্থীর অভাব নেই। [ফ্যাকটরির ফটকে ফটকে লিখে রাখা হয়—নো ভেকেন্সি।] সাধারণতঃ থরাথর করে প্রার্থীরা ফ্যাকটরিতে চাকুরির জন্য ধর্ণা দেয়। সংবাদপত্রে এজন্য বিজ্ঞাপন দেবারও প্রয়োজন হয় না। তা সত্ত্বেও এখানে কুশলী [skilled] শ্রমিকের অভাবে বহু যন্ত্র নীরব থাকে। এ'জন্য বেশি সংখ্যক কুশলী শ্রমিক সংগ্রহ করে রাখা ভালো। অবশ্য ভবিষ্যতে তাদের প্রয়োজন হবে কি'না তা'ও দেখা দরকার। কারণ, কেহ একাদিক্রমে দুইশত চল্লিশ দিন কাজ করলে তাকে ছাঁটাই করা যায় না। ঐ সকল অস্থায়ী কর্মী তখন আইন মত স্থায়ী পদের কর্মীরূপে গণ্য হয়। এদেশে শ্রমিক নিষ্ক্রমণ এবং ছুটি ভোগী ও গরহাজিরের সংখ্যা অত্যধিক। সেই অনুপাতে কিছু কুশলী শ্রমিক সংগ্রহ করে রাখলে ক্ষতি নেই। এতে এদের প্রয়োজনীয় বিশ্রাম কাল দেবার সুবিধা

হয়। এদের অভাবে ক্ষণকালও মেসিন নীরব থাকলে অসামান্য ক্ষতি হয়। সেই তুলনায় এদের বেতন ও ভাতা বাবদ বাড়্তি খরচ নগণ্য।

প্রায়ই কর্মকর্তারা শ্রমিক [উচ্চপদের] নিয়োগ কালে বাহিরের দিকে তাকান। সম্ভব হলে এদেরকে ভিতর হতেই সংগ্রহ করা উচিত। শ্রমিকদের আত্মীয়-স্বজনদেরও অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। এতে ওদের সমগ্র পরিবারের প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রভূত মমতা জন্মে। দুই পুরুষ যাবৎ কর্মরত কর্মীরা প্রায়ই দক্ষ হয়ে থাকে। ইংরাজ আমলে এ'জন্য কোনও [অনুগত] কর্মীর মৃত্যু ঘটলে তার নিকট আত্মীয়কে গ্রাম হতে ডেকে আনা হতো। তবে এদের সাথে বহিরাগতদেরও গ্রহণ করা উচিত হবে। অন্যথায় ফ্যাকটরি সমূহে দলগত আধিপত্যের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। ছাঁটাই শ্রমিকদের প্রতি সুবিচারার্থে তাদেরকে আহ্বান করে পুনর্বহাল করা উচিত। এইজন্য তাদের একটা তালিকা প্রতিষ্ঠানে রক্ষা করা উচিত। ঐ স্থলে এদেরকে নূতন করে সেখানে কাজ শিখাবার প্রয়োজন না হওয়াতে কোম্পানি লাভবান হবেন।

[বহু ক্ষেত্রে বাহিরের পদপ্রার্থী আহ্বানার্থে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে প্রতিষ্ঠানের নাম গোপন রেখে বক্স নম্বর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বহু সুশিক্ষিত উপযুক্ত পদপ্রার্থী কোম্পানির নাম না জেনে আবেদন পাঠাতে চান নি।]

বহু মালিকের ধারণা যে বহিরাগতদের তুলনাতে স্থানীয় অধিবাসীরা উদ্যোগ-শিল্পে অধিক শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটায়। এজন্য তাঁরা বাহির হতে কর্মী আমদানীর পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বিক্ষোভ-বিলাসী হয় না। বহিরাগত ব্যক্তিরা

সকলে কাজে নিযুক্ত থাকে এবং এরা কাজ না পেলে আপন আপন দেশ-ভুঁইয়ে ফিরে যায়। চাকুরি করছে এমন স্থানীয় লোকরাও বহিরাগতদের মত শান্তিতে থাকতে চায়। বহুল সংখ্যায় চাকুরিতে নিযুক্ত হতে পারলে স্থানীয় মানুষরাও আর বিক্ষোভ-বিলাসী হবে না। এদের একটি ব্যক্তিকে চাকুরি দিলে একটা গোটা পরিবার বশীভূত হয়ে যায়। কিছু কিছু স্থানীয় লোকদের চাকুরিতে অগ্রাধিকার না দিলে এই বিক্ষোভ উত্তরোত্তর বেড়ে শিল্পনগরীগুলির ক্ষতিসাধন করবে। এই বিষয়ে বাক্‌বিতণ্ডা এড়ানোর জন্য শিল্পপতিদের সরকার-প্রতিষ্ঠিত কর্মসংগ্রহ কেন্দ্রগুলির সহিত সাগ্রহে আন্তরিক সহযোগিতা করা উচিত! এই সকল এমপ্লয়মেণ্ট বুরোগুলি দক্ষ ও সৎ ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রয়োজন মত উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন এই সকল প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু রূপে সমাধা করতে সক্ষম। অসাধু উপায়ে আত্মীয়-স্বজন পোষণের উদ্দেশ্য কারুর না থাকলে এঁদের সহিত অসহযোগিতা করার অন্য কোনও কারণ নেই।

১২

বেতন প্রদান

শ্রমিকদের দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমের বিনিময়ে মুদ্রা দ্বারা তাদের বেতন দেওয়ার নিয়ম আছে। এই বেতন তাদেরকে নিয়মিত না দিলে সঙ্গত কারণেই শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটে থাকে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান বিদ্রোহ কেবল মাত্র অনিয়মিত বেতন প্রদানের কারণে ঘটে গিয়েছে। বিভিন্ন ফ্যাকটরির বিভিন্ন প্রকার আর্থিক অবস্থার কারণে একই কাজের জন্য শ্রমিকদের বিভিন্ন হারে বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। এই জন্য ফ্যাকটরির অবস্থা ভেদে—একই কাজের জন্য শ্রমিকদের কম বা বেশি বেতন প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু কয়েকটি কারণে প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের অধিক বেতন [উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে] দেওয়া হয় না। এখানে অধিক বেতন না দেওয়া বা দেওয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক কারণের সহিত প্রশাসনিক কারণও আছে।

অধুনা কালে কারুর এক লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় হলে তার থেকে ন্যূনাধিক আশি হাজার টাকা আয়কর প্রভৃতি বিভিন্ন ট্যাক্স বাবদ সরকারের প্রাপ্য। এইজন্য সাধারণতঃ মালিকগণ বহু অর্থ তাঁদের কর্মচারীদের বেতন ও বোনাস স্বরূপ তাদের মধ্যে বন্টন করে থাকেন। এতে ইনকাম্ ট্যাক্স্ প্রভৃতির স্ল্যাব কমে গেলে তাদের লাভের অঙ্ক বেড়ে যায়। কিন্তু এইরূপ সুব্যবস্থা তাঁরা মাত্র তাঁদের উচ্চপদস্থ

কর্মচারীদের সম্পর্কে করে থাকেন। কারণ শ্রমিক-আইন মত পাঁচশত টাকার অধিক বেতনের কর্মচারীদের বরখাস্ত করা সহজ। উপরন্তু এঁদের চাকুরি যাবার ভয় আছে এবং এঁরা শ্রমিক যুনিয়নের মেম্বার হন না। এই বশংবদ ব্যক্তিদের ধর্মঘটাদিতে যোগ দেওয়ারও প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, এইরূপ ব্যবস্থা নিম্ন পদের কর্মীদের সম্পর্কে করা হয় না কেন? বহু প্রতিষ্ঠান খরচ দেখাবার জন্যে অকারণে কম-বেতনের বহু শ্রমিক নিয়োগ করেছেন কিন্তু বরখাস্ত করার সুবিধার জন্যে তাদের স্থায়ী পদে নিযুক্ত করেননি। এদের স্থায়ী হবার পূর্বে বরখাস্ত করে কিছু দিন পর পর পুনর্নিয়োগ করা হয়। এঁরা অন্যান্য কারণে বেশি বেতনে [প্রয়োজনীয় সংখ্যক] কম শ্রমিক নিয়োগের পক্ষপাতী নন। বরং তাঁরা নিষ্প্রয়োজনে কম বেতনে বেশি সংখ্যক ঠিকা-শ্রমিক নিয়োগ করবেন। অবশ্য এতদ্‌সহ ব্যবসায়িক ভিত্তিতেও কম আয় দেখানোর জন্য আরও বহু প্রকার কৃত্রিম উপায়ে খরচ-খরচা দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু এতো সত্ত্বেও নিম্ন আয়ের নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থায়ী শ্রমিকদের অধিক বেতন না দিয়ে তাদেরকে তাঁরা চির দরিদ্র করে রাখারই পক্ষপাতী। কারণ, শ্রমিকরা বেশি অর্থ ঘরে জমাতে পারলে মালিকের পক্ষে তাদের তাঁবে রাখা কঠিন হয়ে উঠে। ঘরে জমানো অর্থ থাকলে ধর্মঘট কালে তারা বহু দিন ধর্মঘট চালাতে সক্ষম হয়। জুট মিলের কর্মীদের তুলনাতে কটন্ মিলের কর্মীদের বেতন অধিক। এইজন্য দেখা যায় যে কটন্ মিলের ধর্মঘটীরা জুট মিলের ধর্মঘটীদের অপেক্ষা অধিক কাল ধর্মঘট চালাতে পেরে থাকে। উপরন্তু একবার এদের বেতন বাড়ালে পরের বছর তারা আরও বেশি বেতন চেয়ে বসে। কারণ, আপন অবস্থাতে মানুষ কোনও দিন সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। তাদের দাবি-

দাও.। উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়ে থাকে। প্রয়োজন না থাকলেও শ্রমিক-নেতারা তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে নূতন নূতন দাবির সৃষ্টি করেন। কোনও কোনও মালিকের মতে দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবার-ভারাক্রান্ত শ্রমিকদের সহজে আপন তাঁবে রাখা যায়। এইজন্য এইরূপ মনোবৃত্তির মালিক দ্রব্যোৎপাদন পর্যন্ত না বাড়িয়ে তা যে কোনও উপায়ে চেপে রাখার পক্ষপাতী। [বিদেশে বাজার দর বাড়াবার জন্যে উৎপন্ন দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলার রীতি আছে।]

বিঃ দ্রঃ—আমি কিন্তু এইরূপ হীনতার আশ্রয় গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। বরং কম বেতনের অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ না করে বেশি বেতনের কম শ্রমিক নিয়োগ শ্রেয়ের কাজ। এতে সুখী শ্রমিক-কুল আর্থিক সচ্ছলতার কারণে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে সক্ষম হয়। অবশ্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু উহাদের নিয়োগের পরে উপরোক্ত কারণে বিতাড়ন দ্বারা ঐ সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হয়ে উহা আরও জটিল হয়ে উঠে।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উপরোক্ত অপবাদ প্রযোজ্য নয়। এদেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এরূপ হীনাচরণের প্রশ্রয় দেন নি। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে শ্রমিকদের অধিক বেতন দিতে অপারক থাকেন; এঁদের কেহ কেহ আবার বেতন বাবদ অর্থ বাঁচিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বাড়ানোর পক্ষপাতী। দেশ হতে বেকার সমস্যা দূরীকরণার্থে ইহার প্রয়োজনও আছে। অধিক বেতনের দাবিতে ঘন ঘন স্ট্রাইক প্রভৃতি শ্রমিক-বিক্ষোভের কারণে বহু নূতন প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তিও ঘটেছে। কয়েক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী পুরাতন প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা দূর করে ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁদের একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে নূতন প্রতিষ্ঠানটির ধ্বংসার্থে অসাধু শ্রমিক-নেতাদের

অর্থ প্রদানও করেছেন। শ্রমিকদের পক্ষে নিজেদের ঐ সকল আশ্রয়স্থল ভালো করে গড়বার আগেই নিজেদের তা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত নয়। এই জন্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা অনুধাবন করে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া উপস্থিত করা উচিত হবে।

শ্রমিকদের জীবন ধারণের উপযোগী বেতন দেওয়া উচিত—এই বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হওয়ার কারণ নেই। বহু ব্যক্তির মতে জীবন ধারণের উপযোগী বেতন দানে অক্ষম প্রতিষ্ঠানের পৃথিবীতে টিকে থাকবার অধিকার নেই। কিন্তু প্রথমাবস্থাতে অধিক বেতন দিলে প্রতিষ্ঠানের জন্ম-লগ্নতেই তার মৃত্যু ঘটতে পারে। একেবারে অনাহারে মৃত্যু বরণ অপেক্ষা স্বল্পাহারে জীবিত থাকা নিশ্চয়ই উত্তম ব্যবস্থা। ছোট ফ্যাকটরিতে কম বেতনে সহজে কাজ শিখে অধিক বেতনে বড় ফ্যাকটরিতে শ্রমিকরা নিযুক্ত হতে পারে। উপরন্তু ঐ ছোট ফ্যাকটরি বড়ো হলে পুরানো শ্রমিকদের সেখানে উচ্চ পদে নিয়োগের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলবো যে শ্রমিকদের জীবন ধারণের উপযোগী বেতন প্রদানে সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু এই বেতনের পরিমাণ কতো হবে তা আজও বিতর্কের বিষয়। কেউ কেউ বলেন যে তৎকালীন ভোগ্য-পণ্যের বাজার-দর অনুযায়ী উহা নির্ধারিত হওয়া উচিত। যেখানে এক টাকাতে দুই মণ চাল পাওয়া যেতো সেখানে এক টাকাতে এক মণ চাল পাওয়া গেলে ধরে নিতে হবে যে বাজার দর বেড়েছে। কিন্তু ভোগ্য-পণ্যের এই দর কমা বা বাড়ার জন্যে অধিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দায়ী। প্রতিটি ক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠান-গুলিকে এ'জন্য প্রত্যক্ষ রূপে দায়ী করা যায় না। খাদ্য ও বস্ত্রের দাম বাড়লে ক্রেতারা ব্যয় সঙ্কুলনার্থে ভোগ্য দ্রব্য কম সংখ্যাতে কিনে। এতে বরং বহু ফ্যাকটরি পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ে অপারক হয়ে বন্ধ হবার

উপক্রম হয়। এখানে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান কিরূপে শ্রমিকদের এই বাড়তি অভাব পুরন করতে পারে তা বুঝা দুষ্কর। 'এক সময় যারা অধিক লোকসান দেয় তারা অন্য সময় অধিক লাভ করে। অতএব এরা পুঁজি অর্থ হতে তাদের এই ঘাটতি পুরন করুক'—এইরূপ ব্যাখ্যা কোনও কোনও মহল হতে শুনা যায় বটে! কিন্তু অধুনা সমাজবাদী কল্যান-রাষ্ট্রে অতি-মুনাফা লুঠার সুযোগ কোথায়? তাই এখানে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

মালিকগণ বলে থাকেন যে প্রদত্ত বেতন অনুযায়ী শ্রমিকদের নিকট হতে তাঁরা শ্রম পান না। শ্রমিকরা পাল্টা অভিযোগ করে বলে যে, তারা যা কার্য করে তদনুরূপ বেতন তারা পায় না। শ্রমিকরা পরিসংখ্যা দ্বারা নিজেদের এই অভিযোগ প্রমাণে সচেষ্ট হলে মালিকরা বলেন যে, বহু-ব্যয়ের উন্নত যন্ত্র আমদানী করাতে সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। এইজন্য এই উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে দ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের একটু মাত্রও কৃতিত্ব নেই। এই পরস্পর বিরোধী ধারণার কারণে শ্রমশিল্পে শান্তি বিঘ্নিত হয়ে থাকে। এই বিষয়ে ম্যানেজমেণ্ট সকল দিক বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সন্তোষ আসবে। সেখানে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে মালিক-শ্রমিক উভয়ে নিজেদের সুখী পরিবার মনে করতে পারে। কিন্তু শ্রমিকদের অধিক হারে বেতন প্রদান কালে প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষসমূহ আরও কয়েকটি গুরুতর বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করতে বাধ্য। এখানে প্রতিষ্ঠানের অংশীদারকে উপযুক্ত লভাংশ দিতে হবে এবং জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে তৈরি দ্রব্য সরবরাহ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বহু স্বল্পমূল্যের অংশীদার শ্রমিকদের অপেক্ষা বহুগুণ বেশি

দরিদ্র। উপরন্তু তাদের শেয়ার ক্রয় বাবদ কষ্টে সঞ্চিত স্বল্প অর্থ এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বরাবরের মত আটকে থাকে। এ'জন্যে এই কয়েকটি পৃথক মানব-গোষ্ঠীর পারিবারিক স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন নির্ধারণ করা উচিত।

মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক বেতন সাধারণতঃ শ্রমিকদের দেওয়া হয়ে থাকে। এজন্য প্রতিদিন এদেরকে একটি নিদিষ্ট সময় কাল কাজ করতে হয়। সাধারণ ভাষায় উহাকে কর্মকাল বা সিফট বলা হয়ে থাকে। ছয় ঘণ্টা হতে আট ঘণ্টা এক এক সিফটে কাজ হয়। [কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে কেউ অস্বাভাবিক রূপ কম কাজ করলে তাকে সেজন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়।] এই নিদিষ্ট তথা ফিক্সড্ বেতন, অতিরিক্ত পিস্‌রেট বা ফুরনের প্রথারও প্রচলন আছে। এতে শ্রমিকরা যতো বেশি দ্রব্য তৈরি করবে ততো বেশি তাদেরকে অর্থ দেওয়া হয়। একই আকারের ও প্রকারের দ্রব্য নির্মিত হলে ঐ তৈরি দ্রব্যের সংখ্যার উপর নির্ভর করে ফুরন করা যায়। কিন্তু যেখানে বহু প্রকারের ও আকারের দ্রব্য একই লোক তৈরি করে, সেখানে ঘণ্টা প্রতি তৈরি দ্রব্যের ওজনের বা মূল্যের উপর তাদেরকে পারিশ্রমিক দেওয়া যায়। কয়েক ক্ষেত্রে বেতন প্রদানে মিশ্র পন্থাও অবলম্বিত হয়ে থাকে। এখানে আট ঘণ্টার [এক সিফট্] কাজেতে তাদের একটি নির্দিষ্ট বেতন থাকে। তাকে বলা হয় যে, ঐ সময়ের মধ্যে অতো সংখ্যক [পরিমাণ] দ্রব্য উৎপাদন করে দিতে হবেই ; কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার উর্ধ্বে দ্রব্যোৎপাদন করলে সেই সকল দ্রব্যের সংখ্যানুযায়ী তাদেরকে বাড়তি অর্থ দেওয়া হবে।

এ দেশের শ্রমিকদের জীবন ধারণের মান স্বল্প [নিম্ন] হওয়াতে এদের কর্মের অনুপাতে উপযুক্ত বেতন দেবার রীতি নেই। অধিক ক্ষেত্রে

এদের জীবনধারণের ব্যক্তিগত মান অনুযায়ী বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। এই জন্য একই রূপ কাজ করে য়ুরোপীয়রা বেশি এবং ভারতীয়েরা কম বেতন পেয়ে থাকে। কিন্তু ভারতের মত অনগ্রসর দেশে ইহার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা আপাততঃ সম্ভব হবে না। উদ্যোগ-শিল্পে বিভিন্ন রূপ কর্মের কারণে সকল শ্রমিক একই হারে বেতন পেতে পারে না। তাদের স্ব স্ব কর্মের ও পদের গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন হারে তাদের বেতন প্রাপ্য হয়। গুরু ও লঘু কর্ম এবং উঁচু ও নীচু পদানুযায়ী বেতনের হারও কম বা বেশি হয়ে থাকে। এইজন্য শ্রমিকদের কর্ম ও পদ অনুযায়ী উপযুক্ত বেতন নির্ধারণের জন্য কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পন্থা আছে। এই সকল পন্থা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাক।

(১) কর্মনির্ধারণ :—কোনও এক পদের কর্মে কি কি কাজ কিরূপ ভাবে করতে হয় এবং ঐ কার্যে লিপ্ত কর্মীদের কি কি গুণ থাকা উচিত—উহাদের একটি সমীক্ষা সম্যক রূপে করে তৎলব্ধ তথ্য সমূহ একটি পৃথক পত্রে লিপিবদ্ধ করে কর্মের পদ-নির্ধারণ করা হয়। এইখানে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের শক্তি ও উহার বিপদ, উহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য পরিমাণ ও সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি ও তৎসহ ঐ যন্ত্র দাঁড়িয়ে বা বসে চালাতে হবে—এই সকল খুঁটিনাটি বিষয়ও এই সম্পর্কে বিবেচনা করে ঐ পত্রে উহার উল্লেখ করতে হবে। এইখানে কর্মীর সহিত সম্পর্ক বিরহিত ভাবে শুধু ঐ কর্মের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। উদ্যোগ-শিল্পে পদ-মূল্যায়ন করার জন্য ইহার সবিশেষ প্রয়োজন আছে। এই পদ-মূল্যায়নের রীতিনীতি সম্বন্ধে পরে বিবৃত করবো।

(২) কর্মানুধাবন :—শ্রমিককুল কুশলী ও অকুশলী এই দুই

শ্রেণীতে বিভক্ত। কুশলী শ্রমিকরা অধিক এবং অকুশলী শ্রমিকরা কম বেতন পেয়ে থাকে। দৈহিক পরিশ্রমী শ্রমিকদের মধ্যে কে কুশলী ও কে অকুশলী তা সহজে বুঝা যায়। কিন্তু যান্ত্রিক যুগে কম উৎ-পাদনের জন্য শ্রমিকদের মত যন্ত্রের নিকৃষ্টতাও দায়ী। এইখানে কুশলী শ্রমিকদের কর্মের সাথে উন্নত উৎপাদক যন্ত্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এখানে প্রথমে জানতে হবে যে কোনও এক উন্নত উৎপাদক যন্ত্রেতে যথাযথ শ্রম নিয়োগ করে নির্দিষ্ট সময়েতে কতো উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদন সম্ভব। ঐ যন্ত্রে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের এই সর্বোচ্চ সংখ্যাটির উপর ভিত্তি করে শ্রমিকদের কর্মানুধাবন [**work-study**] করতে হবে। এখানে দেখতে হবে যে উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ব্যক্তিগত বা যৌথ ভাবে ঐ সর্বোচ্চ সংখ্যার কতো কাছাকাছি উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎ-পাদন করে ঐ ফ্যাকটরির কর্মের নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে সক্ষম হলো। ফ্যাকটরিতে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের এই সর্বোচ্চ সংখ্যাটি নির্ধারণ করতে হলে কর্মানুধাবনের প্রয়োজন হয়। যন্ত্রী ও যন্ত্র সমূহের সম্মিলিত কর্মরীতি [**Method study**] অনুধাবন দ্বারা কর্মের পরিমাপ বুঝা যায়। এইখানে দ্রব্যোৎপাদনার্থে ফ্যাকটরির কর্মচক্রের 'ক' হতে 'ঙ' পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ অনুধাবন করতে হবে। [উহার ক্রিয়াকাণ্ড পরিদর্শন, দ্রব্যাহরণ ও অপসরণ।] যদি দেখা যায় যে এইরূপ পরিক্রমাতে কোনও ত্রুটি না থাকা সত্বেও ফ্যাকটরিতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদন কম হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে সেই ফ্যাকটরির কর্মীদের কর্মের মধ্যে যথেষ্ট গাফলতি আছে। এইরূপ পন্থাতে [টিম ওআর্কে] একের দোষেতে অপর ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয় না এবং প্রকৃত পক্ষে দোষী ব্যক্তিকে সহজে খুঁজে বার করা যায়। এইরূপে শ্রমিকদের কর্মের মূল্যায়ন মুভি ক্যামেরা বা স্টপ ওআচ্ দ্বারা

বুঝা যায়। শ্রমিকদের কর্মের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রুতগতি না থাকলে তাদেরকে কুশলী শ্রমিক বলা যায় না। যেখানে যৌথ কর্ম বা টিম ওআর্ক দ্বারা ফ্যাকটরির সামগ্রিক দক্ষতা নির্ভর করে সেখানে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও যৌথ দক্ষতা এই পন্থাতে নিরূপিত হতে পারে।

বিঃ দ্রঃ—বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকরা অযথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কয়েক ক্ষেত্রে তারা নিষ্প্রয়োজনে ছুটাছুটি করে। এইরূপ অযথা পরিশ্রম হতে তাদেরকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই এইরূপ পর্যালোচনা। এইরূপ পরীক্ষাতে শ্রমিকদের ত্রুটির মত ব্যবস্থাপনার বহু ত্রুটিও ধরা পড়ে। এই পরীক্ষা যে শ্রমিকদের কর্মের উন্নতির জন্য করা হয় পূর্বাহ্ণে তাদেরকে তা না বুঝালে তারা এই সব বিষয়ে স্বভাবতঃই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে। এদের কেহ কেহ এতে অকারণে ভয়ও পায়। এ'জন্য এরূপ পরীক্ষা শ্রমিক যুনিয়নের সাথে পরামর্শ করে করা উচিত।

(৩) পদ-মূল্যায়ন ঃ—ফ্যাকটরি ও অফিস আদিতে উঁচু-নীচু বহু পদ বা পোস্ট নির্ধারিত থাকে। এক এক প্রকারের পদের জন্য এক এক প্রকার বেতন ধার্যহয় [Job revaluation]। এই পদ-মূল্যায়ন দ্বারা উঁচু বা নীচু পদের যুক্তিযুক্ততা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যে সকল কাজের মধ্যে অধিক দায়িত্ব-বোধ, কলা-কৌশল, বিদ্যা-বুদ্ধি ও কর্ম-প্রয়াস প্রয়োজন সেই সকল পদে নিযুক্ত কর্মীদের অধিক বেতন প্রাপ্য। একটি পদের কার্য মূল্যায়নের সাথে অপর পদের কার্য মূল্যায়নের তুলনা করা উচিত হবে। এই ভাবে বিচার করে কর্মে তথা পদে উচ্চ বা নিম্ন রূপ শ্রেণী বিভাগ [Ranking] করা হয়। এখানে একটি পদ হতে অপর পদ শুধু যে উঁচু তা নির্ধারণ করলেই হবে না; সেখানে একটি পদ হতে অপর পদটি কতোখানি উঁচু তাও বুঝে নিতে হবে। এখানে কর্মের ও পদের ইমপর্টেন্স্ অনুযায়ী বেতন নির্ধারিত হয়। সুষ্ঠু পদ মূল্যায়ন

ব্যতীত ফ্যাকটরির বিভিন্ন পদসমূহের শ্রেণী-বিভাগ ও উহার সাহায্যে প্রয়োজনীয় সংগঠন [অরগেনিজেশন্] কার্য সম্ভব হয় না।

(৪) দক্ষতা-নিরূপণ :—শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা নিরূপণ দ্বারাও তাদের কম বেশি বেতনের হার নিরূপণ করা যেতে পারে [**merit rating**]। শ্রমিকদের কার্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকা বা না থাকার উপর তাহাদের পদোন্নতি, পদাবনতি বা কর্মচ্যুতি নির্ভর করে। এই দক্ষতা নির্ণয়ের রীতি-নীতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে উহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পরিবেশন করা যাউক। প্রকৃত দক্ষ ব্যক্তি কারা তাহা নিম্নের বিষয়বস্তু হতে বুঝা যাবে।

(ক) এক ব্যক্তি এক ঘণ্টাতে দশটি উৎকৃষ্ট দ্রব্য তৈরি করলো এবং অন্য ব্যক্তি ঐ সময়ের মধ্যে আটটি অনুরূপ দ্রব্য তৈরি করলো। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ বলা হবে। (খ) এক ব্যক্তি স্বল্প কালের মধ্যে কোনও যন্ত্রে ভালো দ্রব্য তৈরি করতে সক্ষম কিন্তু সে ঐ সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রটির ত্রুটি হলে তা নিজে মেরামতে অক্ষম। কিন্তু অপর ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়েতে ভালো দ্রব্য তৈরির সাথে প্রয়োজন হলে বিনা সাহায্যে যন্ত্রের মামুলী ত্রুটি নিজেই মেরামত করে। এক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ ব্যক্তি। (গ) এক তদারকি অফিসার নিজে অনেস্ট কিন্তু সে তাঁবেদারদের মধ্যে অনেস্টি এনফোর্স করতে পারে না। অন্য তদারকি কর্মী নিজে অনেস্ট ব্যক্তি তো বটেই, উপরন্তু সে সেই সাথে তাঁবেদারদের অনেস্ট থাকতে বাধ্য করে। এ ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ কর্মী। (ঘ) এক ব্যক্তি যন্ত্র খারাপ থাকলেও কর্মচাতুর্য দ্বারা তাকে সংযত করে উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম। কিন্তু অপর

ব্যক্তি যন্ত্রের মধ্যে কোনও একটু ত্রুটি থাকলে উহাতে উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম না। এখানে প্রথম ব্যক্তিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ বলা হবে। (ঙ) এক ব্যক্তি অন্যের পরামর্শ ব্যতীত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, কিন্তু অপর ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রে বারে বারে অপরের মুখাপেক্ষী। এই ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ। (চ) এক ব্যক্তি একটি মাত্র কাজ জানে ও তা করতে পারে। কিন্তু অপর ব্যক্তি একাধিক কাজে অভিজ্ঞ। প্রয়োজন হলে সে অন্য কাজও [মামুলি ধরনে] করতে পারে। এখানে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ কর্মী।

এই ভাবে দক্ষতা নিরূপণের উপর পদোন্নতির প্রশ্ন আসে। অধিক বেতন বা সম্মানযুক্ত পদকে উঁচু পদ বলা হয়। কোনও এক নীচু পদ হতে এই উঁচু পদে নিয়োগকে পদোন্নতি বা প্রমোশন বলা হয়। উপরোক্ত রূপ দক্ষতার সাথে উঁচু পদের কর্মীদের আরও কয়েকটি গুণ থাকার প্রয়োজন। নিম্নের পদে উপযুক্ত ব্যক্তি উঁচু পদের জন্য উপযুক্ত না'ও হতে পারে। এইখানে বিদ্যা-বুদ্ধির সাথে ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রশাসনিক জ্ঞানের প্রশ্নও জড়িত। শ্রমিকদের কর্মকুশলতা, দৈহিক সামর্থ্য ও দুর্বলতা প্রভৃতি বিবেচনা করে তাদের পদোন্নতির আদেশ দেওয়া হয়। এখানে পারস্পরিক সহযোগিতা, কর্মে মননশীলতা, নির্ভরযোগ্যতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দৈহিক স্বাস্থ্য, আনুগত্য, সহনশীলতা, শ্রমশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তি, ট্যাক্টফুলনেস্, কর্মচাতুর্য, নিয়মিত হাজিরানা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, সুঠাম ব্যক্তিত্ব, কর্মকুশলতা প্রভৃতি এখানে বিবেচ্য। প্রমোশন কালে ঐ ব্যক্তির পূর্বের পদ, যে পদে সে বহাল ও যে পদ পরে সে পাবে —এই তিনটি পদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণের চাহিদা বিবেচনা করতে হবে। এখানে ঐ ব্যক্তি নিম্নপদের ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয় এবং উচ্চ পদের

ব্যক্তি হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। এখানে এই শিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার ক্ষমতা এবং তৎসহ আদেশ শুনা এবং শুনানোর ক্ষমতা অনুধাবন করতে হবে। একক ভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারক ব্যক্তি উচ্চ পদের উপযুক্ত হয় না।

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এইরূপ দক্ষতা নিরূপণ কাহাদের মতানুসারে নির্ধারিত হবে। য়ুনিয়ন পক্ষ হতে বলা হয় যে মালিকদের প্রতি অযৌক্তিক আনুগত্যের জন্য কিংবা কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপারিশ ক্রমে শ্রমিকদের পদোন্নতি হয়। [ইহার মধ্যে সত্যতা আছে।] এঁদের মতে উপরোক্ত গুণাগুণ এদের মধ্যে আছে কি'না তা কোনও দিন দেখা হয় নি। এই সকল কারণে শ্রমিক য়ুনিয়ন সমূহ পদোন্নতির জন্য দক্ষতার বদলে সিনিয়রিটির উপর অধিক প্রাধান্য দেন। প্রাচীন কাল হতে এই সিনিয়রিটি অনুযায়ী [জ্যেষ্ঠ পুত্র] মানুষ রাজা পর্যন্ত পেয়েছে। এতে অযথা রক্তপাত প্রাচীন যুগে বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু উদ্যোগ-শিল্পে এই প্রাচীন ব্যবস্থা মূল্যহীন। অবশ্য পদোন্নতি কালে কর্মদক্ষতার সাথে সিনিয়রিটিও বিবেচনা করতে হবে।

[ভারতীয়েরা তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের যথাযথ সম্মান করে থাকে। যুবকরা বয়োজ্যেষ্ঠদের অধীনে কাজকর্মে সুখী। অপর দিকে যুবকরা এদেশে বয়োজ্যেষ্ঠদের উপর হুকুম প্রদানে কুণ্ঠিত হয়। এই জন্য সিনিয়রিটি না মানলে ভারতীয় শ্রমিকরা মনে-প্রাণে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে।]

সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে নীচের লোক উপরের লোককে ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠলে যৌথ আনুগত্যের হানি হওয়া স্বাভাবিক। 'সুপারসেসন [ডিঙ্গিয়ে উপর পদে উঠা] প্রথা না থাকলে উনি ঐ ঘরে আর আমি এই ঘরে বসেছি কেন? আমাকেও তো ঐ ঘরের ঐ ব্যক্তি ঐ

ভাবে সুপারসিড্ করেছেন'—কোন এক অধস্তন কর্মী সুপারসিডেড্ হয়ে তাঁর এক উর্ধ্বতন কর্মীর নিকট অনুযোগ করলে তিনি খিঁচিয়ে উঠে এই রূপ এক উক্তি করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা-হীন ব্যক্তিদের দ্বারা উন্নত ধরনের কাজকর্ম আশা করা যায় না। উপরন্তু সদা অ্যাগ্রিভড্ থাকাতে তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়। উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব পূর্ণ ব্যক্তিরা অন্যায় ভাবে সুপারসিডেড্ হলে যে কোনও ক্ষণে অসীম ক্ষতির কারণ হতে পারে। [এবল্ ম্যান্ ক্যান নট্ রিমেন্ কণ্টেন্টেড্।] তাদের পক্ষে অভিযোগ মুখর হয়ে উঠা অন্যায়ও নয়। এই জন্য প্রমোশন দেওয়া কালীন কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু তা ব'লে অনুপযুক্ত আনুগত্য-বিহীন কর্মীদের কোনও ক্রমে প্রমোশন দেওয়া চলে না। এমন কি, মালিকরা আশা করে যে শ্রমিকেরা তাদের প্রাপ্য বেতনও বিনীত ভাবে গ্রহণ করুক। অতি সুদক্ষ অথচ দুর্বিনীত ব্যক্তিদের সহ্য না করার মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই। ভুলে গেলে চলবে না যে দক্ষ কর্মীর বদলে দক্ষ কর্মী আজকাল সহজে পাওয়া যায়। তাদের বরদাস্ত করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই।

সাধারণতঃ তদারকি কর্মী এবং বিভাগীয় কর্তাদের সুপারিশ-ক্রমে শ্রমিকদের দক্ষতা নিরূপিত হয়। এ কথা ঠিক যে উর্ধ্বতনদের খুশি রাখা অধস্তনদের একটি অবশ্যকর্তব্য কর্ম [Duty]। কিন্তু কিছুমাত্র ব্যক্তিত্ব আছে এমন ব্যক্তি সকল সময় সকলকে সমান ভাবে খুশি করতে পারে না। বহুক্ষেত্রে উর্ধ্বতন অফিসার তাঁর অব্যবহিত অধস্তন অফিসারের চক্ষু দ্বারা নিম্নপদী কর্মীদের দক্ষতা বিবেচনা করেন। [দে ডু নট্ কেয়ার টু জাজ দেম্‌সেলভস্।] এই জন্য একাধিক উর্ধ্বতন কর্মীদের প্রতি-বেদন বিবেচনা করে অধস্তন শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা নির্ধারণ করা উচিত।

নির্ভুলভাবে দক্ষতা নির্ণয়ের জন্য কর্মীদের কর্ম সম্পর্কিত গোপন পুস্তকে উর্ধ্বতন কর্মীরা বৎসরের পরিশেষে মন্তব্য লিখেন। কোনও প্রকার বিরুদ্ধ মন্তব্যের ক্ষেত্রে উহা তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট-পক্ষকে তার চরিত্র সংশোধনার্থে জানানো উচিত। যাতে তারা নিরুৎসাহ না হয়ে পড়ে তার জন্যে তাদের সম্পর্কে ভালো মন্তব্যগুলিও তাদেরকে জানানো দরকার।

উদ্যোগ-শিল্পের যে সকল সমাচারের উপর নির্ভর করে কর্মীদের পদোন্নতি করা হয়, সেই সকল খবরাখবর ভিত্তি করে তাদের পদাবনতি [Degrade] বা বরখাস্তও করা হয়। কম বেতনের বা কম সম্মানের পদে নামিয়ে দেওয়াকে পদাবনতি বলা হয়। অনেকের মতে কারুর পদাবনতি না ঘটিয়ে তাকে সরাসরি বরখাস্ত করা উচিত। কারণ, এই অবস্থাতে তারা সর্বদা অসন্তুষ্ট ও অসুখী থাকে। কিন্তু এই পদাবনতি শিক্ষাপ্রদ ভাবে দুই-এক মাসের জন্য করা হলে ক্ষতি নেই। অন্যথায় তাদের পূর্ব কর্মস্থানের সহিত সম্পর্ক বিহীন একটি সম্পূর্ণ নূতন স্থানের এক পদে বহাল করতে হবে। আনুগত্য হীন অদক্ষ ব্যক্তিদের সরাসরি বরখাস্ত করাই শ্রেয়ের কাজ।

[পেনসন প্রদান ও অর্থ সাহায্যও এক প্রকার বেতন। যে ফ্যাকটরিতে পেনসন প্রদানের কোনও ব্যবস্থা নেই, সেইখানে পূর্ব কার্যের স্বীকৃতি স্বরূপ কাজে অক্ষম হলেও কিছুকাল পূর্ববেতনে তাদের কাজ করতে দেওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা হতে নবাগত কর্মীরা বহু বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবে। এই সকল বিষয় ব্যতিরেকে উদ্যোগ-শিল্পে উর্ধ্বতন অফিসারের অধীনে অধস্তন অফিসারকে তার প্রকৃত প্রমোশনের পূর্বে আণ্ডারস্টাডির জন্য মনোনীত করা উচিত। এতে তাদেরকে উচ্চপদে নিয়োগের পূর্বে তাদের দক্ষতা যাচাই

করে নেওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে একের স্থানে অপরকে অফিসিয়েট্ করতে বলেও তার ভবিষ্যৎ দক্ষতা নিরূপণ করা চলে। কিন্তু বহু অফিসার হীনমন্যতার কারণে মধ্যে মধ্যে ছুটি নিয়ে এদেরকে এই বিষয়ে সুযোগ দিতে চান না, পাছে তাঁরা পদচ্যুত হন বা তাঁরা তাঁদের কর্তৃত্ব হরান—এইরূপ এক অমূলক ভয়ে অতিষ্ঠ হওয়ায় তাঁরা একটি দিনের জন্যও ছুটি নিতে চান নি। আমার মতে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ করে এইসব মনোজট্ বিদূরিত করে অফিসারদের মধ্যে মধ্যে ছুটি নিতে উৎসাহিত করা উচিত। [ম্যানেজারগণ বহু ক্ষেত্রে এই ধরনের লোকদের দ্বারা নিজেদের কাজ-কর্মও তাঁদের বকলমে করিয়ে নেন। এজন্য তাঁরাও এঁদের সহজে কয়েক দিনের জন্যও ছুটি দিতে চান নি।] অবশ্য একথাও সত্য যে, এঁদের অবর্তমানে অন্য কর্মকর্তারা মালিকদের বাগিয়ে নিয়ে থাকেন।

(৫) উৎসাহ-বর্ধন :—কেবল মাত্র ন্যায্য বেতন প্রদান দ্বারা শ্রমিকদের নিকট হতে সর্বোত্তম কাজ পাওয়া যায় নি। শ্রমিকদের দ্বারা সর্বোত্তম কাজ পেতে হলে নানা ভাবে কর্মেতে তাদের উৎসাহ আনার প্রয়োজন। কর্মে শ্রমিকদের লিপ্সা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে ভাতা স্বরূপ বাড়তি অর্থ প্রদানের রীতি আছে। যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে স্বদেশ-প্রেমের কারণে শ্রমিকরা কোনও প্রকার ইনসেনটিভ্ ব্যতিরেকে নির্বিচারে দ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধি করে। কিন্তু অন্য সময় মালিকদের লভ্যাংশ হতে কিছু অংশ তারা বেতনাতিরিক্ত ভাতা রূপে পেতে চায়। এইজন্য বোনাস রূপে কিছু বাৎসরিক বা মাসিক বাড়তি অর্থ তাদের দেওয়া হয়। এই উৎপাদন ভিত্তিক বোনাস যৌথ কর্মলিপ্সার সহায়ক হয়। এতদ্বারা ফ্যাকটরির কুশলী-অকুশলী শ্রমিক নির্বিশেষে প্রতিটি উৎপাদক ও অনুৎপাদক শ্রমিকরা সমভাবে [Mass-incen-

tive] উপকৃত হয়। এই গণ-ইনসেনটিভের মত পারসোনাল ইন্-সেনটিভেরও প্রচলন আছে। এই স্থলে ব্যক্তি বিশেষকে তার ব্যক্তিগত কাজের জন্য সন্তুষ্টি বোনাস দেওয়া হয়ে থাকে।

উপরোক্ত দুই প্রকার ইনসেনটিভের মত অপর আর এক প্রকার ইন্সেনটিভের প্রচলন করা যেতে পারে। আমি আমার নিজস্ব ফ্যাকটরিতে ইহা পরীক্ষা করে যথেষ্ট উপকার পেয়েছি। ইহাকে দলীয় [গ্রুপ] ইনসেনটিভ্ বলা যেতে পারে। এখানে একই প্রকার কর্ম দুই দল শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এ'ক্ষেত্রে দলীয় ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের সংখ্যানুযায়ী বোনাস দেওয়া হয়। এইরূপে প্রাপ্ত বোনাসের অর্থ তাদের প্রতিটি দল সমান ভাবে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। এতে এক দলের কেহ কম কাজ করলে বা গরহাজির থেকে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটালে ঐ দলের অন্যান্য শ্রমিকরা তাকে যৎপরোনাস্তি তাডনা করে। এই ক্ষেত্রে যৌথ ভাবে শ্রমিকরাই নিজেদের কাজ-কর্মের তদারকি করে। এখানে মালিকদের শুধু দেখতে হবে যে একটু ক্ষণের জন্যও মেসিন সমূহ বিকল বা ত্রুটিপূর্ণ না থাকে। দলের একজনের দোষে সেই দল অপর দলের কাছে যাতে না হারে সেই সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিক দলসমূহ সদা সতর্ক থাকে। উচ্চমান দ্রব্যের স্বীকৃতিতেই এইরূপ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। ফ্যাকটরি সমূহে এই ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টিতে ফল উত্তম হয়।

শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন যেমন তাদের বিনীত ভাবে গ্রহণ করা উচিত, তেমন মালিকদেরও উহা সুঠাম ভঙ্গীতে তাদের প্রদান করা উচিত। একটুখানিও অবজ্ঞা এতে প্রকাশ না করে পাওনাদারদের পাওনা মেটানোর মত ঐ কার্য তাঁদের সমাধা করা উচিত। প্রয়োজন

হলে শ্রমিকদের ডেকে এনে তাদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া ভালো। তারা কেউ কর্মস্থানে হাজির হতে অক্ষম হলে উহা তাদের বাড়িতে পাঠানো দরকার কিংবা তাদের কোনও যোগ্য আত্মীয়ের হস্তে উহা অর্পণ করতে হবে।

১৩

শ্রমিক-সন্তোষ

শ্রমিক সন্তোষ দ্বারা কেবল মাত্র শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বুঝায় না। শ্রমিকরা সেই সাথে তাদের পরিবারবর্গের সুখ-সুবিধাও কামনা করে। যাদের জন্যে বহু কষ্ট স্বীকার করে ও বহু ব্যক্তির কটু কথা শুনে দেহপাত করে চাকুরি করা, তাদের প্রয়োজনীয় সুখ-সুবিধা না দিতে পারলে চাকুরি করার সার্থকতা কৈ ? এই জন্যে পরিবারবর্গের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা এবং সুলভে খাদ্য সরবরাহ, স্বল্প ভাড়াতে উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং পরিবারবর্গের জন্য শিক্ষা ও প্রমোদ ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর তারা অধিক প্রাধান্য দেয়। প্রভিডেণ্ট্ ফণ্ড্ প্রভৃতি ব্যবস্থাতে পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ সংস্থান তাদের সুখী করে।

অবশ্য এ কথাও ঠিক যে কেবল মাত্র অর্থ মানুষের সকল সুখ সৃষ্টি করতে পারে না। ধন-দৌলত, নারী ও প্রচুর খাদ্য কারুর অধিকারে থাকলেও আসল সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ ঐগুলির সাথে উহাদের ভোগ করার দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতাও মানুষের থাকা চাই।*

(*) কোনও এক শিল্প-পতির মাসিক আয় বিশ হাজার টাকা শুনে আমি বলেছিলাম— 'আরে! এতনা রুপেয়া লেকে আপ করতা ক্যায়া ?' আমার এই প্রশ্নে চোখের জল এনে ঐ ধনী ভদ্রলোক উত্তর করেছিলেন—'সাব! মেরে তো খানে' ভি মিলতা নেহী। ডাক্তার মেকো বোলা যে 'তুম খায়ে গা তো মর জায়গা।' নারী

[পারস্পরিক সন্তোষ বিধানের উপর কৃতজ্ঞতা শব্দটি তার প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায়। এই বিষয়ে জন্মদাতা পিতার পর্যন্ত অব্যাহতি নেই। কোনও এক বৃহৎ বাটীর বৈঠকখানা ঘরে কোনও এক স্বর্গত পিতার একটি বৃহদাকার অয়েল্‌পেন্টিঙ্‌ চিত্র দেখে ঐ বাটীর মালিককে একদা আমি প্রশ্ন করেছিলাম,—'আচ্ছা! আপনার এই প্রাসাদোপম বাটী কি আপনার ৺পিতাঠাকুর তৈরি করে গিয়েছেন?' 'আপনি কি করে তা বুঝলেন?'—আমাকে এইরূপ একটি প্রতিপ্রশ্ন তিনি করলে আমি তাঁকে বলেছিলাম যে তা না হলে এতো বড়ো তৈলচিত্র বোধ হয় তৈরি হতো না। এখানে বুঝা যায় যে ভদ্রলোকের জন্মদাতা পিতা তাঁর বার্ডেন্‌ না হয়ে অ্যাসেট্‌ ছিলেন। জন্মদাতা পিতার মত অন্নদাতা মালিক সম্বন্ধেও এই একই উক্তি করা চলে। তাই বহু অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকেও স্বগৃহে তাঁদের পূর্বতন মুরুব্বি মুনিবের ফটোচিত্র টাঙিয়ে রাখতে দেখা যায়।]

আহারেতে ও বেশ-ভূষাতে বহু পাশ্চাত্য দেশে মালিক ও শ্রমিক অভিন্ন। বাসস্থানের পরিধি ও চাকচিক্য এবং ব্যয়-বহুল যান-বাহনের মধ্যে তাদের যা কিছু প্রভেদ। এ দেশেতেও শিক্ষিত শ্রমিক ও মালিকদিগকে তাদের বেশ-ভূষা হতে চিনে নেওয়া দুষ্কর। বরং কথাবার্তা, শিক্ষা-দীক্ষা ও চালচলন হতে বহু মধ্যবিত্ত শ্রমিককে

সম্পর্কে যৌন বোধহীন ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও এই একই রূপ উক্তি করা চলে। এই সম্পর্কে উপনিষদোক্ত যমরাজ ও নচিকেতা উপাখ্যানটিও উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ উপাখ্যানে যমরাজ নচিকেতাকে বলেছিলেন—'তোমাকে আমি সসাগরা পৃথিবী, ধন-দৌলত ও অসংখ্য সুন্দরী নারী দেবো। আর সেই সঙ্গে তোমাকে ঐগুলি ভোগ করার দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতাও দেবো।'

ব্যবসায়ী শেঠজীদের অপেক্ষা বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর মনে হয়ে থাকে। এই দিক হতে বিচার করলে শ্রমিকদের তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) উচ্চপদী, (২) মধ্যবিত্ত এবং (৩) সাধারণ। এই তিনটি শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে মনোবৃত্তির বিভিন্নতার কারণে উহাদের সন্তোষ বিধানেতেও কিছুটা হের-ফের করার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

(১) উচ্চপদী শ্রমিক:—এঁরা কদাচ ধনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এঁদের মধ্যবিত্ত সমাজ হতে সংগ্রহ করা হয়। কারণ, এই মধ্যবিত্ত সমাজ বিদ্যা বুদ্ধি কলা জ্ঞান ও বিজ্ঞানেতে আজও পর্যন্ত একচেটিয়া অধিকারী। এঁরা সমাজ-জীবনে মধ্যবিত্তদের সাথে মেলা মেশা করলেও কর্ম জীবনে এঁরা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। এঁরা এঁদের পোশাক-পরিচ্ছদে ও চাল-চলনে অন্য শ্রমিককুল হতে তাঁদের পার্থক্য বজায় রাখেন। এঁরা উচ্চ বেতন ও সম্মান ভোগী তদারকি বা বিভাগীয় কর্মী হয়ে থাকেন। উদ্যোগ-শিল্পের শাসন-তন্ত্রের এঁরা স্টিল্‌ফ্রেম রূপে বিবেচিত। এঁরা প্রায় প্রত্যেকে উপ-ম্যানেজারের স্থলাভিষিক্ত রূপে বিবেচিত হন। এঁদের বাসস্থান সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রমিককুলের বাসস্থান হতে দূরে রাখা হয়। কারণ, মুহুর্মুহু সহজ মেলা-মেশা তাঁদের প্রতি অধস্তনদের সেরিমোনিয়াল ভীতি নষ্ট করে দেয়। এতে এঁদের তদারকি কার্য করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এঁদের পদানুযায়ী সম্মান অক্ষুণ্ণ না রাখলে এঁদের অধস্তনদের তাঁবে রেখে কাজ করানোর এবং ফ্যাকটরিতে নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষা করার অসুবিধা হয়।

(২) মধ্যবিত্ত শ্রমিক:—এঁদের মধ্যে ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ করনিক ও হিসাব-রক্ষক, টাইম্‌-কিপার প্রভৃতি অফিসের কার্যে নিযুক্ত থাকেন।

এঁদের বাকি জনগণকে সাধারণ শ্রমিকদের সাথে অধুনা একত্রে সাধারণ যন্ত্র-শিল্পীর কাজ-কর্মে আত্মনিয়োগ [অর্থনৈতিক কারণে] করতে হয়। এই সকল মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ অর্থনৈতিক অ্যারিসটোক্রেসির বদলে মেনট্যাল অ্যারিসটোক্রেসির অধিকারী। একখানি পরিষ্কার ধুতি ও কোর্তা অবলম্বন করেও শিক্ষা-দীক্ষার গুণে এঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এঁদের আত্মসম্মান জ্ঞান জীবন অপেক্ষাও প্রিয় হয়ে থাকে। সদব্যবহার:স্ট্যাটাস্, য়ুনিফর্ম এবং অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি অর্থাপেক্ষা এঁদের নিকট অধিক কাম্য। এঁদেরকে পঙ্কিল ড্রেনে নেমে উহা পরিষ্কার করতে বললে তাঁরা মারমুখী হয়ে উঠবেন। কিন্তু তাঁদের আপাদমস্তক [নেকারবোকার] পোশাক, গামবুট, চামড়ার দস্তানা ও গ্যাস মাস্ক দিলে ঐ কাজ তাঁরা উৎসাহের সাথে করবেন। এঁদের জল-কাদা ভেঙে লাঙল চষতে বললে তাঁরা সেই কাজ করতে অস্বীকার করবেন। কিন্তু এঁরা হাফ প্যাণ্ট ও হাফ্ শার্ট পরে, চখে নীল গগ্‌লস চশমা ও মস্তকেতে [রৌদ্রনিবারণী] সোলার হ্যাট পরে গলাতে চায়ের ফ্লাস্ক ঝুলিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাকটার লাঙ্গল চালাতে এঁরা সদা প্রস্তুত। এঁদের সাধারণ শ্রমিকদের সাথে একত্রে মামুলী কাজ করতে দিলে তাঁরা কর্ম ত্যাগ করে পালিয়ে যান। এজন্যে ভুল করে বলা হয় যে তাঁরা কঠোর কাজ করতে রাজি নন। কিন্তু এঁদের কয়েকজনকে পৃথক কামরাতে ঐ একই কাজ করতে দিলে তাঁরা সেখানে টিকে থাকেন। কারণ, এখানে তাঁরা তাঁদের কাম্য সন্তুষ্টি সম্পন্ন সঙ্গীর সঙ্গ [অ্যাসোসিয়েশন্] পেয়ে থাকেন। এখানে সারাদিন কাদা-ধুলা কিংবা পাটের বা তুলার সোঁয়া মেখে কর্মবিরতির পর সাবান দ্বারা গা ধুয়ে পরিষ্কার পোশাক পরে তাঁরা ক্লাবেতে বা সিনেমাতে যান। কিন্তু পর দিন শ্রমিক রূপে হাফ প্যাণ্ট ও শার্ট

পরে তাঁদের কর্মে যোগ দিতে বাধা থাকে না। [এই কারণে এঁদেরকে নির্বিচারে শ্রমবিমুখতার জন্য মজদুরের কার্যে অপারক প্রভৃতি অপবাদে কলঙ্কিত করা অনুচিত হবে।] প্রচুর বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী হওয়াতে এঁদের উপকার করার মত অপকার করারও ক্ষমতা অধিক। এইজন্য উক্তরূপ বৈজ্ঞানিক পন্থাতে এঁদের বিবিধ কর্মে নিযুক্ত না রাখলে এঁদের এই বিপুল শক্তি বাঁধন-হারা হয়ে অকারণে মুহুর্মুহু রাষ্ট্রবিপ্লবের সৃষ্টি করে থাকে। ভগবান বোধ হয় এঁদের দেহ ও মন যান্ত্রিক যুগের [অটোমেটিসেসন] উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার প্রসারের সাথে এঁদেব কলেবর ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ধনিক ব্যক্তিরা ধনসম্পদ হারিয়ে নেমে এসে এবং নিরক্ষর লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে এঁদের সাথে মিশে—প্রতিনিয়ত এঁদের কলেবর অধুনা কালে বৃদ্ধি করে থাকেন।

(৩) সাধারণ শ্রমিক :—সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের মত এতো মান-অপমানের বালাই নেই। তারা জীবন-ধারণের মত অর্থ পেলেই এবং নিতান্ত পশুব মত কদর্য ব্যবহার না পেলেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু তারা নিরক্ষর হলেও তাদের অশিক্ষিত বলা যায় না। গ্রামে কতকথা, যাত্রা, গান ও রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী কানে শুনে তারা মোটামুটি ভাবে শিক্ষিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুখ ভোগে এরা বিশ্বাসী নয়। বরং অতি সুখভোগ এদের হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগী করে তুলে। কারণ, মানুষকে সহ্যাতীত কোনও কিছু সওয়াতে গেলে সে ভেঙে পড়ে। এমনি বহু আদিম জাতিকে তাড়াতাড়ি সভ্য করাতে তাদের বংশ লোপ হয়েছে। এখানে রেভোলিউশনের বদলে ইভোলিউশনের প্রয়োজন আছে। সাধারণ

শ্রমিকদের গ্রহণ শক্তি অনুযায়ী ধীরে ধীরে তাদের উন্নত করতে হবে। এখানে নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত ও মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। এরা সঙ্গত কারণেই তাদের অনুকূল [মানসিক] পরিবেশের উপযোগী কুলিবস্তি ত্যাগ করে সরকার নির্মিত ত্রিতল কুঠিতে বাস করে না। এদের বস্তিসমূহ উন্নত না করে উহার উচ্ছেদ সাধন এদের পক্ষে ক্ষতিকর। আমাদের মতে তাদের পক্ষে যা ভালো, তাদের মতে কিন্তু তা অতীব মন্দ ও ক্ষতিকর। এই সকল বিষয় চিন্তা করে তাদের সন্তোষ বিধান করতে হবে। এদের একটি নড়নড়ে ভাঙা টুলে বসতে দিলে এরা খুশি হয়। কিন্তু এদেরকে একটি পালিশ করা উত্তম চেয়ারে বসালে এদের মন [সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে] সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে।

[অকল্পনীয় ভাবে সুখ-সুবিধা ভোগী ফ্যাকটরিতে বেশি অশান্তি দেখা যায়। কয়েকটি ফ্যাকটরিতে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত শ্রমিকদের সুইজারল্যাণ্ড পাঠানোরও বন্দোবস্ত আছে। সেখানে শ্রমিক প্রতিনিধিদের ব্যবস্থাপনাতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। তুলনা মূলক ভাবে দেখা গিয়েছে যে ঐ সকল উন্নত ফ্যাকটরিতে গোলোযোগ বেশি। ফলে, সেখানে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের হারও কম। এর কারণ, এইরূপ সন্তোষ মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের খুশি করলেও সাধারণ শ্রমিকরা উহাতে বিশেষ কোনও গুরুত্ব আরোপ করে না। তারা মনে-প্রাণে কোনও দিন মধ্যবিত্ত মানুষদের তাদের প্রতিভূ মনে করে নি। অথচ এক প্রকার বাধ্য হয়ে তারা মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এরা ঐ কারণে স্ট্রাইক করলেও উহাতে ইনটারেস্ট্ না নিয়ে ঐ সময়ে নিজ নিজ মুলুকে চলে যাওয়ার পক্ষপাতী।

অধুনা উদ্যোগ-শিল্পে শ্রমিককুল—অফিস কর্মী, করনিক, দোকানী,

মজদুর এবং স্কুল-শিক্ষক প্রভৃতি অপেক্ষা যথেষ্ট বেশি সুখ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। এঁদের অনেকেই একমাস বা দুই মাসের সমপরিমাণ বাড়তি বেতন বাৎসরিক বোনাস রূপে প্রতি বৎসর পেয়ে থাকেন। এতদ্বারা বাৎসরিক পোশাক-পরিচ্ছদ কিনেও এঁরা পল্লী-অঞ্চলে দুই-এক কাঠা জমি ক্রয় করতেও সক্ষম। এঁদের অনেকেই একটি করে সাইকেল ও রেডিও যন্ত্রের অধিকারী। অবশ্য সাইকেল হতে স্কুটার কামনা একটি বিরাট উল্লম্ফন। এইখানেই এঁদের আশা আকাঙ্ক্ষাতে বিরাট ধাক্কা খেতে হয়। তবু কয়েক শ্রেণীর শ্রমিক আজকাল এ দেশেতে গাড়ি ও বাড়ির অধিকারী। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষদের সাথে তাঁদের অর্থ-নৈতিক প্রভেদ প্রকটতর। একই সমাজে বাস করে সকলে সমান সুবিধা-ভোগী না হলে শেষ-বেশ [ঈর্ষা জনিত] বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এ'জন্য সমাজের অন্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের সুখ-সুবিধার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা উচিত। অবশ্য এমন বহু শ্রমিককে ভোর রাত্রে বাটী হতে বার হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে হয়। কিংবা রাত ভর ডিউটি করে সে বেলাতে বাড়ি ফিরতে পেরেছে। স্বাস্থ্য নাশ ও রক্ত জল করা পরিশ্রমের বিনিময়ে তাদের অধিক অর্থ নিশ্চয়ই প্রাপ্য। এদের ইচ্ছা-মত আমোদ-প্রমোদ ও সময়ে আহার পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে হয়। এই দিক হতে বিচার করলে অবশ্য এদের এই বাড়তি অর্থ এদের ন্যায্য প্রাপ্য মনে হতে পারে। অবশ্য এইরূপ বিতর্ক মূলক বিতণ্ডা শ্রমিক-বিজ্ঞানের বিচার্য নয়। এক্ষণে আমি মাত্র শ্রমিকদের ন্যায্য সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি পন্থাতে শ্রমিকদের সন্তোষ বিধান করা উচিত হবে।

(১) শৌচাগার :—শ্রমিকদের সুবিধার জন্য প্রতিটি ফ্যাকটরিতে শৌচাগার প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে এই-গুলি—ফ্যাকটরির কমপাউণ্ডে এক দূর স্থানে স্থাপিত হয়েছে। একজন উৎসাহী ফুরনের কর্মীর পক্ষে অতদূরে প্রকৃতির তাড়নাতে যাতায়াত করতে হলে নিশ্চয়ই তার আর্থিক ক্ষতি হবে। এইরূপে সময়ের অপচয় না হলে সে আরও দ্রব্য তৈরি করে অধিক উপার্জন করতে পারতো। এই ক্ষতি এড়ানোর জন্য সেখানে দ্রুত যাতায়াতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এইজন্য কর্মকেন্দ্রের সন্নিকটে এইগুলি তৈরি হওয়া উচিত হবে। উদ্যোগ-শিল্পের নিরাপত্তার জন্য ও চুরি প্রভৃতি বন্ধের কারণেও এদের বারে বারে এই অজুহাতে দূর স্থানে যেতে দেওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। [বলা বাহুল্য, পুরুষ ও নারী কর্মীদের শৌচাগার পৃথক হওয়া উচিত।]

(২) বাসস্থান :—শ্রমিকদের সুবিধার্থে তাদের স্বাস্থ্য-সম্মত বাসস্থান [কুলি লাইন] ফ্যাকটরির সন্নিকটে থাকা ভালো। এতে যাতায়াতে তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে না। সম্ভব হলে তাদের পরিবারবর্গের সাথে বাসের উপযোগী পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র কুটির নির্মাণে ফল আরও উত্তম। এতে পারিবারিক দায়িত্বের সাথে কর্মগত দায়িত্বের বর্ধন ঘটে। তাদের পারিবারিক জীবন তাদেরকে উদ্যোগীয় অপরাধ [ইনডাস্ট্রিয়াল ক্রাইম] হতে রক্ষা করে। এই কুলি বস্তি উপযুক্ত পথঘাট, জলকল ও শৌচাগার সম্বলিত ও আলোক-বাতাস যুক্ত হওয়া উচিত। এই কুলি বস্তি ও ফ্যাক-টরির মধ্যে একটি উদ্যান থাকলে তাহা শিশুদের ক্রীড়াস্থান রূপে ব্যবহার করা চলে। এইগুলি এন্‌ভায়রনমেণ্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিবেচ্য বিষয়।

[শ্রমিকদের মধ্যে নাগরিকতা-বোধের উন্মেষের জন্য কুলি লাইনে শ্রমিকদের নিজস্ব স্যানিটারি ও বিল্ডিং কমিটি গড়ে দিলে ফল উত্তম হয়।

শ্রমিকরা প্রায়ই কর্মত্যাগের পরও কুলি লাইনে থেকে যায়। এদের জবরদস্তিতে বিতাড়ন কালে অশান্তির সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের এই কমিটিদ্বয় এই কাজের ভার নিতে পারে।]

(৩) চিকিৎসা :—ফ্যাকটরিতে আজকাল সুদক্ষ চিকিৎসকের অধীনে একটি ডিসপেনসারি [কোনও স্থানে হাসপাতাল] থাকে। ডাক্তারদের সার্টিফিকেট অনুযায়ী শ্রমিকদের ভর্তি ইত্যাদি ও ছুটি প্রভৃতি [সিক্ লিভ্] মঞ্জুর করা হয়। প্রায় দেখা গিয়েছে যে, এঁরা সামান্য কারণে তাদের [রোগের অজুহাতে] ছুটি মঞ্জুর করে ফ্যাকটরির ক্ষতি করেছেন। ডাক্তারদের পক্ষে শ্রমিকদের প্রতি এইরূপ সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত নয়। অনেকে আবার সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও ম্যানেজমেণ্টের গোপন নির্দেশে তাদের অন্যায় ভাবে সিক্-লিভ গ্রাণ্ট করে নি। এই বিষয়ে উভয় পক্ষের অতি-সহযোগিতা এবং অসহযোগিতা সমভাবে উদ্যোগ-শিল্পের ক্ষতিকর হয়। এই বিষয়ে ডাক্তারদের কঠোরভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা উচিত। এঁদের ভুলে বহু বয়ঃসীমা অতিক্রমকারী শ্রমিক কর্মে বহাল হয়ে দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষতি করে থাকে। শ্রমিকদের এবং তাদের পরিবারবর্গের রোগের পর চিকিৎসা ডাক্তাররা করে থাকেন। কিন্তু সাধারণ চিকিৎসার অতিরিক্ত অপর এক কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের অনেকে অবহেলা করেন। এই বিশেষ কর্তব্য কর্মটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

এক-এক প্রকার ফ্যাকটরিতে কাজ করার জন্যে শ্রমিকরা এক-এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। এই সকল বিষয় অবহিত হয়ে সেই সেই রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা পূর্বাহ্ণে তাদের করা উচিত হবে। এমন কি ঐ সকল সম্ভাব্য রোগ হতে আত্মরক্ষার্থে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অগ্নি-উদ্দীপক ও রসায়ন-চূর

কারখানাতে কর্মীদের কর্মক্ষেত্র হতে বেরিয়ে চোখে ও মুখে জল দিতে হবে। অনুরূপ ভাবে সীসা কারখানাব শ্রমিকদের কর্মান্তে হস্ত-পদে প্রতিষেধক ঔষধ লেপন করা উচিত। অন্য বহু ফ্যাকটরিতে লাইজল দ্বারা দেহকে বীজাণু মুক্ত করা যেতে পারে। তুলা ও পাটের ক্ষতিকর সোঁয়া প্রতিদিন শ্রমিকদের ফুসফুসে প্রবেশ করে কতোটুকু তাদের দেহের ক্ষতি করে, হাইড্রেনে কর্মরত নগর-সঙ্ঘের কর্মীরা কোন্ বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়, এই সকল বিষয়ে স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করে ডাক্তারদের পক্ষে এই সকল শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যে প্রাত্যহিক প্রতিষেধক ব্যবস্থা গবেষণা দ্বারা জেনে ও বুঝে তা যথাযথ ভাবে শ্রমিক-স্বার্থে প্রয়োগ করা উচিত হবে।

কয়েকটি কারণে কয়েক শ্রেণীর [ট্রাইবাল ও অর্ধসভ্য] শ্রমিকদের দেহে কষ্টবোধ কম থাকে। এই কষ্টবোধের অভাবে তারা তাদের রোগ সম্বন্ধে সচেতন নয়। এদের যে কোনও এক কঠিন রোগ হয়েছে তা তারা তাদের [অভ্যাস জনিত] কষ্টবোধের অভাবে জানতে পারে না। ফলে, কর্মরত অবস্থাতে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে তারা দৈব দুর্ঘটনা ঘটায় কিংবা হঠাৎ মৃত্যু-বরণ করে। পোস্টমর্টেম্ [মরণোত্তর] পরীক্ষার পর জানা যায় যে বহু কাল পূর্ব হতে তারা কঠিন রোগে ভুগেছে। এইজন্য এই শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত।

পুষ্টিকর খাদ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে সাধারণশ্রমিকদের কোনওধারণা নেই। এদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ক্যান্টিনে তৈরি করে এক বেলা সেখানে তাদের খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা উচিত। কারণ, নিজ গৃহে পুষ্টিকর খাদ্য কোনও দিনই এরা গ্রহণ করবে না। পুরুষানুক্রমে ভেজাল খাদ্য শ্রমিক-

দিগকে [দৈহিক ও মানসিক] শ্রমের অযোগ্য করে তুলে। একমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সান্ত্বনার বিষয় এই যে, অন্ততঃ এক শ্রেণীর শ্রমিক সস্তায় হলে ছোলা, ছাতু প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে। এদের জীবন-ধারণের মান রক্ষার্থে অধিক অর্থ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সেই সাথে দুঃখের বিষয় এই যে, এদের অনেকে এই ভাবে অর্থ বাঁচিয়ে [উদ্বৃত্ত অর্থ] উহা মদ্যপানে ব্যয় করে। এদের মধ্যে জাতি-স্বধার সমিতি স্থাপন করে এই দোষ হতে এদের মুক্ত করা যেতে পারে। এদের কুখাদ্য ও অখাদ্য গ্রহণ হতে সমভাবে রক্ষা করা দরকার।

[সাধারণতঃ তেলেতে এবং ময়দাতে ভেজাল দেওয়ার সুযোগ বেশি। ফ্যাকটরিতে এই দুইটি দ্রব্য বিনা মজুরীতে শ্রমিকদের জন্য তৈরি করা যায। সকল প্রকার ফ্যাকটরিতে হুইল স্যাফট্ দিবারাত্র ঘুরে। এর সঙ্গে কয়টা আটা কল ও কয়টা ঘানি জুড়ে দিলে প্রায় বিনা খরচে এই কার্য সমাধা হতে পারে।]

শ্রমিকদের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার প্রচার ও প্রসার ফ্যাকটরির ডাক্তারদের অধুনা একটি কর্তব্য কর্ম। কিন্তু এই কাজে তাদের পক্ষে সমাজ-বিজ্ঞানীদের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। এই পরিবার-পরিকল্পনা মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন রূপ প্রতিক্রিয়া আনে। সাধারণ শ্রমিকদের [মজদুর] ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান বয়স্ক হওয়া মাত্র পারিবারিক আয়ের বৃদ্ধি ঘটে। এদের সমাজে বিবাহার্থে কন্যা ক্রয় করার রীতি আছে। এই ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যার জন্ম এদের নিকট অর্থাগম মূলক [অ্যাসেট্] বলে বিবেচিত হয়। সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষার প্রসার ব্যতি-রেকে এদেরকে এই উপদেশ দান প্রহসন মাত্র। অন্যদের মতে ইহা ভারতীয় কৃষ্টির পরিপন্থী হওয়ায় পরিত্যাজ্য। এদের মতে সন্তান-নিরোধ শিক্ষা

দিলে এই সম্পর্কিত ভয়ের অভাবে সমাজে দুর্নীতির প্রসার হবে। বহু ব্যক্তির ধারণা হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা বর্তমান থাকায় এবং বিধবা-বিবাহের প্রচলন না থাকাতে [তাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ তিরোহিত না হওয়ায়] তাদের মধ্যে জন্মের হার স্বাভাবিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত। বরং এ দেশীয় অন্য সমাজের মধ্যে এর প্রচলন করা যেতে পারে। পরন্তু সংখ্যালঘু হলে আবার দেশ-বিভাগের আশঙ্কা আছে। এই সকল ভুল ধারণা যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রথমে এদের মন হতে অপসারণ করা দরকার। তা' না হলে শ্রমিক-সমাজে পরিবার-পরিকল্পনার বহুল প্রসার সম্প্রতি কালের মধ্যে সম্ভবপর নয়।

[সুখের বিষয় অধুনা বহু ফ্যাকটরিতে শিশু ডরমেটারি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে সন্তানবতী স্ত্রী-কর্মীরা কর্মকালে শিক্ষিত ধাই-এর রক্ষণাবেক্ষণে তাদের স্ব স্ব শিশুদের রাখতে পারে। এখানে তাদের ভুলাবার জন্য বহু খেলনাও মজুত রাখা হয়। এমন কি, সেখানে তাদের দুগ্ধ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়। কয়েক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ স্থাপিত হাসপাতালে শ্রমিকদের পত্নীদের প্রসব ব্যবস্থা এবং তৎসহ তাদের আত্মীয়দের নিঃখরচাতে চিকিৎসা করা হয়েছে।]

(৪) শিক্ষাদান :—শ্রমিকদের পুত্র-কন্যাদের বিনা বেতনে শিক্ষার জন্য ফ্যাকটরির অধীনে বিদ্যালয় আছে। মধ্যবিত্ত শ্রমিকগণ আত্মাভিমানের আতিশয্যে এই সকল বিদ্যালয় পরিহার করে তাদের পুত্র-কন্যাদের সবেতনে সাধারণ স্কুলে বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠায়। অন্যদিকে সাধারণ শ্রমিকরা ভিন্ন কারণে তাদের পুত্র-কন্যাকে আদপে লেখাপড়া শিখাতে চায় না। সম্প্রতি কালে এদের অনেকের ধারণা লেখাপড়া শিখলে তাদের সন্তানরা আয় করতে না পেরে কষ্ট পাবে। এর ফলে ফ্যাকটরির নিজস্ব স্কুলগুলিতে আশানুরূপ ছাত্র সংখ্যা দেখা যায় না।

বরং বাহিরের দরিদ্র সন্তানরা বহুল সংখ্যাতে সেখানে ভর্তি হয়ে থাকে। একমাত্র প্রচার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

[একদা কোনও এক শ্রমিক আমার নিকট এইরূপ একটি উক্তি করে, 'আমি নিজে, মোর বউ, দুই ছেলে, পুত্রবধূ, এক বোন ও এক মেয়ে—প্রত্যেকে ন্যূনাধিক আশি টাকা উপায় করি। আমাদের পারিবারিক আয় সর্ব শুদ্ধ ছয় শতের উপর। এ বিষয়ে নেকাপড়া-শেখা বাবুদের দুঃখ দেখে মোদের বুক ফাটে। এরা নেকাপড়া শিখলে ওদের মত কষ্ট পাবে।' এর এই উক্তির মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞানীদের বিবেচনার্থে উল্লেখযোগ্য সত্য নিহিত আছে। প্রকৃত পক্ষে এই ক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের জন প্রতি আয় হয় তো একশ' টাকা। কিন্তু তাদের পরিবারে দশ বারো ব্যক্তি তার এই স্বল্প আয়ের উপর নির্ভরশীল। উপরন্তু এদের জীবন ধারণের মান সাধারণ শ্রমিকদের অপেক্ষা বহু গুণে অধিক হয়ে থাকে। এই অবস্থাতে স্বাভাবিক কারণে মধ্যবিত্ত শ্রমিকরা আপন অবস্থাতে খুশি থাকতে পারে না। এ অবস্থাতে তারা নিজেরা বিপথে পরিচালিত হয়ে সেই সাথে সাধারণ শ্রমিকদেরও বিপথে চালাতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এতো সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত শ্রমিকের গৃহিণীরা সাধারণ শ্রমিক কন্যাদের মত বাহিরে চাকুরি গ্রহণে অপারক। এক্ষেত্রে বড়ো ইনড্রাস্ট্রির সাবসিডিয়ারি বা পুরিপূরক বা হোম ইণ্ডাসট্রি বাড়িতে বাড়িতে স্থাপন করে এই অব্যবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। মধ্যবিত্ত সমাজের কতিপয় চাকুরিয়া গৃহিণীর বিষয় এখানে ধর্তব্য নহে। অধিক ক্ষেত্রে এদের নারীরা অনাহারে থাকলেও সম্মানহানির ভয়ে বাহিরে তাহা প্রকাশ করে না। ঘর-সংসার পরিত্যাগ করে বাহিরে চাকুরি করা

আজও এদের কাছে লজ্জাস্কর ব্যাপার হয়। এই স্থলে এদের উপকারার্থে বাড়িতে তিনটি ঘর থাকলে একটি ঘর গৃহ-শিল্পের উদ্দেশ্যে পৃথক করে রাখতে হবে কিংবা পল্লীর মধ্যে মধ্যবর্তী স্থলে এইরূপ একটি কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এখানে উন্নত ধরনের ছোট ছোট যন্ত্রের আমদানীর প্রয়োজন আছে। স্থানীয় জন-কল্যাণ সংস্থা সমূহের মাধ্যমে উদ্যোগ-শিল্পের কর্মকর্তারা এদেরকে কাঁচা মাল পাঠাতে এবং সেখান হতে উদ্যোগ-শিল্পের পুরিপূরক ফিনিস্‌ড্ গুড্ সংগ্রহ করতে পারেন।

(৫) প্রমোদ-ব্যবস্থা: ফ্যাকটরিতে শ্রমিকদের মনোরঞ্জনার্থে বহু প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ফ্যাকটরিতে বাঁধা স্টেজ্ ও সিনেমা-ঘর, খেলার মাঠ ও ক্লাব-বাড়ি প্রভৃতি দেখা যায়। কিন্তু এইগুলি সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সমাজের লোকেদের অধিক আগ্রহশীল করে। কিন্তু এখানেও দেখা যায় যে, বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী কেহ ড্রামা ও গান, কেহ স্পোর্টস আদি ও কেহ লাইব্রেরি প্রভৃতির ভক্ত। কেহ ইনডোর ও কেহ বা আউট-ডোর গেমস্ ভালবাসে। কেউ বা পার্টি, প্রমোদভ্রমণ ও কেউ বা পিকনিক প্রভৃতির পক্ষপাতী। এখানে প্রত্যেক দলের পছন্দাপছন্দ মত ব্যবস্থা না থাকাতে তারা এই বাবদে কপর্দক চাঁদা আদায়ও জুলুমবাজি মনে করে। অন্যদিকে এই মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে সাধারণ শ্রমিকদের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ অবহিত হন না। প্রায়ই কৃষককুল ও আদিবাসী-দিগের মধ্য হতে এরা সংগৃহীত হয়। এদের নিজস্ব নৃত্য, ঢাক-ঢোল, মাদল, লাঠি খেলা, যাত্রাগান, কুস্তী ও তর্জাগান ও পল্লীগীতি এদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। অথচ এদের জন্য মুক্ত প্রাঙ্গণে ও উদ্যান-সমূহে এদের ঐ সকল আমোদ-প্রমোদের সুযোগ দেওয়া হয় না। নিজেদের

বস্তিতে নিজেদের মধ্যে এইরূপ আমোদ-প্রমোদের তারা ব্যবস্থা করে থাকে। [এ কারণে সরকারী কোঠা বাড়ি মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের আকৃষ্ট করলেও সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষে উহা বিষবৎ পবিত্যজ্য।] বাঁধা স্টেজের অভিনয়ের চাকচিক্য তাদেরকে মোহিত করলেও উহা তাদেরকে প্রয়োজনীয় আনন্দ দিতে পারে না। এ বিষয়টিতে কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ভাবে অবহিত হতে হবে।

[শ্রমিকরা পরিবারবর্গ সমেত আমোদ-প্রমোদ ভোগ করার পক্ষপাতী। এ জন্য সর্ব ক্ষেত্রে এই সব জলসাতে তাদের পরিবার-বর্গকে নিমন্ত্রণ করা শ্রেয়ের কাজ। এরা প্রায়ই স্ত্রী-পুত্রকে বাদ দিয়ে ঐ সব আমোদ-প্রমোদে যোগ দেয় না। সেই ক্ষেত্রে এই বাবদে চাঁদা প্রদান তারা অর্থের অপচয় মনে করে।]

বহু সমাজসেবী অধুনা কুলি-লাইন সমূহে শ্রমিকদের মধ্যে সমাজ-সংস্কার করার জন্যে ফ্যাকটরি কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, এইরূপ অনুমতি তাঁদের দেওয়া উচিত হবে কি'না। আমার মতে শ্রমিক-সন্তোষের সাথে শ্রমিক-কল্যাণ মিশ্রিত করা উচিত হবে না। বহু ক্ষেত্রে অহেতুক সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে। এ কথা ঠিক যে শ্রমিকদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা জ্ঞান বিদূরিত করার চেষ্টা করা উচিত। [প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকদের মধ্যে এই প্রথা বিরল হয়ে এসেছে।] কিন্তু এখুনি এদের জাতিভেদ প্রথা বিলোপের প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। সমাজ-সংস্কারকগণ এদেব পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে মনোযোগ না দিয়ে এদের ঐ দুইটি মূল বিষয়ে আঘাত দিয়ে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে থাকেন। এ সকল বিষয়ে সময় প্রবাহের সাথে. এবং অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এদের ধ্যান-ধারণা, মানসিক

গঠন এবং প্রয়োজনের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করা ভালো।

[এই জাতিভেদ প্রথা এদেশে পরধর্ম ও পরমত সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করেছে। মুস্লিম আক্রমণের প্রাক্কালে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও কাশ্মীর জাতি-বর্ণহীন বৌদ্ধ প্রধান ছিল। তাই এতো সহজে তাদের ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হয়। অবশিষ্ট ভারতে হিন্দুদের এই জাতিভেদ পরধর্ম গ্রহণের প্রতিবন্ধক হয়। যারা জাতকে এতো আঁকড়ে ধরে থাকে তারা অন্য ধর্ম নেবে কেন? বর্তমান যুগে ইহা নিষ্প্রয়োজন ও অচল। কিন্তু এক কালে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে ইহার প্রয়োজন ছিল। এদের এই আচরণের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবার জন্য সময় দিতে হবে তাহলে কাস্টলেশ সমাজ ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে।

এ কথা ঠিক যে অদূর ভবিষ্যতে জাতিভেদ প্রথা তো উঠে যাবেই, উপরন্তু সম্প্রদায়গত কোনও ধর্ম-বিশ্বাসেরও অস্তিত্ব থাকবে না। জাতি-ধর্ম-বিবর্জিত ভারতীয়েরা একটি মাত্র জাতীয় সংস্কৃতির অধিকারী হবে। তখন তাদের নামগুলি পর্যন্ত একই রূপের হয়ে যাবে। এদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরে এলে ইহা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা এদের সাম্প্রদায়িক মনোজট বিদূরিত হওয়া মাত্র তারা প্রত্যেকে তাদের দেহস্থিত রক্তের ডাক শুনতে পাবে। কিন্তু এই মনোভাব অর্জন একমাত্র সময়-প্রবাহ এনে দিতে পারে।]

ভুলে গেলে চলবে না যে বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে যত জাত আছে, তপশীলদের মধ্যে তদপেক্ষা বেশি জাত আছে। তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাহাদি ও খাওয়া-দাওয়া আজও চলে না। কয়েকটি প্রদেশে এই জাতি জ্ঞান সাম্প্রদায়িক জ্ঞান অপেক্ষা আরও কঠোর। এখানে কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দিলে এরা মনে করে যে মালিক প্রেরিত চর তাদের

মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। এইরূপ অবস্থাতে উদ্যোগ-শিল্পে অকারণে অশান্তি আসে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, একদা পেশা অনুযায়ী সৃষ্ট হলেও এই জাতিভেদ অধুনা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নয়। এদেশের সর্ব জাতির মধ্যে ধনী ও দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবার আছে। কয়েকটি প্রদেশ বাদ দিলে ভারতের সর্বত্রই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ছত্রী প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চ বর্ণের পার্শ্বে নানা জাতির তথাকথিত অচ্ছ্যুৎ-গণ [হরিজন] পাশাপাশি ক্ষেতে ভূমি কর্ষণ করে ফসল উৎপাদন করে। এইজন্য এই তথাকথিত উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে কোনও অর্থনৈতিক ঈর্ষাব কারণ ঘটে না। এখনও এদের এক ভাই হাকিম হলেও অপর ভাই ভঁইসা চরাতে লজ্জিত নয়। আপন গ্রামে ছুটিতে হাকিম ভ্রাতা তার চাষী ভ্রাতার সাথে সানন্দে মিলিত হয়। এই জন্য এদের সাহিত্যে ও কাহনাতে রাজপুত্রের পথ হারিয়ে কৃষকগৃহে আতিথ্য গ্রহণান্তে তার কন্যার পাণিগ্রহণের কাহিনীর উল্লেখ সম্ভবপর।

দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের স্বল্প কয়েক প্রদেশে উচ্চবর্ণের মধ্যে [সম্প্রদায়গত ভাবে] উপরোক্ত প্রথা প্রায় লুপ্ত হয়েছে। তারা আজ নিজেরা লাঙ্গল বা কোদালী ধরতে অপারক। সেখানে কয়েক শ্রেণীর উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত লোক দেহ-শ্রম বিমুখ হয়ে পরগাছা জীবনে অভ্যস্ত হয়। তাদের আশা তাদের চাষী প্রজারা চাষ করে তাদের অন্ন সংস্থান করবে। এজন্য ঐ সব দুর্ভাগা প্রদেশের সাহিত্যে পথহারা উচ্চ বর্ণের নায়ককে তার বাঞ্ছিত নায়িকার সাথে মিলাতে কৃষক সর্দারকে তাকে ঐ গ্রামেরই এক উচ্চ বর্ণেব পরিবার-গৃহে [পাছে তার কষ্ট হয়—এই অজুহাতে] তুলে দিয়ে আসতে হয়।

বিঃ দ্রঃ—ভারতীয় সমাজের সাথে একটি বহুরঙি শক্ত বুনোন সতরঞ্চির তুলনা করা চলে। ভাষার সাথে এর টানা বুনোন এবং ধর্মের সাথে

এর লম্বা বুনোন তুলনীয়। এদের বিভিন্ন মতামতের সাথে উপরের বহু রঙের তুলনা করা হয়। এতো ভেদাভেদ সত্বেও উহা এক নিরবচ্ছিন্ন সতরঞ্চির রূপ ধারণ করেছে। এই জন্য এই অপূর্ব সমাবেশে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে এখুনি আঘাত হানা উচিত নয়। আপনা হতেই বহুল ধোলাই দ্বারা এদের এই নানা রঙ উঠে যাবে। এদের টানা ও লম্বা বোনেন এক হয়ে যাবে। সেই দিন পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

[উপরোক্ত মূল বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে শ্রমিকদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় জাতি-সুধার সমিতি ও সালিশী সমিতি তৈরি করে দেওয়া উচিত। জাতি-সুধার সমিতিগুলি [সুধার অর্থে বিলোপ নয়] এদের মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া, কর্জগ্রহণ ও অন্যান্য দোষ হতে মুক্ত করতে সক্ষম। এদের সালিশী [পঞ্চায়েত] ব্যবস্থা দ্বারা এদের বিবাদ-বিসংবাদ সহজে মিটতে পারে। বিনা সুদে এদের কর্জ দিলে ফল আরও ভালো।]

উপরোক্ত রূপ প্রচলিত ভারতীয় সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা সাবধানে পরিলক্ষ্য করে কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে সন্তোষ বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। এদের সহিত আচার-ব্যবহারে, এদের খাদ্যাখাদ্য নিরূপণে এবং এদের জন্য বাসস্থান নির্মাণে তাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং ধর্ম বিশ্বাসকে অবহেলা করলে চলবে না। এদের যা কিছু সুখ-শান্তির ব্যবস্থা সমাজ-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে করা চাই। এখানে সমাজ-বিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌দের সুপরামর্শের প্রয়োজন আছে। এই সম্বন্ধে প্রাক্তন ব্রিটিশ-শাসকদের অবলম্বিত কলাকৌশলের ভালো দিকটুকু হতে আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত।

[এরা ছাগল,মুর্গী,ভেড়ার সহিত প্রাঙ্গণ-যুক্ত কুটীরে বাস করতে চায়।

মুক্ত মৃত্তিকার প্রাঙ্গণে বসে গাছ-গাছড়া পুততে ও একত্রে হৈ-হুল্লোড় করতে তারা ভালবাসে। ভূক্তাবশিষ্ট খাদ্যের ছিবড়া-ছোবড়া যা খরচ করে মধ্যবিত্তরা বাড়ির বাইরে ফেলে তাই তারা তাদের হাঁস-মুরগীকে খাইয়ে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করে। এই ধরনের শ্রমিকদের সরকারী ত্রিতল বাটীর উপরে দুটি কক্ষে গুদামজাত করলে তারা উহাকে কারাবাস মনে করে। এইজন্য তারা সরকার নির্মিত ত্রিতল কোঠা বাড়িতে বাস করতে অস্বীকার করে থাকে। সেই তুলনাতে তারা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণযুক্ত বস্তিবাড়ি অধিক পছন্দ করে।]

শ্রমিকদের প্রতি তদারকী কর্মী এবং তদারকী কর্মীদের প্রতি ম্যানেজারদের সদা সদ্‌ব্যবহার উহাদের সন্তোষ সাধন করে। অযথা এদের প্রতি অপমান সূচক বাক্য ও গালিগালাজ ব্যবহার করা উচিত নয়। অধুনা সকল শ্রেণীর মানুষের আত্মসম্মান জ্ঞান বহু গুণে বর্ধিত হয়েছে। অর্থ উপায় অপেক্ষা আত্মসম্মান রক্ষা এদের কাছে অধিক প্রিয়। অন্য দিকে শ্রমিকদেরও বুঝা উচিত যে প্রতিটি ক্ষণে প্রতিটি ব্যক্তির [সাংসারিক বা অন্য কোনও কারণে] মন-মেজাজ ভালো না থাকাতে তারা মন-রোগীতে পরিণত হয়। (*) এই সময় প্রতিরোধ শক্তির অভাব ঘটলে তারা এমন কাজ করে ও এমন কথা

(*) তদারকী কর্মী, ম্যানেজার ও বিভাগীয় কর্তাদের এইরূপ দুর্বল-চেতা হওয়া উচিত নয়। এঁদের মধ্যে সহনশীলতা এবং মনোভাব গোপনের অভ্যাস থাকা উচিত। এদের এইরূপ দুর্বলতা শ্রমিক-সন্তোষ বিনাশ করে শ্রমিক-বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। একবার বা দুইবার এইরূপ ভূল হলে তাহা কথঞ্চিৎ সহনীয় হয়। কিন্তু বহুবার এইরূপ দুর্বলতা প্রকাশ উদ্যোগ-শিল্পের ক্ষতিকর হয়।

বলে যা তারা সহজ অবস্থাতে চিন্তা পর্যন্ত করতো না। এ'জন্য ঊর্ধ্বতনদের মেজাজ বুঝে বক্তব্য বা কাজ [কাগজ-পত্র] তাদের সমীপে পেশ করা উচিত। একজনের কটু কথা নির্দিষ্ট কর্মকালের মধ্যে না শুনতে পেরে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে অনেকে দেখেছেন যে, ঐ একজনের বদলে নানা অভাবের কারণে বহু জনের কটু উক্তি তাঁদের [সারাদিন ও মুহুর্মুহু] শুনতে হয়েছে। এই সকল মনস্তাত্ত্বিক বিষয় সম্বন্ধে মালিক-শ্রমিক উভয়পক্ষেরই সচেতন হওয়া উচিত।

১৪

শ্রমিক-স্বভাব

এদেশের শ্রমশিল্পগুলি শহরাঞ্চলে গড়ে উঠে। নগরবাসীরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত ছিল। এই জন্য নাগরিকদের মধ্য হতে শ্রমিক সংগ্রহ সম্ভব হয় নি। বড়ো বড়ো কারখানার জন্য বহু শ্রমিকের প্রয়োজন। এতোগুলি কর্মঠ ব্যক্তি স্থানীয় লোকের দ্বারা পুরণ করা অসম্ভব। এই নগর-ভিত্তিক শ্রম-শিল্পের জন্য চতুর্দিকের গ্রামের চাষীকুল হতে শ্রমিক আনার প্রয়োজন হয়। আমেদাবাদ, কানপুর প্রভৃতি শহরের শ্রমশিল্পে উহার চতুর্দিকের গ্রাম হতে মজদুর আমদানী করা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই ও জামসেদপুর শহরের বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য ভিন্ন প্রদেশ হতে শ্রমিক আমদানী করার প্রয়োজন হয়। দুইটি প্রধান কারণে কৃষককুল দলে দলে শ্রমিক রূপে নগরীর দিকে ধাওয়া করেছে। যুরোপীয় দেশগুলির ন্যায় কৃষকরা উন্নত জীবন যাপন ও সুখভোগের জন্য শহরে আসে না। প্রথমে গ্রাম হতে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য 'কমিশন বেসিসে শ্রমিক কনট্রাকটার নিয়োগ করা হতো। আড়কাঠিরা অর্থের লোভ দেখিয়ে শ্রমিকদের শহরে এনেছে। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কালে এই সকল ঠিকাদারদের সুবর্ণ সুযোগ মিলতো। চা-বাগান প্রভৃতির কাজের জন্য বহু গ্রামীণ বালককে চুরি করে বা ভুলিয়ে আনা হয়েছে।

অন্য দিকে গ্রামে জমির উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় ভূমিহীন শ্রমিকরা দলে দলে কর্ম সংস্থানের জন্য শহরে এসেছে। তথাকথিত গ্রামীণ অস্পৃশ্যতাবোধ শহরে না থাকাতে অচ্ছ্যুৎ সমাজের চাষীরা যে শহরে এসেছে তা নয়। এই অচ্ছ্যুৎ সমাজের মানুষ পৃথক পল্লীবাসী হওয়াতে এদের সেখানে কোনও অসুবিধা হয় নি। এ'ছাড়া অধুনা কালে গ্রামেও শহরের মত অস্পৃশ্যতাবোধ অতীতের কাহিনীতে পর্যবসিত।

[ভারতের গ্রামগুলিতে তথাকথিত উচ্চ ও নিম্ন বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ একত্রে বসবাস করতে অভ্যস্ত। কয় ঘর ব্রাহ্মণ, কয় ঘর কায়স্থ, কয় ঘর সদ্গোপ, কয় ঘর যাদব, কামার কুমার রজক চাষী নমোঃ প্রভৃতি মানুষ একত্রে বাস করে গ্রামটিকে একটি স্বাবলম্বী ইউনিট তথা স্বয়ং-নির্ভর ক্ষুদে রাষ্ট্রে পরিণত করে। পুরুষানুক্রমে এইভাবে বাস করে তাদের ব্রেনের সেট্ আপ্ এইরূপ হয়ে যায়। একক ভাবে বসবাস বরং তারা পছন্দ করে না। অন্যরূপ ভাবে কলোনি তৈরি করলে উহা বিপর্যয় আনে। আমি একদা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে উদ্বাস্তু কলোনিগুলি পরিদর্শন করি। ঐ সময় চাষী সমাজের উদ্বাস্তুরা আমাকে অনুযোগ করে বলে ছিল,—'বাবু! আপনারা কেউ কেউ আমাদের সাথে এলেন না কেন? বাবুদের না নিয়ে কি আমরা কখনও কোথায়ও থেকেছি? কে আমাদের হয়ে দরখাস্ত করে দেবে? কে আমাদের কাজে-কর্মে সুপরামর্শ দেবে?' এদের এই সকল ক্ষেদোক্তি হতে প্রমাণিত হয় যে উপরোক্ত মতবাদে যথার্থই কোনও সত্যতা নেই।]

গ্রামের জমিতে একাধিক ফসল উৎপন্ন করার রীতির অভাবে সারা বৎসর চাষ-আবাদ হয় না। ধান ও গম উঠার পর বৎসরের অবশিষ্ট কালে পূর্বে এরা কুটির-শিল্পে নিযুক্ত থাকতো। কিন্তু

ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ-শিল্প এই গ্রামীণ কুটীর-শিল্প সমূহকে ধ্বংস করেছে। এই জন্য দারিদ্র্য এদেরকে দলে দলে শহরে আসতে বাধ্য করে। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা শহরের পরিবেশ আজও পছন্দ করে না। তাই আজও পর্যন্ত তারা পুরাপুরি শ্রমিক হয়ে উঠতে পারে নি। তাই চাষ-আবাদ ও ফসল উঠার কালে তারা দলে দলে গ্রামে ফিরে যায়। গ্রাম হতে পরিবারবর্গকে এবা বাধ্য না হলে শহরে আনে না। এদেশের শ্রমিকদের এই স্বভাবের জন্য শিল্পপতিদের বহুক্ষেত্রে অসুবিধাতে পড়তে হয়েছে। অকুশলী শ্রমিকদের এই স্বভাব এঁরা পছন্দ করেন। এতে তাদেরকে স্থায়ীরূপে নিয়োগ কবার দায়-দায়িত্ব থাকে না। এরা ফিরে এলে পূর্বের মত স্বল্প [প্রাথমিক হারে] বেতনে এদের নিয়োগ করা যায়। এদেশে এতৎসহ শ্রমিক-সঙ্ঘ [যুনিয়ন] গুলিকেও জোরদার করা সম্ভব হয়নি। তাদেব ঐ সকল যুনিয়নের প্রতি এই ধরনের শ্রমিকদের কোনও মমতা থাকে না। এখন শ্রমিকদের এই স্বভাবের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

(১) এ দেশেব গ্রামের যৌথ পবিবারগুলির অস্তিত্ব আজও বজায় আছে। উহাদের সকল ব্যক্তি গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরে আসে না। গ্রামে খাদ্যেব অভাব নাই, কিন্তু অর্থের অভাব আছে। বহু দিন অতিথিদের তারা স্ব-গৃহে স্থান দিয়ে চাষে উৎপন্ন খাদ্য সরবরাহ করতে সক্ষম। কিন্তু প্রয়োজন হলে এরা জমিদার ও খাতকদের নগদ অর্থ প্রদানে অক্ষম। এ'জন্য পরিবারেব কয়েক ব্যক্তি শহর হতে গ্রামে নগদ টাকা পাঠালে তারা উপকৃত হয়। পারিবারের কোনও পুত্র চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে গ্রামে এলে পিতামাতা খুশিতে ভরপুর হয়। তাবা ভাবে যে, চাষ-বাস ও বিষয়-আশয় দেখা শুনাতে তাদের সাহায্য হবে। পুকুর ভরা মাছ ও ক্ষেতের ধানের মধ্যে তাদের যা

কিছু সাহস। অন্ততঃ কারো পুকুর হতে কলমি শাক ও পরের বেড়া হতে সজনে ডাঁটাও তারা সংগ্রহ করতে পারে।

(২) শহরে বাসস্থানের অভাবে এরা স্ত্রী-পুত্রদের এখানে আনে না। একই লাইন ঘরে সর্ব সমক্ষে এদের মৃত্যু ও জন্ম হয়ে থাকে। পল্লীর সুবিমল জলবায়ু ও বিস্তৃত আবাস হতে এরা এখানে বঞ্চিত। [এই সকল গ্রাম্য আবাস মাটির তৈরি হলেও উহার বিস্তৃতি ও সৌন্দর্য আছে।] শহরে পুরুষের সংখ্যা অত্যধিক এবং নারীর সংখ্যা অতীব স্বল্প। এখানের পল্লীর সংবেদনশীল সমাজ-ব্যবস্থা নেই। এখানে পঙ্কিল বস্তিতে মদ্যপায়ী, জুয়াড়ী, বেশ্যানারী ও অপরাধীদের সাথে একত্রে বসবাস করতে হয়। শহরের চতুর্দিকে এরা শুধু অজানা-অচেনা ব্যক্তিদের দেখে। পারিবারিক আওতার বাহিরে এসে এখানে নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে। তাদের চোখের সম্মুখে বহু শ্রমিক যক্ষ্মা রোগ ও যৌন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে স্ত্রী-পুত্র সমেত বসবাস করা এদের পক্ষে অবমাননাকর। [এখানে শ্রমিকদের সারা জীবন (সুদে আসলে) দেনাদার হয়ে থাকতে হয়। দেনার দায় এড়াতে এরা বাধ্য হয়ে চাকুরি ছেড়ে গ্রামে পালায়।]

(৩) এই শহরে এসে প্রথম তারা শহরের চাকচিক্য দেখে কিছু-কাল মুগ্ধ হয়ে থাকে বটে, কিন্তু পরক্ষণে তারা দেখে যে স্বোপার্জিত বেতন ব্যতীত তাদের অন্য কোনও সহায় নেই। গ্রামে খাদ্যের অভাব ঘটলেও কখনও তাদের উপবাস করতে হয় না। কেহ না কেহ তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। গ্রামেতে তাদের অনেকের কিছু-না-কিছু জমি আছে। এই জমি ব্যতীত তাদের যন্ত্রপাতিরও [Tools] তারা মালিক। তারা ইচ্ছামত কাজ করতে এবং ইচ্ছামত বিশ্রাম গ্রহণে অভ্যস্ত। এখানে এসে তারা দেখে যে তাদের নিজের

বলতে একটি মাত্র দ্রব্যও নেই। অপরের প্রদত্ত যন্ত্র দ্বারা অপরের হুকুমে সারাক্ষণ তাদের ক্রীতদাসের মত কর্ম করতে হয়। এদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রমিক য়ুনিয়ন [সংস্থা] প্রভৃতিতে যোগদান করে [মুড়লী দ্বারা] নিজেদের হৃত-গর্ব কিছুটা ফিরিয়ে আনে বটে, কিন্তু এদের অধিকাংশ ব্যক্তি পালিত জীবের মত কুলি লাইনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে কিংবা জঘন্য [বহু ব্যক্তির সাথে একত্রে] পঙ্কিল বস্তিতে মাসিক দু'টাকা ভাড়ার ঘরে বসবাস করে। এইরূপ অসহনীয় অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাবার জন্যে মধ্যে মধ্যে গ্রামে পালানো ভিন্ন এদের উপায়ান্তর নেই।

[কতিপয় উচ্চাঙ্গের শ্রমিক টাউনশিপ ব্যতিরেকে অন্য কোথাও মান-সম্ভ্রম ও পারিবারিক কৃষ্টি বজায় রেখে শ্রমিকদের পরিবার সহ বসবাসের স্থান আছে কিনা জানি না। ওখানে গ্রামের মত স্বাধীনতা না থাকলেও এরা তাদের জেলার লোকদের খুঁজে বার করে সমাজ তৈরি করে নিতে পারে। কলিকাতাতে গঙ্গা নদীর দুই কিনারাতে শ্রমিকদের পরিবার সহ বাসের জন্য নির্দিষ্ট কুলি লাইনগুলির সাথে বরং নরকের তুলনা করা চলে। এরা গ্রামীণ সমাজের সাথে সম্পর্ক তুলে দিলে এতদিনে মানব দানবে পরিণত হতো। তা সত্ত্বেও কেহ কেহ বেশ্যাসক্ত, জুয়াড়ী ও মদ্যপায়ীতে পরিণত হন। এর ফলে এরা দেনাদার হয়ে স্বগৃহে অর্থ পাঠাতে পর্যন্ত অক্ষম হয়।]

(৪) তাদের ভবিষ্যতের চিন্তাতেও পল্লীর সাথে সংযোগ রক্ষা করতে হয়েছে। শ্রমিকদের চাকুরিতে জবাব হলে, তারা বৃদ্ধ হয়ে কর্মে অক্ষম হলে কিংবা রুগ্ন হয়ে অকর্মণ্য হলে তাদের গ্রামের পরিবারবর্গ তাদের সাদরে আশ্রয় দিয়ে থাকে। ফ্যাকটরিতে স্ট্রাইক [ধর্মঘট] বা লক-আউট হলে এরা নির্বিবাদে দেশে ফিরে শহর হতে পত্রপ্রাপ্তির অপেক্ষাতে কাল

কাটায়। এদের এই সুবিধের জন্য ধর্মঘট ঘটানোতে নেতাদের অসুবিধা নেই। নারী শ্রমিকরা সন্তান-সম্ভবা হলে গ্রামেতে এসে সন্তান প্রসব করেছে। কতিায় শিল্প-নগরী ব্যতীত শ্রমিকদের নারীদেব প্রসবের ব্যবস্থা অন্য কোথায়ও আছে কিনা জানি না। কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের বহুস্থানে এর অভাবে বহু শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটে। বলা বাহুল্য, প্রসূতি-সদন সমূহে ভর্তি হবার মত অর্থ ও সামর্থ্য এদের নেই।

[এইজন্য এদের চাকুরির ভয় দেখিয়ে নিয়মতান্ত্রিক করে তুলা যায় নি। এরা জানে যে ফিরে এলে তারা পূর্ব চাকুরি পাবে না। এজন্য কর্মশালার প্রতি এদের কোনও মমতা থাকে না। এরা নিজেদের সকল সময় ঠিকা চাকুরে মনে করে। এই স্বভাবের জন্য মালিকরা এদের কারিগরী শিক্ষার্থে অর্থ নিয়োগ করতে চান নি। চিরকাল এদের দক্ষতাবিহীন বা আনস্কিল্ড শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত করে রাখার তাঁরা পক্ষপাতী।]

(৫) এই গ্রামীণ শ্রমিকদেব মধ্যে কেউ কেউ পরিবারবর্গকে পরবর্তী কালে শহরে এনেছে। কিন্তু তাতে খুব বেশি সুফল হয় নি। এই সব বধূরা গ্রামীণ শাসন মুক্ত হয়ে প্রথমে খুশি হয়। তারা পুরুষদের অপেক্ষা তাড়াতাড়ি শহুরে আবহাওয়াতে নিজেদের খাপ খাওয়ায়। কিন্তু পঙ্কিল বস্তির কুসঙ্গ শীঘ্র তাদের বিপথে পরিচালিত করে। এদের শিশুরা এই কুসঙ্গ জনিত প্রায়ই অপরাধীদের কলেবর বৃদ্ধি করেছে। কেহ কেহ বলেন যে, গ্রামেও স্বামীবিহীন অবস্থাতে স্ত্রীদের চরিত্রের হানি ঘটে। কিন্তু তাঁরা মজ্জাগত ভারতীয় সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ পারিবারিক শাসনের বিষয় ভুলে যান। এই গ্রামে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এইখানে বিপথগামী বা বিপথগামিনী হওয়ার সুযোগ কম।

কদাপি শহরের ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টা নরনারীর মন আর গ্রামে ফিরতে চায় নি। ফলে, তারা গ্রামীণ সমাজে কিছুকাল থেকে নিজেদের শুধরাতে পারে নি। এই সকল গ্রাম-হারা শ্রমিকগণ আপদকালে অসহায় হয়ে পড়েছে। এই অবস্থাতে স্ত্রীদের বেশ্যা ও পুরুষদের চোর হওয়া ভিন্ন উপায় থাকে নি।

[এই সকল শ্রমিকদের স্ত্রীরাও শহরে এসে বাড়তি আয়ের লোভে শ্রমিকের কাজ করেছে। এই ভাবে শহরে শহরে স্ত্রী-শ্রমিকের প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে। কিন্তু এরা দক্ষ-শ্রমিক বা স্কিলড ওআর্কার রূপে কাজ করে না। অধুনা বহু নারী সূক্ষ্ম শ্রমশিল্পে আত্মনিয়োগ করেছে। এদের অধিক সংখ্যায় খনি প্রভৃতিতে কাজ করতে দেখা যায়। চা-বাগান সমূহে প্রায় পাঁচ বৎসরের কনট্রাক্ট-এ শ্রমিকদের ভর্তি করা হয়। এ'জন্য এরা সাথে সাথে তাদের স্ত্রী-পুত্রদের কর্মস্থলে আনে। কারণ ঐ চুক্তিভুক্ত শ্রমিককে পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রামে যেতে দেওয়া হয় না। গ্রামের ন্যায় এদের স্ত্রীদের সংসারের কাজে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না। তাই এদের অনেকে চা-বাগানে স্ত্রী-শ্রমিকের কাজ সহজে করে থাকে। এক্ষণে চা-পত্র সঞ্চয়নে স্ত্রী-শ্রমিক পুং-শ্রমিক অপেক্ষা অধিক দক্ষতা দেখায়।]

গ্রামের উপর উপযুক্ত কারণে টান থাকায় গ্রামের বাটী তৈরি করতে বা জমি কিনতে হলে এই সকল শ্রমিক সমুদয় অর্থ প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হতে তুলবার জন্যে নিষ্প্রয়োজনে কার্যে ইস্তফা দিয়েছে। এরা নিজেদের অস্থায়ী কর্মী মনে করায় কখনও শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্য হতে চায় না এবং ঐ সকল সঙ্ঘে চাঁদা দেওয়া দূরে থাকুক তাতে একটু মাত্রও এরা আগ্রহশীল নয়। কিন্তু সকল বিষয় বিচার করলে এ দেশের শ্রমিকদের এ'জন্য দায়ী করা যায় না। কিন্তু

শ্রমিকরা সপরিবারে বহুদিন শহরে বাস করলে তাদের পুত্রেরা শহুরে আবহাওয়াতে অভ্যস্ত হয়। এই সকল নবজাত সন্তানরা শহর হতে গ্রামে যেতে চায় না। এরা একদিন স্থায়ী শ্রমিককুলের সৃষ্টি করবে। কিন্তু তারা তাদের গ্রামীণ পিতৃকুলের মত অতো কর্মঠ শ্রমিক না'ও হতে পারে। শহরেব বিষাক্ত বায়ু ও ভেজাল খাদ্য তাদের কর্মশক্তির হানি ঘটাবে। উপবন্তু একটি নির্ভরযোগ্য গ্রামীণ আশ্রয়-স্থল তারা চিবকালের মত হারাবে।

কিছুকাল পূর্বেও কলকাতা শহরে দেখা গিয়েছে যে ভারতীয় শ্রমিকরা সম্প্রদায়গত ভাবে শ্রমশিল্পে আত্মনিয়োগ করেছে। মাল বহনের কার্যে সাধারণতঃ বিহারী শ্রমিকরা নিযুক্ত থাকতো। পূর্ব বঙ্গীয়রা জাহাজের খালাসি ও সারেঙ্গের কাজে উপযুক্ত ছিল। এক সময়ে এই নগরে প্রতিটি ট্যাক্সি-চালক পাঞ্জাবী শিখ ছিল। জল-কলের মিস্ত্রি মাত্র উড়িয়া শ্রমিক ছিল। ফ্যাকটরির হাঁড়িঘরের কাজে মোসলেমদের একচেটিয়া অধিকার। বাত্রিকালীন পাহারাদারের জন্য নেপালীদের ডাক পড়তো। ইলেকট্রিক ও বস্ত্রশিল্পে বাঙালি শ্রমিকদের আধিক্য ছিল। ইঞ্জিন ড্রাইভার মাত্র অ্যাঙ্‌লো-ইণ্ডিয়ান হতো। করণিক মাত্র [একাউন্টেন্ট সহ] বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী ছিল। কিন্তু গত কয় বৎসরে বহু শহরে শ্রমিক জীবনের মধ্যে এখন এক অভূতপূর্ব বিপর্যয় এসে গিয়েছে। পূর্বেকার স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু শ্রমিকরা এখন স্বকীয় কর্মক্ষেত্রে সংখ্যালঘুতে পরিণত। এখন এরা পারিবারিক শিক্ষার উপর নির্ভর না করে সরকারী শিক্ষণ-কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করে। এখন পূর্বেকার হিন্দু সমাজের মত জাতিগত [জাতিভেদ] ভাবে কোনও কাজ-কর্ম সম্প্রদায় কিংবা জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ নেই। ভারতীয় উদ্যোগ-শিল্প সমূহে এখন সর্বজনীনতা স্থান গ্রহণ করেছে। পূর্ব

দিনের মত কেহ মাত্র বংশগত জাতি ব্যবসায়ে বা পারিবারিক নীতিতে বিশ্বাসী নয়। কর্মগত [পরে বংশগত] পেশার কারণে এদেশে জাতি-ভেদের সৃষ্টি হয়। [বিভিন্ন জাতির কমবেশি মিশ্রণ হেতু রক্তের বিভিন্ন পরিমাপ মত ইহা সৃষ্ট হয়।] এক্ষণে কর্মক্ষেত্রে এই সর্বজনীনতা ঐ জাতিভেদের মূলোচ্ছেদে উদ্যত। এই একটি ক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিক-স্বভাবের মধ্যে দ্রুত গতিতে পরিবর্তন এসে গিয়েছে। [এমন কি, যুদ্ধ ব্যবসায়ীরাও আজ আর কোনও সামরিক শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ নয়।]

গ্রামের মানুষদের তুলনাতে শহরের মানুষের আর্থিক প্রয়োজন বেশি। এই জন্য শহরে অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়। গ্রাম হতে শহরে এসে শ্রমিকদের খরচ বাড়ে। কিন্তু উহা মেটাবার মত পর্যাপ্ত বেতন তাদের নেই। এইজন্য যত্র তত্র ধারকর্জ করে তারা ঋণভারে প্রপীড়িত হয়ে পড়ে। গ্রামের লোকেদের বিষয়-সম্পত্তি থাকাতে তারা কম সুদে ঋণ পেয়ে থাকে। ফসল উঠানোর পর তারা এই ঋণ শোধ করে। এদের এই ঋণ ভার সেখানে সাময়িক মাত্র। কিন্তু শহরে শ্রমিকদের বসবাসের স্থায়িত্ব না থাকাতে তাদের অত্যধিক হারে সুদ গুনতে হয়। শহর হতে না পালানো পর্যন্ত তারা জীবন ভর ঋণগ্রস্ত থাকে। এই ঋণের চিন্তা তাদের বেপরোয়া করে তুলে। এই ঋণের দায়ে উদ্ব্যস্ত থাকাতে তারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে অপারক।

এই তাগাদা [ঋণভার] হতে মুক্ত হবার জন্যে বহু শ্রমিক কর্মত্যাগ করে তাদের আকাঙ্ক্ষিত গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। এই সকল বিষয়ে পর্যালোচনা করলে ভারতীয় শ্রমিকরা কেন এখনও পুরাপুরি [স্থায়ী] শ্রমিক পদবাচ্য হতে পারে নি তা বুঝা যায়।

ভারত এখন উদ্যোগ-শিল্পে উন্নত যন্ত্রের আমদানি করেছে। এই

যন্ত্রের সাথে গ্রামীণ শ্রমিকদের খাপ খাওয়াতে দেরি হয়। তারা এই যন্ত্রের কার্যকারিতা দেখে মুগ্ধ হয়। কিন্তু ওই যন্ত্রের সাথে মানসিক সংযোগ আনতে তাদের স্বভাবতঃই দেরি হয়ে থাকে। একটি যন্ত্রে তারা শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া মাত্র সেখানে অন্য এক উন্নত যন্ত্র এসে তাদের কর্মচ্যুত করে। হয় তার ঐ দুরূহ যন্ত্র পরিচালনার মত শিক্ষা থাকে না, নয় ঐ যন্ত্র পরিচালনাতে পূর্বাপেক্ষা কম শ্রমিক প্রয়োজন হওয়াতে ঐ পুরানো শ্রমিকের প্রয়োজন ফুরায়। আরও কিছুকাল পরে ফ্যাকটরি সমূহের যন্ত্রমাত্রই স্বয়ংক্রিয় হবে। যেখানে এক হাজার শ্রমিক পূর্বে কাজ করে হিমসিম খেয়েছে, সেখানে মাত্র একশত শ্রমিকেরও প্রয়োজন থাকবে না। এর পর অ্যাটমিক পাওয়ারের আমদানী আরও কি অঘটন ঘটাবে তা কি কেউ জানে? এর সাথে শ্রম-শিল্পে যান্ত্রিক ইলেকট্রনিক ব্রেনেরও উপস্থিতির সম্ভাবনা আছে। গ্রামীণ শ্রমিক কুল মধ্যবিত্ত সমাজকে [শ্রমশিল্পের প্রসারের সাথে] নিষ্প্রয়োজন করে তুলেছিল। এবার ঐ যন্ত্র-কুশলী মধ্যবিত্ত সমাজ [স্ত্রী ও পুরুষ] পুনরায় গ্রামীণ শ্রমিককুলকে অবশ্যম্ভাবী রূপে বিদূরিত করবে। উদ্যোগ-শিল্পে আবার নূতন করে [বংশগত নয়] উচ্চ জাতের সৃষ্টি হবে। তখন নূতন করে এই কর্মঠ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের বিষয় চিন্তা করতে হবে। এই জন্য আমি মনে করি যে গ্রামীণ সমাজ হতে এই সকল কর্মঠ শ্রমিকদের বিচ্যুত হওয়া উচিত হবে না। ঐ দুর্দিনে একমাত্র কৃষিক্ষেত্র তাদের হৃতগর্ব পুনরায় ফিরিয়ে আনবে। একমাত্র কৃষিকার্যে অতি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসমূহের স্থান নেই। উহা নির্জীব পদার্থ তৈরি করতে পারে বটে, কিন্তু উহা সজীব পদার্থ তৈরি করতে অক্ষম। কৃষি-কার্যে তাদের সাধ্যায়ত্ত যান্ত্রিক জ্ঞান উন্নত যান্ত্রিক কৃষি-কার্যে [স্বয়ংক্রিয় নয়] তাদের সহায়ক হবে।

[বলা বাহুল্য, পৃথিবীর সকল মানুষ সমান ভাবে মেধাবী [বুদ্ধিমান] হতে পারে না। এর ফলে আগামী কালে দুই শ্রেণীর শ্রমিক সৃষ্টি হতে বাধ্য। বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রচালকগণ এই যুগ নিয়ন্ত্রণ করবে। এমন এক যুগ ভবিষ্যতে হয়তো আসবে যখন একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কোটি লোকের মওড়া [যুদ্ধে] একাকী রাখা সম্ভব হবে। ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীর হাতে হয়তো আবার জগতের শাসন ভার ফিরে যাবে। তবে আশা এই যে, সেদিনও তাদের শক্তির উৎস বোধ হয় জনতা হতেই গ্রহণ করতে হবে।]

শ্রমিক স্বভাবের সাথে মালিক স্বভাবেরও কিছু আলোচনা করা উচিত। এইখানে পাবলিক সেকটারের সাথে প্রাইভেট সেকটারের প্রভেদ আছে। আমি পৃথক পৃথক ভাবে এই উভয় শ্রেণীর মালিক সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

(১) পাবলিক সেকটারের কর্মকর্তাদের বহু ব্যক্তি নিজেরা ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানী বা ব্যবসাদার নয়। বহুক্ষেত্রে তারা পর্দাঘেরা অফিসে পর্দাসীন অফিসার রূপে আসীন। ফিল্ড ওআর্কের চাইতে ফাইল ওআর্কে তারা দক্ষ। ফলে অধস্তন বিশেষজ্ঞ কর্মীদের উপদেশ মত এদের চলতে হয়। বহুক্ষেত্রে এরা নিজেদের সবজান্তা মনে করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে বিপদ ঘটায়। এদের মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তদারকির সুবিধার্থে কিছুটা পড়াশুনা করে। কিছুটা তাঁবেদারদের সাথে আলোচনা করে জ্ঞান অর্জন করে। যাদের কাছে কৌশলে তারা কাজ শিখে নেয়, তাদিকেই পরে তারা ঐ সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, কিন্তু মধ্য পথে অন্যত্র বদলি হওয়াতে এদের এই সাধু চেষ্টা ব্যাহত হয়। তখন এদের অন্যত্র নূতন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। এদের কেউ কেউ প্রাইভেট ফ্যাকটরির কার্য পরিদর্শন করে ও সেখানে মালিক ও ম্যানেজারের সাথে পরামর্শ করে

কিরূপে কম খরচে এবং কম অপব্যয়ে অধিক উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তা জেনে নিয়ে থাকে। তবে অধস্তনদের উপর অবিচার ও অত্যাচার করার সুযোগ এদের কম। কারণ, ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন—এই উভয় শ্রেণী একই সরকারের নোকর হওয়াতে এদের কেহ কাহারও ব্যক্তিগত ভৃত্য পদবাচ্য নয়। উপরন্তু [ত্রৈ-বাৎসরিক] বদলি প্রথা প্রচলিত থাকাতে বিবাদী ব্যক্তিদের একজন বা অপরজন রুটিন মাফিক অন্যত্র বদলি হয়ে থাকে [প্রাইভেট সেকটারের কয়েক ক্ষেত্রে এইরূপ ত্রৈ-বাৎসরিক বদলি প্রথা থাকা উচিত।] এদের প্রশাসনী জ্ঞান থাকলেও ব্যবসায় জ্ঞান এতটুকুও নেই। ব্যবসার সকল ক্ষেত্রে কঠোর শাসন এড়িয়ে পাত্র বুঝে ক্যাগাঘেন্না করতে হয়। এমন কি, দক্ষ ও সৎ কর্মীদেরও একটু খোসামোদ করারও দরকার হয়। বহু দক্ষ ও সৎ কর্মীর বহির্ব্যবহার ও কথাবার্তা সুললিত হয় না। কিন্তু তথাপি এদেরকে সহ্য করা বা সমীহ করার প্রয়োজন হয়। ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানে ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকাতে ঐ বিষয়ে এঁরা মনোযোগী হওয়া অসম্মানকর মনে করেন। এঁদের চাকরি ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা থাকাতে এদিকটা এঁরা কখনও চিন্তা করেন না। প্রয়োজন হলেও কঠোর আইনের নাগপাশ ছিন্ন করে একপদ অগ্রসর হতে এঁরা অপারক।

প্রাইভেট সেকটারের কর্মকর্তারা নিজেরা ইঞ্জিনিয়ার না হলেও পুরুষানুক্রমে সুদক্ষ ব্যবসায়ী। দ্রব্যের উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাতে এঁরা শ্রমিকদের নিকট কাজ আদায়ে সক্ষম। কারণ, আইনতঃ পাঁচ শত টাকার ঊর্দ্ধে বেতনভোগী কর্মীদের যখন-তখন ইচ্ছামত ভর্তি ও বরখাস্ত করবার অধিকার এঁদের আছে। যে কোনও গুণীর ব্যক্তির মস্তিষ্ক প্রসূত বিদ্যাবুদ্ধি এঁরা অর্থের দৌলতে ক্রয় করতে সক্ষম। কারণ, এঁদের পুরুষানুক্রমে অর্জিত [ধারণাতীত] অর্থ

এঁদের [প্রকাশ্যে বা গোপনে] মজুত আছে। পাবলিক সেকটারের কর্মকর্তাদের সুবিধা এই যে—তাঁদের উৎকোচ বাবদ অর্থ ব্যয় করা বা ক্ষমতাসীনদের তোয়াজ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এঁদেরকে এই সকল খরচ-খরচা বাবদ ব্যয় করার জন্য অর্থ মজুত রাখতে হয়। বিশ টাকা আয় স্থলে এঁরা দশ টাকা ব্যয় করতে সদা প্রস্তুত। বহু 'গো-বিটউইন'গণ এসব কাজে একশ টাকা খরচ করে দু'শ টাকা খরচ লেখান। কনটিনজেনসির খাতে ব্যয়ের বহর হতে ইহা বুঝা যায়। এঁরা রুটি ভক্ষণ কালে রুটির খদ্দের এলে দুইখানি রুটি ভক্ষণ করে বাকি দুটি রুটি না খেয়ে বিক্রয় করবেন। ভাউ ও নাকার বহির্ভূত অন্য কোনও বিষয়ে এঁদের বুদ্ধি স্তিমিত। ফলে, ডাক্তার [ভুঁড়ীতে ও মস্তকে স্টেথিসকোপ যন্ত্র রক্ষার প্রবাদ লক্ষনীয়] উকিল প্রভৃতি ব্যক্তিকে এঁরা নিষ্প্রয়োজনে অর্থ দিতে প্রস্তুত। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, ব্যবসা ক্ষেত্রে এঁরা ইনটেলিজেন্সের বদলে ইনিষ্টিংক্ট-এর দ্বারা পরিচালিত। ব্যবসার ক্ষেত্রে অতি জ্ঞানী মানুষও এঁদের কাছে শিশু কিন্তু অন্য বিষয়ে এঁরা হাস্যকরভাবে নির্বুদ্ধিতা দেখান। এঁদের কারুর ধারণা অর্থের জোরে [চাঁদী কা জুতা] সব কিছু করা সম্ভব। এঁরা জামিন পেলে মূল মামলার ভয় করেন না। কারণ কয় ঘন্টার জামিনের অভাবে ব্যবসায়ে অমনোযোগী হলে এঁদের আর্থিক ক্ষতি। কিন্তু এঁদের মধ্যে চতুর শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও অভাব নেই। রাত থাকতে উঠে পুত্রদের সাথে এঁরা দৈনিক করণীয় বিষয় আলোচনা করেন। তারপর প্রোগ্রাম মাফিক এঁদের এক-একজন এক-এক কাজে সকাল আটটার মধ্যে বাহির হন। বেলা বারোটাতে ফিরে স্নানাহারান্তে দুইটাতে বেরিয়ে রাত্র আটটা পর্যন্ত কাজ করেন। এই সব কোটিপতিদের ঘন্টার পর ঘন্টা দণ্ডায়মান ভাবে পাটের ফেঁসো পরীক্ষা করতে আমি দেখেছি। সাধারণ ভাবে দেশের

স্বাধীনতা অর্জনে এঁদের আর্থিক দান তো ছিলই, উপরন্তু ব্রিটিশ ফ্যাক-টরির পাশে দেশীয় ফ্যাকটরি তৈরি করে এঁরা ভারতে ইংরাজের বাণি-জ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেন। ফলে এ দেশ ব্রিটিশের কাছে নিষ্প্রয়োজনীয় ও অলাভজনক হয়ে উঠে। এই দিক হতে বিচার করলে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে এঁদেরও অবদান আছে। বহু ব্যবসায়ী ক্ষমতাসীনরা না চাইলে এবং সংবাদপত্রে না বেরুলে দান করেন না। এই দান করে তাঁরা ভাবেন যে ইহা তাঁদের আয় বাড়াবে। এঁদের কারুর কাছে জনস্বার্থের বদলে [ভেজাল ও মুনাফা] নিজের স্বার্থ শ্রেষ্ঠ। এঁরা শুধু বিপদে জেল খাটবার জন্যে একজন ম্যানেজার রাখেন বটে, আসলে কিন্তু এঁরা নিজেরাই নিজেদের ম্যানেজার। তবু বলবো যে এঁদের কয়েক ব্যক্তি ব্যবসায় ও শিল্প-ক্ষেত্রে দেশের মহোপকার করেছেন। এঁদের প্রাচীন ব্যক্তিদের আজও বিনয়ী ও নম্র দেখা যায়। অপরে নমস্কারার্থে হাত তুলবার পূর্বেই এঁরা হাত জোড় করে নমস্কার করেন। কিন্তু এঁদের উত্তরাধিকারী যুবক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কয়েকজনের মধ্যে চরম দাম্ভিকতা ও নিষ্ঠুরতা দেখে অবাক হই। এঁদের অফিসার শ্রেণীর ব্যক্তিরাও সেলাম জানালে ঘাড় না নেড়ে বা মৃদু না হেসে এঁরা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিংবা কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা ভাবে গন্তব্য স্থানে চলে যান। বহু ক্ষেত্রে এঁদের চলনগুলি পর্যন্ত আপত্তিকর মনে হয়। অন্য দিকে এঁদের বহু জনা নিরহঙ্কার ও প্রকৃত দাতা ব্যক্তিও হয়ে থাকেন।

অধুনা কয়েক শ্রেণীর মালিকদের মধ্যে চরিত্রহীনতা ও নীতিজ্ঞান-হীনতাও লক্ষ্য করেছি। এদের দুই-একজন গরীব কর্মীদের নারীদেরও কামনা করে। নারী কর্মীরা এদের লালস দৃষ্টি এড়াতে দারিদ্র্য বরণ করে। তবে এদের সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যল্প।

[পূর্বে কলিকাতাতে ব্যবসায় বাঙ্গালীদের কুক্ষিগত ছিল। পরে উহা ক্ষেত্রীদের অধিকারে চলে যায়। এই ক্ষেত্রীদের হটিয়ে মাড়বারীরা উহা অধিকার করে। এক্ষণে ইহা দ্রুতগতিতে ভাটিয়াদের হস্তে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু এক্ষণে উহা সমভাবে সর্বশ্রেণীর মধ্যে বণ্টন হবার পথে। এই পারস্পরিক উত্থান-পতনের মূল কারণ একটিই মনে হয়। ইহা হতে মালিকদের শিক্ষালাভ করা উচিত।]

বলা বাহুল্য যে, এ দেশের অধিকাংশ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা বুদ্ধিমান, নির্ভীক ও সৎ এবং পরোপকারী ও কর্মঠ হয়ে থাকেন। নৈতিক চরিত্রের দিক হতেও এঁরা প্রশংসনীয়।

[জনৈক চিকিৎসক শিল্পপতি পূর্বে বহুবার মদ্‌গৃহে সস্ত্রীক চা পান করেছেন। বহুভাবে তাঁরা আমার দ্বারা উপকৃতও হন। এখন তাঁর মূল্যবান অফিস ও ঘন ঘন বিদেশে যাতায়াত। অবসর গ্রহণের পর শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁকে একটি পত্র পাঠাই। পত্রবাহকের সাথে দেখা করা বা তার উত্তর দেওয়া তো দূরে থাক তিনি পত্রটি নীরবে মুঠি করে নীচের ঝুড়িতে ফেলে ঘাড় নাড়েন। কারণ তাঁর ধারণা আমি এক্ষণে তাঁর অপকার বা উপকার করতে অক্ষম।]

বহু ধনী মালিক অধুনা অবসরপ্রাপ্ত আই-এ-এস এবং আই-পি-এস অফিসারদের তাদের প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে নিয়োগ করে গর্বানুভব করেন। এই সব অফিসারদের এঁরা একদিন ভয় করে এসেছেন। তাই তাঁদের এই নিয়োগে তাদের এই ভীতি [অবচেতন মনের] শান্ত হয়। এঁদের মারফৎ এঁদের স্থলাভিষিক্ত অফিসারদের প্রভাবান্বিত করারও এঁদের বাসনা। তবে অধিক ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক রূপে এঁদের ব্যবহার করা হয়। আমি জনৈক ব্যবসায়ীকে গর্ব করে একদা বলতে শুনেছিলাম,—'হাম এইসেন এক আদমীকে রুখ লিয়া।' আজকাল বাড়ি-

গাড়ি সহ একজন ধর্মগুরু, একটি অ্যালেসেশিয়ান ডগ্ ও একজন অবসরপ্রাপ্ত [সরকারী] উচ্চপদী কর্মী রাখা শিক্ষিত ধনীদের একটি ফ্যাশন।

বহু শ্রেষ্ঠী মনে করেন যে তাঁরা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। কারুর কারুর স্থানীয় ব্যক্তিদের উপর এক বিজাতীয় ঘৃণা। এঁরা স্থানীয় ব্যক্তি নিয়োগ না করে দূরদেশ হতে কর্মী আনেন। তাঁদের পিতৃ আমলের এবং ব্রিটিশ আমলের [ইংরাজ বিক্রীত ফ্যাকটরি] স্থানীয় কর্মীদের সুযোগ পেলে বিদূরিত করেন। এদের কেউ মৃত হলে বা কর্মত্যাগ করলে স্থানীয় ব্যক্তিকে সেখানে ভর্তি করার রীতি নেই। এখনও স্থানীয় ব্যক্তিরা সরকারী ক্ষমতাসীন কর্মচারী পদে বহাল। তাদের সাথে সংযোগ বা প্রভাব রক্ষার্থে দুই একজনকে রাখা হয়। অধুনা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উৎকোচে বশীভূত করা সম্ভব হয়। এজন্য স্থানীয় জনতার বিরূপতা হতে আত্মরক্ষার্থে মাত্র এঁদের কতিপয় স্থানীয় ব্যক্তির প্রয়োজন। উৎকোচ দানে সক্ষম মালিকদের সাথে আহরে উৎকোচদানে অক্ষম ব্যক্তিরা অসহায়। কতিপয় ইঞ্জিনিয়ার, ইলেক-ট্রিসিয়ান ও টেকনিসিয়ান ব্যতীত [যাদের না হলে চলে না] সেখানে অন্য স্থানীয় ব্যক্তিদের স্থান নেই। একই কর্মে নিযুক্ত স্থানীয় ব্যক্তি এবং বাহিরের ব্যক্তির বেতনেতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকে। বহু স্থানীয় ব্যক্তিকে এঁরা বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে অন্যস্থান হতে ছাড়িয়ে এনে কার্যোদ্ধার হওয়া মাত্র তাঁদের বিতাড়িত করেন! এ ভাবে বহু মান্যগণ্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের আখের এঁদেরকে আমি নষ্ট করতে দেখেছি। ভারতের সর্বত্রই এইরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন ও ভাইবর্গ পোষক কিছু কিছু মালিক দেখা যায়।

এঁদের ব্যবহার দ্বারা প্রতি মুহূর্তে বহু আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় সংহতি

বিনষ্ট করছে। উপরন্তু তাঁদের এই জাত-পচ্ ভাব দেশে কমিউনিজম্ এবং সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছে। এই একটিমাত্র কারণে স্থানীয় গণ-মন দ্রুত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থার [স্টেট বাসের মত] পক্ষপাতী। অন্যথায় তাঁরা নিজ ভূমে ফ্যাকটরি স্থাপন কামনা করেন না। স্থানীয় জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্ত হলো অথচ স্থানীয় মিল-ফ্যাকটরি সেইরূপ হলো না কেন? [ফলে জমিদার মহারাজা আজ আর অমুক মহাব্যবসায়ীর সমকক্ষ নয়।] লাঙ্গল যার জমি তার সত্য হলে 'হাতুড়ি যার, ফ্যাকটরি তা'র' সত্য নয় কেন? অন্ততঃ খাদ্যে ও ঔষধে ভেজালকারী এবং অতি-মুনাফাকারীদের ব্যবসায় বাজেয়াপ্ত বা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হচ্ছে না কেন? এই প্রশ্নে বেকার ব্যথাতুর স্থানীয় ব্যক্তি মাত্রের মন আজ আলোড়িত। দারিদ্র্য বরণ করেও এরা কেহ প্রায় নিজ দেশে পরদেশী হতে চায় না।

আশা এইটুকু যে সাধারণ শ্রমিককুল এইরূপ হীনমন্যতাতে এবং 'জাত পচ' ভাবে বিশ্বাসী নয়। তারা নিজেদের জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে ভারতীয় জাতিতে পরিণত হওয়ার পক্ষপাতী, কিন্তু কিছু মালিক তাদের মধ্যে বিভেদ এনে ইহার প্রতিবন্ধক হন।

আবার বহু মালিক কাণ্ডজ্ঞানহীন এমন অর্থপিশাচ যে তাদের অর্থ-গৃধ্নুতাকে উপহাস করে মুখে মুখে প্রতিবাদ স্বরূপ বহু গণ-গল্পেরও সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহার অপছন্দ করা সত্ত্বেও উহার প্রতিবিধানে অক্ষম হলে এইরূপ গণ-গল্প সৃষ্টি করে। এইরূপ একটি গণ-গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"তিন পুরুষের ব্যবসায়ী হীরালালের স্ত্রী হাঁসপাতালে আসন্নপ্রসবা। ডাক্তার তার পিতামহ শোহনলালকে জানালো—লেড়কাকে বার করতে হলে অস্ত্রোপচার করতে হবে। প্রসূতি বা পুত্র একজনের মৃত্যু অবধারিত। এখন আপনি কাকে চান বোলেন। শোহনলাল বিপাক

বুঝে তখুনি একটা চাঁদীর টাকা আঙুলে উল্টে ঠং করে মাটিতে ফেলা মাত্র উহার মিষ্টি সুর কানে শুনে দুই হাতে তা ধরবার জন্যে দুই হাত প্রসারিত করে শিশু মাতৃ জঠর হতে বার হলো। এর পর অস্ত্রোপচারের আর প্রয়োজন হয় নি।"

পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ব্ল্যাকমনিব বলে বলী এইসব মালিকদের আগ্রাসী ভূমি লিপ্সা এবং স্থানীয় পৌর সংস্থা কর্তৃক সাধ্যাতীত ভাবে ধার্য ট্যাক্সেব চাপে বেকাব ও স্বল্প আয়ী স্থানীয় ব্যক্তিবা গৃহহীন হয়ে শহরাঞ্চল হতে বিতাড়িত হওয়াব উপক্রম। উদ্যোগ-শিল্প এদের নিকট আজ প্রায় অভিশাপ স্বরূপ। তাদেব চাষেব জমিগুলো গেলো। শিল্প কিন্তু তাদের কিছু দিল না। আদিবাসীদের বক্ষার্থে জমি হস্তান্তর বন্ধ করা হয়। সেইরূপে স্থানীয় মানুষদের বক্ষার্থে জমি হস্তান্তর বন্ধের প্রয়োজন হয়েছে। এরা কেউ কেউ নদীব দুকূল আবর্জনা ফেলে বুজিয়ে জমি মারে। আপন কাজ সিদ্ধ কবতে [অকৃতজ্ঞতাব সাথে] কী বিতাড়নে এদেব দ্বিধা নেই। প্রচুর বৃথা আশা দিয়ে এরা তা কদাপি পূবণ কবে নি। ঊর্ধ্বতনদের দ্বারা অধস্তনদেব ডিসমিস কবতে এরা বাধ্য কবে। যাকে পায়ে ধরে আনে তাকে গলা ধাক্কাতে এবা বিদায করে। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ অসহনীয় অবস্থাতে যেকোন ও সময স্থানীয় লোকদের মধ্যে গণ-বিদ্রোহ ঘটা অসম্ভব নয়। এবং সময়ে সাবধান না হলে দিন আগত ঐ। কারণ, সরকারী পদগুলির বাইবে কর্মসংস্থানে এদের দ্বারস্থ হওযা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় এদের আজ নেই। এ বিষয়ে সৎ মালিকদের ও মালিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সচেতন হয়ে ত্বরায় ইহার প্রতিবিধান করা উচিত হবে। কারণ, আজ যা একজন ভাবছে কাল তা বহুজনা ভাববে।

১৫

শ্রমিক-সংঘ

এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে হিন্দু ভারত, মোসলেম শাসনকাল ও ব্রিটিশ রাজত্বকালে শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার জন্যে রাজ-শাসনের ব্যবস্থা ছিল। এমন কি, তৎকালীন কর্মরত শ্রমিকদের নিজেদের শ্রমিক-সংগঠন [য়ুনিয়ন] ছিল। এই সংগঠনের মাধ্যমে তারা তাদের অভাব-অভিযোগ বিষয়ে মালিকদের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের করতে পারতো। কিন্তু মোসলেম শাসনকালে এবং ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে তাদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠে। মালিকদের সংগে কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাদের ছিল না। কৃষককুল যেমন দল বেঁধে জমিদারদের অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতো না, তেমনি ভারতীয় শ্রমিকরাও কদাপি দলবদ্ধ মালিকদের অত্যাচারের প্রতিকার করতে পারেনি। এ বিষয়ে এদের একক প্রচেষ্টার বিষয় মধ্যে মধ্যে শুনা যেতো মাত্র। কিন্তু উহাও নানা প্রকার পেষণের মধ্যে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো। ভারতীয় চাষীরা অবশ্য অবস্থা অসহনীয় হলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু ঐরূপ প্রকাশ্য বিদ্রোহ [অর্থনৈতিক কারণে] শ্রমিকদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু এতো সত্ত্বেও শ্রমিকরা নিজেরা দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনের বিষয় বহুকাল পর্যন্ত চিন্তা করে নি। তাদের অবস্থা অসহনীয় হলে তারা পুনরায় গ্রাম্য জীবনে ফিরে এসে চাষবাসের কার্যে পুনঃ নিযুক্ত হয়েছে।

বাঙলাদেশের ব্রাহ্ম সমাজের নেতাগণ সর্ব প্রথম শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা করেন। এ কথা বহুলোক জানেন না যে কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজ সর্বপ্রথম শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক সংগঠন সমূহ গড়ে দেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালে ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি স্বয়ং ১৯০৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ওআর্কার্স ইউনিয়নের পূর্ব ভারতীয় শাখার সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কিছু কাল শ্রমিক-নেতা ছিলেন তা অনেকেই আজ জানেন না। এর পর কলিকা·া মহানগরীর ব্রাহ্ম সমাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বোম্বাই মহানগরীর 'সার্ভেণ্টস অফ্ ইণ্ডিয়া' এবং মাদ্রাজ মহানগরীর 'থিওজোফিক্যাল সোসাইটি' যথাক্রমে পশ্চিম ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে শ্রমিক ·ান্দোলন আরম্ভ করেন। এর ফলে পূর্ব ভারত, পশ্চিম ভারত এবং দক্ষিণ ভারতে বহু মিল-ফ্যাকটরিতে শ্রমিক-সঙ্ঘের সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে এইগুলি জোরদার হয়ে উঠে। পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলে শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি শক্তিশালী হয়। এই সময় তারা প্রত্যক্ষ রূপে অভিযোগ মুখর হতে সাহসী হয়। উপরন্তু মহাত্মা গান্ধী ধর্মঘট রূপ এক অমোঘ অস্ত্র শ্রমিকদের হাতে তুলে দেন। অবশ্য আশি বৎসর আগে কলিকাতার পালকি বাহকরা সর্ব প্রথম গড়ের মাঠে মিটিং করে এক যোগে ধর্মঘট করে কাজ বন্ধ করে।

এক্ষণে কয়েকটি প্রাদেশিক শ্রমিক-সংস্থা স্থানীয় শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই প্রাদেশিক সংস্থাগুলি কতিপয় সর্ব ভারতীয় সংস্থার অধীনে কাজ করে। অধুনা একাধিক প্রদেশীয় ও সর্ব ভারতীয়

শ্রমিক-সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল পরস্পর বিরোধী শ্রমিক-সংস্থাগুলি স্থানীয় শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে সুযোগ মত নিজেদের অধীনে আনতে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে থাকে। একই মিল ও ফ্যাকটরিতে একাধিক শ্রমিক সঙ্ঘের সৃষ্টির উহা অন্যতম কারণ হয়। কয়েকটি বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা এই সকল শ্রমিক সঙ্ঘ পরিচালিত হয়। বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থে ঐগুলি পরিচালিত হওয়ায় শ্রমিকদের প্রকৃত স্বার্থ উহাদের দ্বারা ব্যাহত হয়েছে। এই সকল রাজনৈতিক নেতা নৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মঘট আদি আহ্বান করে উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ঘটান। এর ফলে মালিকদের মত শ্রমিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। উপরন্তু এতদ্বারা জনসাধারণেরও প্রভূত অসুবিধা হয়।

শ্রমিক সংগঠনগুলি প্রথমে বোম্বাই অঞ্চলে জোরদার হয়। এর কারণ এই যে, ঐ সময় কলিকাতা অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক শিল্পপতি য়ুরোপীয় ছিল এবং বোম্বাই অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক শিল্পপতি ভারতীয় ছিল। এই কারণে বোধ হয় কতিপয় য়ুরোপীয় ঐ স্থানের শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে সাহায্য করে তাদের জোরদার করতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভরেতীয় মালিকদের বিপদগ্রস্ত করে তাদের লাভের অঙ্ক কমিয়ে প্রতিযোগিতাতে তাদের কাবু করা। কিন্তু সেদিন তাঁরা ভাবতেও পারেন নি যে পরে বোম্বাই আন্দোলনের ঢেউ কলিকাতাতে এসে য়ুরোপীয় শিল্পপতিদেরও সমভাবে বিব্রত করবে। প্রথমে শ্রমিক 'ওয়েলফেয়ারের' উদ্দেশ্যে স্থাপিত শ্রমিক সঙ্ঘগুলি পরে ধীরে ধীরে 'অর্থনৈতিক' সঙ্ঘে পরিণত হয়ে যায়।

শ্রমিক সঙ্ঘের মাধ্যমে শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটে থাকে। দুইটি মহাযুদ্ধের পর উহা প্রায়ই প্রবল আকার ধারণ করে।

বিঃ দ্রঃ :—এই সময় মালিকরাও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেদের দলবদ্ধ করতে থাকেন। এর ফলে সর্বভারতীয় এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, বিবিধ চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহের সৃষ্টি হতে থাকে। দি প্লানটার্স এসোসিয়েশন, জুট মিলস্ এসোসিয়েশন, ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন প্রভৃতি সংস্থা স্থাপিত হয়। এইগুলি প্রতিটি ক্ষেত্রে মালিকদের আত্মরক্ষার্থে স্থাপিত হয় নি। এই সব সংস্থার শ্রমিক বিভাগগুলি মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সদ্ভাব রাখার জন্য চেষ্টা করে। উহাদের অন্যান্য বিভাগগুলি উহাদের স্ব স্ব শিল্পের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করে। এই সকল সংস্থার মাধ্যমে মালিক পক্ষীয়দের উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়।

[প্রায়ই দেখা যায় যে গভর্নমেন্টের তরফ হতে কোনও শ্রমিক-দরদী চাপ এলে মালিক পক্ষ হতে বলা হয়—'আমরা শ্রমিকদের জন্য ঐ বাবদে খরচ-খরচা করতে অপারক।' কিন্তু আজিকার যুগে এইরূপ মনোবৃত্তি অচল। কারণ, তাদেরকে শ্রমিক মঙ্গলে অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য করার অধিকার সরকারের আছে। এই ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ হতে এই মাত্র বলা উচিত যে—'ঐ বাবদে এতো এতো অর্থ আমরা ব্যয় করেছি। এর অধিক ব্যয় করার মত আর্থিক সঙ্গতি আমাদের নেই।']

কয়েক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শ্রমিক বিক্ষোভ ও ধর্মঘট আদির সৃষ্টি করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণে উহাদের সৃষ্টি হয়েছে। দুইটি মহাযুদ্ধের পর উহা প্রকট আকার ধারণ করে। এর ফলে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে এই বিষয়ে অবহিত হতে হয়। এই সময় তাঁরা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। পরীক্ষা মূলক ভাবে সর্বপ্রথম কলিকা-

তাতে একটি সরকার পক্ষীয় শ্রমিক কমিশন স্থাপিত হয়। কলিকাতা পুলিশের একজন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারকে উহার অধিনায়ক করা হয়। [ইনি সংযুক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেবের ভাগিনেয় জনাব এম, নুরনবী।] এই ভদ্রলোক প্রথমে শ্রমিকদের নিকট হতে অভিযোগ গ্রহণ করার জন্যে কয়েকটি অফিস স্থাপন করেন। এর ফলে সেখানে শ্রমিকদের নিকট হতে প্রতি সপ্তাহে বহু অভিযোগ দায়ের হতে থাকে। এই অভিযোগ পত্রগুলি তদন্ত করে এই ভদ্রলোক দেখেন যে মূলতঃ উহাদের মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে এবং উহাদের যথাযথ ভাবে প্রতিকার করা না হলে শ্রমিক-বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি ইহাও দেখেন যে, শ্রমিকরাও বাহিরের ব্যক্তি দ্বারা অযথা বিপথে পরিচালিত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র সংস্থাটি নানারূপ সমাক্ষার পরে উন্নত হয়ে গভর্নমেন্ট লেবার কমিশনার ও তাঁহার অফিসের সৃষ্টি করে। এক্ষণে ভারতের প্রতিটি প্রদেশের জন্য একজন করে সরকারী লেবর কমিশনারের পদের সৃষ্টি হয়েছে। মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে সুপরামর্শ দেওয়া এঁদের প্রধান কাজ। কোনও লেবার স্ট্রাইক লিগাল বা ইল্লিগাল তা এঁরাই বিচার করে স্থির করেন। শ্রমিক ও মালিকের ডিসপিউট বিচার করে এঁরা উহার ন্যায্যতা বিচার করে নিজেদের রায় দিয়ে থাকেন। সরকার পক্ষ হতে এঁরা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করেন।

[অধুনা প্রাদেশিক সরকারসমূহ প্রত্যেক উদ্যোগ-শিল্প প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকদের জন্য একজন বা দুইজন লেবর অফিসার নিয়োগ করতে মালিকদিগকে বাধ্য করেছেন। এই ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাত হয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্টের নিকট তা পেশ করে

থাকেন। কর্তৃপক্ষের দ্বারা শ্রমিকদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য তিনি চেষ্টা করেন। যে কোনও শ্রমিক যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার অভিযোগ লেবর অফিসে দায়ের করেন। লেবর অফিসার ও তাঁহার কর্মীরা উহার তদন্ত করে সত্যাসত্য নিরূপণ করেন। উপরন্তু এঁকে শ্রমিকদের আমোদ-প্রমোদ এবং অন্যান্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হয়।]

প্রথমে এঁদের সরাসরি গভর্নমেণ্টের লেবর কমিশনার-এর অধীনে রাখার প্রস্তাব উঠে। কিন্তু পরে তাঁহাকে মালিকের অধীনে কার্যরত রাখাই ঠিক করা হয়। যেহেতু কোম্পানি হতে তাঁকে বেতন দেওয়া হয়, সেহেতু তাঁকে কোম্পানির ম্যানেজার-এর অধীনে কাজ করতে হয়। তবল গভর্নমেণ্ট কোনও অবস্থাতে বাঞ্ছনীয় নয়। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ইহা একটি সমর্থনযোগ্য কারণ। ফলে, যে উদ্দেশ্যে ইঁহাদের সৃষ্টি হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য দৃষ্টতঃ ব্যাহত হয়। এই ভদ্রলোকটিকে সঙ্গত কারণে মালিকের আস্থাভাজন হতে হয়। এইটুকু মাত্র সুবিধা যে এঁকে গভর্নমেণ্টের লেবর বিভাগের অনুমতি ব্যতিরেকে বরখাস্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁর পক্ষে শ্রমিক পক্ষের হয়ে ওকালতি করা সম্ভব হয় না। অবশ্য উনি শ্রমিক সম্পর্কিত প্রকৃত অবস্থা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে সক্ষম। কিন্তু এইটুকু কার্য সুষ্ঠু ভাবে সমাধা করার মত পর্যাপ্ত সময় তাঁর থাকে না। কারণ, শ্রমিক ভর্তি, বরখাস্ত ও পেনসন, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, কর্মীদের ছুটি-ছাটা, চিকিৎসা প্রভৃতির সম্পর্কিত করনিকের কার্যাদি লেবর অফিসের প্রধান কার্য হয়ে থাকে।

উপরোক্ত রূপ মিল্ ও ফ্যাকটরির লেবর অফিসার ব্যতিরেকে মালিকসঙ্ঘ সৃষ্ট মিল এসোসিয়েশন [জুট মিলস্ এসোসিয়েশন ও

ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন] দ্বারা নিযুক্ত লেবর অফিসারেরাও আছেন। এঁরা তাঁদের এসোসিয়েশন-এর অধীন বিভিন্ন ফ্যাকটরিতে এসে তৎ তৎ স্থানীয় লেবর অফিসারদের পরামর্শ দেন। এর ফলে এক ফ্যাকটরির লেবর অফিসার অন্য ফ্যাকটরির লেবর সিচুয়েশন এবং তৎজনিত দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে থাকেন। অন্যান্য ফ্যাকটরি হতে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা বহু বিষয়ে তাঁদের পথ নির্দেশক হয়ে থাকে।

প্রতিটি উদ্যোগ-শিল্পে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী [কিংবা অরাজনৈতিক] একাধিক শ্রমিক-সংস্থা আছে। এইগুলি শ্রমিকদের নেতৃবর্গের নিজস্ব মতানুযায়ী সৃষ্ট হয়। এইরূপ শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির কর্মকর্তারা নিজ নিজ শ্রমিক সংঘে যত বেশি সম্ভব শ্রমিককে সদস্য করতে সচেষ্ট থাকেন। এইজন্য প্রতিদ্বন্দ্বী [ভিন্ন আদর্শবাদী] শ্রমিক সংঘগুলির সাথে তাদের প্রায়ই বিরোধ বাধে। কয়েক ক্ষেত্রে রেশারেশি করে তাঁরা শ্রমিকদের অধিক উপকার করবার চেষ্টা করেন। অবশ্য এঁরা একযোগেও যে তাদের উপকারে সচেষ্ট না হন তাও নয়। এই সকল শ্রমিক সদস্যের নিকট হতে চাঁদা তুলে এঁরা স্ব স্ব শ্রমিক সঙ্ঘগুলি পরিচালন করেন। সংশ্লিষ্ট ফ্যাকটরির নিকটে কোনও স্থানে এঁদের অফিস থাকে। এদের প্রতিটির জন্যে পৃথক পৃথক প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারি আছে। আপাত দৃষ্টিতে এইগুলি শ্রমিক ভোটের উপর নির্ভরশীল ডেমোক্রেটিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকরা তাদের অজ্ঞতার কারণে বাহিরের নেতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিবিধ শ্রমিক সংস্থা [যুনিয়ন] ব্যতীত আরও একটি শ্রমিক-সংস্থা সেখানে আছে। ইহাকে ওআর্কার্স কমিটি বলা হয়। ইহা সমসংখ্যক মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধি সহযোগে সৃষ্ট। উদ্যোগ-শিল্প প্রতিষ্ঠানের

ম্যানেজার ইহার সভাপতি এবং লেবর অফিসর উহার সেক্রেটারি। ফ্যাকটরির বিভাগীয় কর্মকর্তারা ইহাতে যোগ দান করেন। ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাকট [১৯৪৭] অনুযায়ী উহা সৃষ্ট। কোনও প্রতিষ্ঠানে একশত জনের ঊর্ধ্বে শ্রমিক নিযুক্ত হলে এই ওআর্কার্স কমিটি গঠিত হয়। শ্রমিকরা ব্যালট-এর নির্বাচন দ্বারা ইহার সদস্য মনোনীত করে। ফ্যাকটরির প্রতিটি বিভাগ হতে এদের এক-এক জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এই ওআর্কার্স কমিটির অধিবেশন প্রতি মাসে একবার করে হয়ে থাকে। এই কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে আইনতঃ মালিক পক্ষ বাধ্য। এই কমিটিতে শ্রমিকদের অভিযোগাদির মীমাংসা করা হয় তৎসহ এখানে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শ্রমিকদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আইনতঃ শ্রমিকদের ঐ পরামর্শ সকলক্ষেত্রে মানতে মালিকরা বাধ্য থাকেন না।

[উপরোক্ত শ্রমিক সঙ্ঘগুলি ব্যতীত প্রাদেশিক সরকারের লেবার বিভাগের অধীন আরও একদল উল্লেখযোগ্য কর্মচারী শ্রমিকদের উপকারার্থে নিযুক্ত আছেন। এঁদের কনসিলিয়েটারি -থরিটি বলা যেতে পারে। এঁরা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে ফ্যাকটরি এবং খনি প্রভৃতিতে ঘুরাঘুরি করে মালিকদের নিকট হতে শ্রমিকদের জন্য একটু সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন। কোনও এক শ্রমিক সঙ্গত কারণে বরখাস্ত হলেও এঁদের চেষ্টাতে মালিকরা তাদের নিজেদের শুধরে ভালো ভাবে কাজ করার জন্যে আরও একটা সুযোগ দিতে বাধ্য হন। মালি -শ্রমিক বিরোধ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের লেবর অফিসার এবং ঐরূপ . ষ্ঠান সমূহের [এসোসিয়েশন] লেবর অফিসাররা মিটাতেব্যর্থ হলে . রা কার্য্য

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অধিক ক্ষেত্রে মালিকরা কোনও শ্রমিকের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এঁদের আবির্ভাব ঘটে। এঁরা এঁদের চেষ্টাতে ব্যর্থ হলে খোদ গভর্নমেণ্টের লেবার কমিশনার প্রয়োজন মনে করলে ঐ বিষয়ে আরও একবার চেষ্টা করে থাকেন। এর পর শ্রমিকরা তাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারার্থে শ্রমিক-আদালতের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন।]

উপরোক্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, শ্রমিক কল্যাণের জন্য বহু সরকারী, বেসরকারী এবং আধা-সরকারী শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান আছে। উপরন্তু তাদের ন্যায্য অভিযোগ সমূহের প্রতিকারার্থে শ্রমিক-আদালত স্থাপিত হয়েছে। এই শ্রমিক-আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা যথাক্রমে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে আপিল দায়ের করতে পারেন। উপরন্তু সরকারী পর্যায়ে তাঁরা বিনা ব্যয়ে সুবিচার পেয়ে থাকেন। আদালতে তাঁদের নিজস্ব শ্রমিক সঙ্ঘ তাঁদের মামলার ব্যয় নির্বাহ করে। এইখানে শ্রমিক সঙ্ঘ ও শ্রমিক সংস্থাগুলি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা দেওয়া হলো। বিভিন্ন পর্যায়ে এইরূপ বহু শ্রমিক-সংস্থা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা তাঁদের নিজস্ব শ্রমিক-সঙ্ঘ [যুনিয়ন]-এর উপর অধিক আস্থাশীল। অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত অভিযোগের সুরাহার জন্যে তাঁরা সরকারী ও বে-সরকারী [মালিক এসোসিয়েশনের লেবর অফিসার] ও আধা-সরকারী [ওআর্কার্স কমিটি] সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হয়ে থাকেন। কিন্তু মালিকদের সাথে বিরাটাকার যৌথ সঙ্ঘর্ষের কারণ ঘটলে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব শ্রমিক-সঙ্ঘের নির্দেশে কাজ করার পক্ষপাতী। আইন মত এই সকল শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির [যুনিয়ন] মালিকের সাথে তাঁদের স্বার্থ সম্ভূত দরকষাকষির অধিকার আছে। তাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারার্থে যে কোনও ন্যায্যরূপ ও

শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটাদি আহ্বানেরও তাঁদের আইন সঙ্গত অধিকার আছে। বলা বাহুল্য যে,শ্রমিকদের জন্য স্থাপিত সরকারী সংস্থাগুলি একমাত্র মিট-মাটের চেষ্টা ও মালিকের উপর চাপ সৃষ্টি ব্যতিরেকে শ্রমিক স্বার্থের জন্য অন্য কোনও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন না।

[শ্রমিক আদালতগুলি শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের সুগম্য স্থানে স্থাপন করা উচিত। উপরন্তু শ্রমিক-আইনসমূহ জটিলতা বিহীন ভাবে শ্রমিকদের বোধগম্য রূপে তৈরি করতে হবে—যাতে শ্রমিকরা নিজেরাই নিজের মামলা পরিচালনা করতে পারে। অবশ্য আইনজীবী সমেত যে কোনও সাধারণ ব্যক্তির এই মামলা পরিচালনে বাধা নেই। সাধারণ আদালত বিচার্য বিষয় বহির্ভূত সালিশীর ভূমিকাতে অবতীর্ণ হতে পারেন না। কিন্তু এই সব আদালতের জজেদের প্রয়োজন বোধে সালিশীকার তথা কনসিলিয়েটার-এর ভূমিকাতে অবতীর্ণ হওয়ায় আইনতঃ বাধা নেই। বরং এই উচিত কর্ম তাঁরা সাফল্যের সাথে প্রায়ই করে থাকেন।]

সাধারণ ভাবে বলা হয় যে এই সকল যুনিয়ন বা শ্রমিক-সঙ্ঘ বাহিরের ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের পক্ষে নিজেদের নিয়োগকর্তাদের সহিত বাদ-বিসংবাদ করাতে অসুবিধা আছে। এই ক্ষেত্রে বাহির হতে নিযুক্ত কর্ম-কর্তারা নির্ভয়ে মালিকদের সাথে কলহে লিপ্ত হতে পারেন। কিন্তু তা সত্বেও আমি বলবো শ্রমিক সংস্থাগুলির কার্যনির্বাহক সমিতিতে যথেষ্ট সংখ্যক প্রকৃত শ্রমিক-প্রতিনিধি থাকা দরকার। এরূপ ক্ষেত্রে রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যে শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির ব্যবহারের সম্ভাবনা কম থাকে। এখানে উল্লেখ যোগ্য এই যে, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ব্যতিরেকে অন্য কোনও বাহিরের ব্যক্তি শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির মধ্যে আসতে চান না।

অ-রাজনৈতিক সমাজসেবী নেতৃবর্গ শ্রমিক সঙ্ঘগুলিতে যোগ দিলে এই সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মত এঁরা অতো আইনজ্ঞ ও লড়াকু মনোভাবাপন্ন হতে পারবেন কি না তাতে আমার নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বলা বাহুল্য যে, শ্রমিক নেতাদের শ্রমিক আইন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। শ্রমিক সঙ্ঘগুলি বাহিরের ব্যক্তিদের নেতৃত্বাধীন হওয়ার জন্যে মালিকরা দায়ী। কারণ, তাঁরা শ্রমিকদিগকে তাদের সঙ্ঘগুলির কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন না। অধিকন্তু ঐ বিষয়ে তাঁরা নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে থাকেন।

১৬

ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনাকে ইংরাজিতে ম্যানেজমেণ্ট বলা হয়। একজন উপযুক্ত ব্যক্তির উপর এই ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া থাকে। সেই ব্যক্তিকে বলা হয় নিয়ামক বা ম্যানেজার। বহুকাল ব্যবসা-বাণিজ্য পরিবার-ভিত্তিক ছিল। ঐ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি উহার নিয়ামক হতো। কারণ, ঐ সময় ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল পারিবারিক সম্পত্তি। কোনও ব্যক্তি বা তাহার পরিবার [ফেমিলি] হতে উহা উদ্ভুত হতো। এই জন্য ঐ পরিবারের প্রধান ব্যক্তির উপর উহার পরিচালনার দায়িত্ব বর্তাতো। বংশানুক্রমে বহুকাল এই ব্যবস্থা চলে এসেছে। আজও বহু বড়ো বড়ো ব্যবসাতে পারিবারিক আধিপত্য দেখা যায়। কিন্তু অধুনাকালে কোম্পানি সমূহ প্রতিষ্ঠার্থে বহু জনের নিকট হতে মূলধন সংগ্রহ করা হয়। এর ফলে বহু ব্যবসায় আজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। [মাত্র দুই একটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষ বা কোনও পরিবার উহার ৫১ শতক বা তদূর্ধ্ব শেয়ারের অধিকারী হয়ে মালিক হন।] কয়েক ক্ষেত্রে অবশ্য এই ভাবে কোম্পানি ফ্লোট না করে কয়েক ব্যক্তির পার্টনারশিপের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই ধরনের ফ্যাকটরি প্রভৃতির সংখ্যাও যথেষ্ট কম।

পার্টনারশিপ্ ব্যবসায়ে কয়েকজন নির্দিষ্ট সংখ্যক মূলধন-নিয়োগী ব্যক্তির উপর ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বর্তায়। এই

ব্যবসায়ীরা পার্টনারশিপ গ্রহণ করে অর্থের প্রয়োজনে নয়। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে দেখাশুনা করার জন্য উপযুক্ত লোকের অভাবে পার্টনারের প্রয়োজন হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে মূলধন-নিয়োগী প্রতিটি ব্যক্তি উপযুক্ত ব্যবস্থাপক হয় না। এদের মধ্যে যারা নিজেরা নিজেদের ফ্যাকটরি ম্যানেজ করে থাকেন তাঁরাও অন্যান্য কাজের জন্য একজন সুদক্ষ ম্যানেজার নিয়োগ করেছেন। পারিবারিক মালিকানার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে অসুবিধা এই যে পরিবারের প্রত্যেক শরিকের মতামতের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অপেক্ষা করতে হয়। এরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের জন্য যথেষ্ট সময় নিয়ে থাকে। একক ভাবে কেউ কোনও এক সিদ্ধান্তে আসতে অক্ষম থাকে। এতে [গতির যুগে] বিলম্বের কারণে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়। এজন্য এ ধরনের মালিকদিগেরও অংশীদারী কোম্পানি সমূহের মত ব্যবসায়ে সিদ্ধান্ত নেবার ভার জনৈক নিরপেক্ষ দক্ষ ম্যানেজারের উপর অর্পণ করা ভালো।

উপরোক্ত কারণে বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাতে বিশেষজ্ঞ-মন্য ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক [নিয়ামক] নিয়োগের প্রয়োজন হয়। আজ বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট একটি বিশেষ বিজ্ঞানের পর্যায়ে এসে পৌঁছিয়েছে। মালিকগণ এবং ডিরেকটরগণ তাঁদের প্রতিষ্ঠান সমূহে অভিজ্ঞ ম্যানেজার নিয়োগ করে থাকেন। এঁদের অভিজ্ঞতা এবং সততা ও দক্ষতার উপর উদ্যোগ-শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। এঁদের সকলের টেকিনিসিয়ান না হলেও চলে। কিন্তু ঐ টেকনিসিয়ানদের চালাবার ক্ষমতা তাঁদের থাকা চাই। এক কথাতে এঁদের—সামথিঙ্ অব এভরিথিঙ্ এবং এভরিথিঙ অব সামথিঙ্ জানা চাই। ডিরেকটর ও মালিকগণ তাঁদের অযোগ্য সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যবর্গকে প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান পদে বহাল করলে এঁদের ব্যবস্থাপনাতে

অসুবিধা ঘটে। এইজন্য এঁদের নিজেদের ফ্যাকটরিতে নিজেদের আত্মীয়দের নিয়োগ না করাই ভালো।

বড়ো বড়ো ফ্যাকটরিতে ম্যানেজারদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পূর্ব কালের লাট-বেলাটের মত। উদ্যান সমেত বৃহৎ বাঙলো বাড়ি বাসের জন্য বিনা ভাড়ায় এঁরা পেয়ে থাকেন। এঁদের ব্যবহারের জন্য কোম্পানির খরচাতে কোম্পানির যানবাহন সর্বদা মজুত থাকে। কোম্পানির লোকলস্কর এঁদের পাচক, চাকর, বেয়ারা ও মালী প্রভৃতির কাজ করে। এঁদের উচ্চ হারের বেতন [ন্যূনতম মাসিক চারি হাজার টাকা] সত্যই লোভনীয়। বহুক্ষেত্রে এঁদের ইনকাম-ট্যাক্সও কোম্পানি দিয়েছেন। এই সব কারণে জাতি এঁদের নিকট যথেষ্ট আশা করে। কিন্তু ব্যবস্থাপনাতে তাঁরা যতই অভিজ্ঞ হউন না কেন, তাঁদেরও প্রয়োজন মত ব্যবস্থাপনাতে টেকনিসিয়ান ও মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। কারণ, আপাত দৃষ্টিতে তাঁরা যা ভালো মনে করেন, আখেরে দেখা গিয়েছে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তা ভালো হয়নি। নিম্নের দৃষ্টান্ত হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যক্ রূপে বুঝা যাবে।

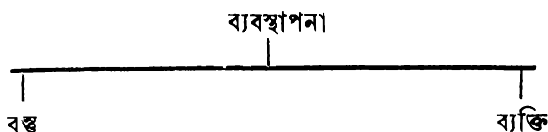
"কোনও এক ম্যানেজার তাঁর ফ্যাকটরির অর্ধেক শ্রমিক ছাঁটাই করে দিলেন। এতে দেখা যায় যে কোম্পানির বহু অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। এর পর বাকি লোকদের বলা হয় যে উত্তম কাজ না দেখালে তাদেরও চাকুরি যাবে। এই ব্যবস্থাতে দেখা যায় যে দ্রব্যোৎপাদন যথেষ্ট সংখ্যক বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে ম্যানেজার বাবু যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তাঁর এই ব্যবস্থার ফলাফল দেখে মালিকরা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বেতন বৃদ্ধি করেন। কিন্তু কিছু কাল পরে দেখা যায় যে ক্রমশঃ দ্রব্যের

উৎপাদন কমে আসছে। উপরন্তু উৎপাদিত বাতিল দ্রব্যের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়। এর ফলে ফ্যাকটরির লোকসানের মাত্রা অত্যধিক রূপে বেড়ে উহা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়।"

ম্যানেজারের উপরোক্ত ব্যবস্থা বিজ্ঞানোচিত ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম দিকে ফ্যাকটরিতে উৎপাদন বাড়ে। তৎসহ সেখানে দ্রব্যাদির প্রোডাকশন্ কস্ট্‌ও যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। কিন্তু সমীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, উহার অন্য কারণ আছে। প্রথমতঃ সেখানে মাত্র অদক্ষ ও অলস কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এদের এইখানে কর্মে নিয়োগ করাই উচিত হয় নি। অর্ধেক লোকের চাকুরি লোপ বাকি অর্ধেক লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করে। ফলে, তারা প্রাণপণে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করে। উপরন্তু বাড়তি ভাতার প্রস্তাবও তাদেবকে প্রলুব্ধ করে। এইভাবে সাধ্যাতীত বিশ্রামবিহীন পরিশ্রম পরিশেষে তাদের দেহে কর্মক্লান্তি তথা ফেটিগের সৃষ্টি করে। ফলে, উৎপাদনের এই সাময়িক বর্ধিত হার ধীরে ধীরে কমে আসে। পরে কয়েকজন নূতন দক্ষ শ্রমিককে কর্মে নিয়োগ করে এই ফ্যাকটরিকে পুনরায় চালু করা গিয়েছিল।

ফ্যাকটরির ব্যবস্থাপনা প্রধানতঃ সংগঠন মূলক [অরগানাইজড্] হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনার দ্বারা ফ্যাকটরিতে করণীয় মূল করনিক প্রভৃতি কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা ব্যতিরেকে উহার বিভিন্ন শাখার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন ব্যবস্থাপনার অন্যতম কার্য। কিন্তু উহার সাথে সাথে শ্রমিক-বিক্ষোভ নিবারণও ব্যবস্থাপনার অন্যতম কার্য রূপে বিবেচিত হয়। ফ্যাকটরির প্রাণ স্বরূপ কর্মরত শ্রমিকদের আয়ত্তের [লেবার কণ্ট্রোল] মধ্যে না রাখতে পারলে ফ্যাকটরির কার্য চালানো

অসম্ভব। বস্তু ও ব্যক্তি সম্পর্কিত দ্বিবিধ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপকদের করতে হয়।



বর্তমান নিবন্ধের প্রথমাংশে আমি উহার ব্যক্তি সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করবো। উহার দ্বিতীয়াংশে আমি বস্তু সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই উভয় সম্পর্কিত বিষয়ের বিলি-ব্যবস্থা করার জন্যে ফ্যাকটরিতে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই দ্বিবিধ বিষযের পরিচালনের জন্যে সেখানে সুদক্ষ ম্যানেজার তথা ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন হয়।

(ক) ব্যক্তি: প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান উহার ম্যানেজার বা মালিক দ্বারা পরিচালিত হয়। কয়েক ক্ষেত্রে এঁদের উপদেশ দেবার জন্য [একাধিক] উপদেষ্টা থাকে। এঁরা আশা করেন যে এঁদের ব্যবস্থাপনা মত শ্রমিকগণ কাজ করে যাবে। স্বল্প কালে ও সুলভে অধিক উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন এঁদের ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু যুদ্ধকালীন জাতীয় বিপাক না হলে ফ্যাকটরিতে সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকরা ব্যস্ত হয় না। বরং এখানে তারা নিজেদের সুখ-সুবিধা ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে অধিক সচেতন থাকে। এদের পরিবার প্রতিপালন এবং স্বচ্ছন্দ জীবন নির্বাহ করার

চিন্তা এদের মনে সর্বাগ্রে আসে। এইখানে মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ বিভিন্নমুখী হয়ে সংঘাতের সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রায়ত্ত বা ব্যক্তিগত মালিকানা কিংবা সমবায় প্রতিষ্ঠান—যে কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি তাদের ব্যবসায় কিংবা উদ্যোগ-শিল্পের মালিক হোক তাদের নিজেদের সেই সকল ফ্যাকটরি পরিচালনার ভার নিজেদের স্কন্ধে তুলে নিতে হবে ; কিংবা উহার জন্য তাদের কোনও এক অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ম্যানেজারকে নিযুক্ত করতে হবে। উহা কোনও ক্রমেই শ্রমিকদের বা শ্রমিক-সঙ্ঘের হস্তগত হওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকরা ম্যানেজমেণ্টের স্বৈরাচারী ব্যবস্থাপনা প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু কোনও ক্রমেই তারা ম্যানেজমেণ্টের ভার নিজেরা নিতে পারে না। এর কারণ ব্যবস্থাপনা করার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অর্থ তাদের থাকে না। প্রায়ই শুনা যায় যে শ্রমিক প্রতিনিধিদের ব্যবস্থাপনাতে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু বহু খ্যাতনামা ট্রেড্ ইউনিয়ন নেতা নিজেরাই উহার বিরোধী। তাঁদের মতে ম্যানেজমেণ্টে অংশ গ্রহণ করলে শ্রমিক স্বার্থ দেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তারা মালিক পদবাচ্য হলে কার্যকালে তাদের দোদুল্যমান চিত্ত কিং-কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সেখানে মালিক পক্ষীয় ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ সংখ্যাগুরু এবং শ্রমিক পক্ষীয় প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘু। এই অবস্থাতে তারা সেখানে শ্রমিকদের কোনও উপকার সাধনে অপারক। অধুনাকালে [কুটীর-শিল্প ব্যতিরেকে] উদ্যোগ-শিল্পসমূহ কম ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত মালিকানাতে পরিচালিত হয়। এই সব কোম্পানিতে [শ্রমিক অপেক্ষা বহু গুণে দরিদ্র] করনিক,টাইপিস্ট, দোকানদার, বেয়ারা প্রভৃতি অসংখ্য শেয়ার-হোল্ডার [অংশীদার] থাকে। এরা নিজেরা এই সব ব্যবস্থাপনাতে সক্রিয় অংশ নিতে অক্ষম। এর ফলে উহাদের পরিচালক

স্বরূপে নিরপেক্ষ [টেকনিক্যাল] ম্যানেজারদের প্রয়োজন হয়। পূর্বকালের মূলধন-নিয়োগী ক্যাপিটেলিস্ট সংজ্ঞার মানুষের সংখ্যা আজিকার যুগে স্বল্প হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক কারণে মালিক ও শ্রমিকের যৌথ ব্যবস্থাপনার বহু শ্লোগান পথে-ঘাটে শুনা যায় বটে, কিন্তু ঐ সকল শ্লোগানের [ধ্বনি] মধ্যে কোনও অন্তঃ-সার আছে বলে মনে হয় না। এখানে কাঁচা মাল ও প্রয়োজনীয় অর্থাদি সংগ্রহ,উচিত মূল্যে দ্রব্য ক্রয় ও উহার বিক্রয়-ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি সরবরাহ ও উহার মেরামতি কার্য এবং সর্বোপরি লাভ লোক-সানের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আছে। এখানে ফ্যাকটরিতে বর্তমান কালীন উৎপাদনের ব্যয়ের সহিত উহার ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মজুত রাখতে হয়। শ্রমিকরা অধিক উৎপাদন করার জন্যে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে, কিন্তু সেই অনুপাতে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করতে না পারলে ঐ প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থাতে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শ্রমিকের ভাত-ভিত্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। [সমাজতান্ত্রিক দেশেও শ্রমিকরা শ্রমিক নিযুক্ত করে না। এই দুরূহ দায়িত্ব তৎ তৎ দেশীয় সরকার বহন করে থাকেন।] এই কারণে শ্রমিক-সংস্থার দায়িত্বশীল নেতারা এই প্রকার দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণ ও বহন বাতুলতা বলে মনে করেন। তাঁদেরও সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এক শ্রেণীর টেকনিক্যাল জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের হস্তে উদ্যোগ-শিল্পের ব্যবস্থা-পনার ভার থাকা উচিত। অন্যথায় মালিক ও শ্রমিক উভয়কে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এই সকল কারণে ফ্যাকটরিতে সুদক্ষ ম্যানেজার নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্র দ্বারা স্বীকৃত।

ফ্যাকটরির ম্যানেজারগণ অবশ্য মালিকদের স্বার্থরক্ষা করতে বাধ্য। অন্যদিকে শ্রমিকদের সীমিত স্বার্থরক্ষার জন্যে ট্রেড্ ইউনিয়ন আছে।

শ্রমিকরা জানে যে লাভ করার জন্যে মালিকরা মূলধন নিয়োগ করে। তাদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ তারা ঐ লভাংশ হতে নিজেদের জন্য একটি অংশ চায়। উপরন্তু তারা মালিকদের কাছে সদ্ব্যবহার ও বহু প্রকার সুখ-সুবিধা আশা করে। ম্যানেজমেণ্টের ব্যবস্থাপনাতে শ্রমিকদের অসুবিধা হলে উহা তারা বাতিল বা পরিবর্তন করাতে সচেষ্ট হয়। বহু ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির কারণে এইরূপ বিরোধ বাধে। এজন্য নূতন ব্যবস্থাপনা করার পূর্বে উহার অন্তর্নিহিত [সৎ] উদ্দেশ্য শ্রমিকদের বুঝানো উচিত। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে বহু ম্যানেজার ইহা নিষ্প্রয়োজন মনে করে থাকেন। শ্রমিকদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিই এই জন্য দায়ী থাকে। সাধারণতঃ ম্যানেজারগণ শ্রমিকদের প্রতি ব্যবহারে নিম্নোক্তরূপ তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হন।

(১) কোনও কোনও ম্যানেজার শ্রমিকদিগকে তাঁদের বেতনভোগী ভৃত্য বলে মনে করে থাকেন। এঁদের কেহ শ্রমিকদের ইচ্ছামত নিয়োগ ও ইচ্ছামত বরখাস্ত করার পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন যে তাদের অভাব-অভিযোগ শুনা বা না শুনা তাঁদের ইচ্ছা। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধনের কোনও দায়-দায়িত্ব তাঁদের নেই। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, তাঁরা মানবতার উপর সংস্থাপিত কল্যাণ-রাষ্ট্রের নাগরিক। দেশের প্রধান স্তম্ভ শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধনে সরকারকে সাহায্য করা তাঁদের এক পবিত্র কর্তব্য কর্ম।

(২) কোনও কোনও ম্যানেজার এই সকল শ্রমিকদের সাথে নাবালক বালকদের মত ব্যবহার করার পক্ষপাতী। পিতামাতা নাবালক পুত্র কন্যাকে অনুকম্পা করেন। তেমনি এঁরা শ্রমিকদের নির্বোধ বুঝে তাদের সাথে অভিভাবক সুলভ ব্যবহার করেন। এঁদের

ধারণা যে শ্রমিকরা নিজেদের ভালোমন্দ বুঝতে অক্ষম। অতএব তাঁহাদের মতানুসারে তাদের চলা উচিত।

(৩) কোনও কোনও ম্যানেজার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শ্রমিকদের সাথে কথোপকথনের পক্ষপাতী। বর্তমান যুগের অমোঘ নির্দেশ তাঁরা পুরাপুরি মেনে চলতে চান। এঁরা জানেন যে, মালিক ও শ্রমিকদের স্বার্থ বিভিন্ন হতে বাধ্য। এঁরা উভয়ে একত্রে খাদ্য তথা রুটির আয়তন বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। কিন্তু উহার বণ্টন ব্যবস্থাতে তাঁদের যা কিছু মতভেদ। এইখানে লেনদেনের হিসাবে একটি মধ্যপন্থা উভয়েই গ্রহণ করতে বাধ্য।

উপরোক্ত তিনটি মতের মধ্যে শেষ মতটি ম্যানেজারদের মনে-প্রাণে গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় অযথা শ্রমিক বিক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে। উদ্যোগ-শিল্পে মালিক পক্ষে মালিক-সংস্থা এবং শ্রমিক পক্ষে শ্রমিক-সংস্থা [য়ুনিয়ন] পরস্পরের স্বার্থ দেখে। এই জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ম্যানেজারদের চালিত হওয়া উচিত। ম্যানেজমেণ্ট ও শ্রমিক-সংস্থা সুবিবেচক ও প্রগতিশীল হলে মধ্যপন্থা গ্রহণ [উভয়ের গ্রহণীয়] সম্ভব হয়। বহুক্ষেত্রে শ্রমিক-নেতারা শ্রমিকদের অভিযোগ অন্যায় বুঝেও মালিকদের সহিত কলহের সূত্রপাত করেন—এইরূপ বহু বিষয় উদ্যোগ-শিল্পের ম্যানেজারের মুখে শুনেছি। কিন্তু তাঁদের ঐ সকল শ্রমিক-নেতার মুখের ভাষার বদলে তাঁদের অন্তরের ভাষা বুঝবার চেষ্টা করা উচিত। অভিজ্ঞ ম্যানেজারগণ ভালো রূপেই জানেন যে জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্য নিষ্প্রয়োজনে তাঁরা ঐ ভাবে কথাবার্তার সূচনা করতে বাধ্য হয়ে থাকেন। অন্যথায় বিরোধী পক্ষীয় শ্রমিক সংস্থাগুলি নানা অজুহাতে তাঁদের চরম অসুবিধাতে

ফেলে তাঁদের নেতৃত্ব কেড়ে নিতে পারে। একমাত্র শ্রমিকদের শিক্ষার প্রসারের পর এই অসহনীয় অবস্থা হতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। এই অবস্থার প্রতিকারার্থে ম্যানেজারদের প্রবীণ শ্রমিক-দের শ্রমিক-সঙ্ঘের কাজে নিযুক্ত হতে উৎসাহিত করা উচিত। কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে এই সব বিষয়ে তাঁরা তাঁদের নিরুৎসাহ করে থাকেন। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি দরদহীন বহিরাগত রাজনৈতিক নেতাদের আগমন সহজ হয়।

কেহ কেহ অবশ্য এও বলে থাকেন যে ভিতরের লোকেদের [কর্মিগণ] পক্ষে বাহিরের লোকের মত নির্ভীকতার সাথে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব নয়। উহা সম্ভব হলে আভ্যন্তরিক শাসন-ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে পরবর্তী কালে [বিসংবাদ মিটে যাওয়ার পর] ঐ ফ্যাকটরিতে পূর্বের মত কাজ-কর্ম করা তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়। অধুনা শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে বহু শ্রমিক-আইন জড়িত আছে। ঐ জটিল আইন বুঝে শ্রমিকদের পক্ষে স্বাধীন ভাবে সমস্যা সমাধান করা দুষ্কর। এর ফলে আইন-অভিজ্ঞ দরদী শ্রমিক-নেতাদের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

শ্রমিকদের প্রতিভূ শ্রমিক-নেতাদের অগ্রাহ্য না করে তাদের সাথে ম্যানেজমেণ্টের প্রতিভূদের মধ্যে মধ্যে একত্রে বৈঠকে বসে বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে খোলা-খুলি ভাবে আলাপ-আলোচনা করা উচিত। কিন্তু তার জন্যে পূর্ব হতে একটি ঘরোয়া বৈঠকে উভয় পক্ষের গ্রাহ্য কয়েকটি সহজ পন্থা তৈরি করে নিলে সুবিধা হয়। এতে বিতর্কের গণ্ডি স্বল্পায়তন হওয়ায় মুহুর্মুহু বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রমিকদিগকে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের স্বীকৃত বিষয়

বুঝানো শ্রমিক-সংস্থার দায়িত্ব। এই জন্যে প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকদের প্রতিভূ এইরূপ এক শক্তিশালী য়ুনিয়নের প্রয়োজন আছে। কোনও শিল্প-প্রতিষ্ঠান লোকসানেতে বন্ধ হয় তা কোনও শ্রমিক নেতা কামনা করেন না। এতে তাঁদের নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে। এই জন্য এঁদের বিশ্বাস করে এঁদের সহযোগিতা কামনা করা উচিত।

. শ্রমিক য়ুনিয়নগুলি প্রায়ই অদল-বদল হয়ে থাকে। পুরানো য়ুনিয়নের পরিবর্তে নূতন য়ুনিয়নের সৃষ্টি হয় এবং প্রায়ই উভয় য়ুনিয়নের কর্মধারার মিল থাকে না। নূতন য়ুনিয়নের সাথে এই-রূপ যুক্ত বৈঠক প্রয়োজন ব্যতিরেকে বারে বারে বসালে অ্যাজেণ্ডা তৈরির কালে অকারণে নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবে পুরানো শ্রমিক-সংস্থার সাথে ঐরূপ বৈঠকে বারে বারে মিলিত হলে ক্ষতি হয় না। প্রতিদিন ব্যক্তিগত অভিযোগ অনুধাবন করার মত সময় ও ধৈর্য ম্যানেজারদের থাকে না। এই সকল কার্য লেবার অফিসার বা ওয়েলফেয়ার অফিসার বা পারসোন্যাল অফিসাররা করে থাকেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সকল অভিযোগ ঐ সকল বৈঠকে প্রেরণ করা উচিত নয়। এইগুলির সত্যাসত্য সম্বন্ধে লেবার অফিস দ্বারা প্রথমে তদন্ত হওয়া উচিত।

শিল্পে শান্তি রক্ষা করতে হলে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত অভি-যোগ এড়ানো উচিত নয়। একই অভিযোগ বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হলে উহার কুফল সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠে। এই সকল বিবাদ ঘটনা-স্থলে ধৈর্যের সাথে মীমাংসা করা উচিত। এতে ফ্যাকটরির বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এতে বাহিরের লোকের হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকে না। কিন্তু এই সুবিচার সত্বর বিতরণ

করতে হবে। তা না হলে উহা অযথা বহু প্রকার গুজবের সৃষ্টি করে। বহু শ্রমিক তাদের পর পর উর্ধ্বতন অফিসারদের নামধাম ও দপ্তরের খবর রাখে না। এ বিষয়ে তাদের শিক্ষিত করলে এরা তাঁদের নিকট পর পর আপিল করতে পারে। এতদ্বারা তাদের মনের ক্ষোভ হাল্কা হয় ও তাদের যখন-তখন য়ুনিয়নের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। এই সকল অভিযোগ মীমাংসা কালে কানুনের দোহাই পাড়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই স্থলে কানুনের উল্লেখ না করে সহানুভূতির সহিত শ্রমিকদের প্রতিটি অভিযোগ বিবেচনা করা উচিত। এখানে আইনের ওআর্ডিং [ভাষা] নিয়ে মাতামাতি না করে উহার স্পিরিট্ [উদ্দেশ্য] গ্রহণ করতে হবে।

বড় বড বাদ-বিসংবাদ ও দাবি-দাওয়ার মীমাংসা কল্পে মালিক-পক্ষীয় ব্যক্তিদের শ্রমিক-সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দের সাথে একত্রে বৈঠকে বসতে হয়। এখানে শ্রমিক-নেতারা শ্রমিক পক্ষের মতামত জানাতে সক্ষম। কিন্তু মালিক পক্ষের [প্রেরিত] প্রতিভূকে বহু বিষয়ে বারে বারে মালিকের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে প্রতিভূ না করলে সে অপর পক্ষের শ্রদ্ধা হাবায়। এই-জন্য মালিক পক্ষ কতদূর ক্ষতি সহ্য করবে তা তাদের প্রতিভূদের পূর্বাহ্ণে জেনে রাখা দরকার। এইরূপ বৈঠকে উভয় পক্ষ পারস্প-রিক সুবিধা আদায়ে [কলেকটিভ বারগেইন] সচেষ্ট থাকে। এখানে মালিক পক্ষ কম ব্যয়ে অধিক দ্রব্যোৎপাদন করতে চায়। কিন্তু শ্রমিক পক্ষ তদনুযায়ী তাদের উপযুক্ত বেতন বৃদ্ধি দাবি করে। মালিক-পক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা স্থাপনে ব্যগ্র থাকেন। শ্রমিক পক্ষ তাদের চাকুরির উন্নতি ও উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন। মালিক পক্ষ তাদের চাকুরিতে পদোন্নতির জন্য দক্ষতাকে প্রাধান্য

দিয়ে থাকেন। কিন্তু শ্রমিক পক্ষ উহার জন্য সিনিয়রিটির উপর নির্ভর করতে চান। এই সকল পরস্পর বিরোধী মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন একটি সুকঠিন কাজ। এইখানে মালিক পক্ষের বুঝা উচিত যে শ্রমিক পক্ষের একত্রিত হয়ে সুবিধা আদায়ের অধিকার আছে। শ্রমিক পক্ষের বুঝা উচিত যে সুঠাম ব্যবস্থাপনা দ্বারা প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করা মালিক পক্ষের পবিত্র কর্তব্য।

এই প্রকার বৈঠকে তিক্ততা বা উত্তেজনা উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিদের সাবধানে এড়াতে হবে। এজন্য আলোচনা কালে এদের সংযত ভাষা ব্যবহার করতে হবে। মীমাংসার আশা নির্মূল হওয়ার পরও তাদের বহুক্ষণ কথাবার্তা চালানো উচিত। এতে শেষবেশ ক্লান্ত হয়ে উভয় পক্ষ একটা সুমীমাংসাতে আসে। কোনও বিতর্কমূলক বিষয়ে কলহ হলে তখনকার মত উহা মুলতুবি রেখে একটি বিতর্কবিহীন বা কম সমস্যা সঙ্কুল বিষয়ের মীমাংসা আগে করা উচিত। এই ভাবে বহু বিষয় [অধিকাংশ] সহজে মীমাংসা হওয়ার পর ঐ মুলতুবি রাখা বিষয়টিরও শেষ পর্যন্ত সুমীমাংসা হয়। পূর্বাহ্ণে বৈঠকে আলোচ্য বিষয় [অ্যাজেণ্ডা] নির্ধারিত করা থাকলে উহার বহির্ভূত বিষয় অবলম্বন করে অকারণে কোনও কলহের সৃষ্টি হয় না।

এইরূপ যুক্ত বৈঠকে বিচার্য বিষয়গুলির মীমাংসা স্বল্পমেয়াদী না করে দীর্ঘমেয়াদী করা হলে ঐ স্বল্প সময়ের অবসানে শ্রমিকে-মালিকে পুনরায় কলহের সৃষ্টি হয়নি। মালিক পক্ষ শ্রমিক নেতাদের নিকট প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব দাখিল করলে ঐ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা শ্রমিকরা বিবেচনা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঘাটতি দেখলে শ্রমিকরা তাদের বেতন

বৃদ্ধি দাবি প্রত্যাহার করে থাকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যা পেশ না করলে ভুল বুঝাবুঝির মাত্রা বেড়ে গিয়ে থাকে। এই-রূপ বৈঠকের আগে উভয় পক্ষের একটি স্থিতাবস্থা [status-quo] রক্ষা করার একটি চুক্তি করা উচিত। ফ্যাকটরি সমূহের বর্তমান আয় বাদে যা ব্যয় হয়, তদপেক্ষা ভবিষ্যতে উহার আয় বাদে ব্যয় কমে বা বেড়ে যেতে পারে। ভবিষ্যতে ফ্যাকটরির নীট্ আয়ের বাড়া বা কমা সম্বন্ধে মালিকদের একটি সঠিক ধারণা থাকা উচিত। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মিটাবার কালে ঐ বিষয় মালিকরা বিবেচনা করতে বাধ্য। ইহার অন্যথা হলে ঐ সহ্যাতীত ব্যয়ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানটি একদিন উঠিয়ে দিতে হতে পারে। বহু মালিক সাময়িকভাবে বহু জটিল বিষয় তাড়াতাড়ি মেটাতে পারলে খুশি হন। একবার কারুর দাবি স্বীকার করে নিলে পরে প্রত্যাহার করাতে বিপদ ঘটতে পারে। তাঁদের স্মরণ রাখতে হবে যে মহরম বা ঈদের ছুটি উপলক্ষে তাঁরা যে যে বিষয় স্বীকার করলেন তা পরবর্তীকালে পূজার সময়েও নথিভুক্ত পূর্ব দৃষ্টান্ত অনুযায়ী তাঁদের স্বীকার করানোর জন্য চাপ আসবে। একটি বিষয়ের সাথে অপরটির অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ থাকাতে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত সব কয়টি বিষয় একত্রে তাঁদের বিবেচনা করা উচিত হবে। অন্যথায় সামান্য একটি স্ব-রোপিত অঙ্কুর হতে ভবিষ্যতে বিরাট এক আপদ বৃক্ষের সৃষ্টি হতে পারে।

শ্রমিক-সঙ্ঘ [য়ুনিয়ন] ব্যতীত ওআর্কার্স কমিটি নামে একটি সংস্থা ১৯৪৭ সনের ইনডাসট্রিয়াল অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতিটি ফ্যাকটরিতে স্থাপিত হয়েছে। ফ্যাকটরি ম্যানেজার এবং লেবর অফিসার যথাক্রমে উহার প্রেসিডেন্ট্ ও সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ফ্যাকটরির বিভিন্ন বিভাগ

হতে নির্বাচিত [কর্মরত] শ্রমিক-প্রতিনিধি সহ ফ্যাকটরি-বিভাগীয় কর্মকর্তারা উহার সদস্য। এই কমিটিতে যোগ দিতে মালিক-পক্ষ আইনতঃ বাধ্য আছেন। এই কমিটিতে শ্রমিকদের অভিযোগাদির মীমাংসা করা হয় এবং সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রমিকদের মতামতও গ্রহণ করা হয়। ফ্যাকটরিতে প্রতিমাসে একটিবার এই কমিটির অধিবেশন হয়।

শ্রমিকদের নিজেদের সুগঠিত য়ুনিয়ন থাকা সত্ত্বেও এই ওআর্কার্স কমিটির উপকারিতা অসামান্য। এখানে মালিক পক্ষ প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রমিকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন এবং উহা কোনও রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। যে সকল উদ্যোগ-শিল্পে একাধিক শ্রমিক য়ুনিয়ন আছে সেইখানে এইরূপ একটি সংস্থার প্রয়োজন সর্বাধিক। পরস্পর বিরোধী শ্রমিক-য়ুনিয়ন সমূহের কলহ জর্জরিত মূলতুবি বিষয়ের শেষ মীমাংসা এই ওআর্কার্স কমিটির দ্বারা সমাধা হতে পারে। এই ওআর্কার্স কমিটিতে ফ্যাকটরির ম্যানেজার সমেত প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানের উপস্থিত থাকা উচিত। এই ওআর্কার্স কমিটিতে ফ্যাকটরির প্রতিটি শ্রমিক য়ুনিয়নের [পার্টির] লোক থাকে। এদের কথাবার্তা হতে এদের পরস্পর বিরোধী য়ুনিয়নগুলির মতিগতি ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রমিক য়ুনিয়নের এক্তিয়ার ভুক্ত কোনও বিষয় এই ওআর্কার্স কমিটিতে উত্থাপন করা কখনও উচিত হবে না। বহু ম্যানেজার এই ওআর্কার্স কমিটিতে যোগদান সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করেন। এঁদের কেহ কেহ সেখানে অযথা শ্রমিকদের মতবাদ খণ্ডন করে থাকেন। উহা না করে পূর্ব ওআর্কার্স বৈঠকে শ্রমিকদের উত্থাপিত বিষয়-গুলি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে তা পরবর্তী ওআর্কার্স কমিটির বৈঠকে

শ্রমিকদিগকে তাঁদের জানানো উচিত। এতে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক মধুরতর হয়ে উঠে।

[ওআর্কার্স কমিটিতে ফ্যাকটরির বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত না থাকলে তাঁদের বিভাগ সম্বন্ধে কি কি বিষয় আলোচনা হয়েছে তা তাঁদের গোচরে আনা লেবার অফিসার বা পারসোন্যাল অফিসার-এর অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় ঐ সকল বিভাগীয় কর্মকর্তারা তাঁদের এক্তিয়ার ভূক্ত বিষয় তাঁদের পিছনে আলোচিত হয়েছে বুঝে ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। তাঁদের অধীন বিভাগ সম্বন্ধে শ্রমিকদের মতামত তাঁদের সর্বাগ্রে জানা দরকার।]

আর্কার্স কমিটিতে যোগদানের পূর্বে মিলের ম্যানেজার ও উহার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের একটি পৃথক [ঘরোয়া] বৈঠকে মিলিত হওয়া উচিত। এইখানে তাঁদের নীতি [পলিশি] পূর্বাহ্ণে নির্দিষ্ট করে ওআর্কার্স কমিটিতে যোগদান করা শ্রেয় হবে। উপরন্তু এই পৃথক বৈঠকে তাঁরা নিজেদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বহু ভুল-ভ্রান্তি আলোচনা দ্বারা শুধরে নিতে পারেন ; এইখানে শ্রমিকদের সম্পর্কে তাঁদের পরবর্তী কর্মপদ্ধতি ঠিক করে নেওয়া যায়।

ওআর্কার্স কমিটির কার্যবিবরণী [ওদের ভাষাতে] মুদ্রিত, টাইপড্ বা লিথো করে শ্রমিক সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা উচিত। এতদ্বারা এই কমিটিটির মর্যাদা রক্ষা করা যায়। অন্যথায় শ্রমিকরা মনে করতে পারে যে তাদের নেতাদের মালিক পক্ষ তাঁদের তাঁবেদার তৈরি করেছে। কোনও শ্রমিক য়ুনিয়নের সদস্য না-হওয়া শ্রমিকরা এই কমিটিকে তাদের নিজেদের সংস্থা মনে করে থাকে।

কর্মশালা সমূহের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত পারসোন্যাল ম্যানেজমেণ্ট একটি পৃথক ব্যবস্থাপনা। এই মানবীয়

ব্যবস্থাপনার ভার সাধারণতঃ লেবার অফিসার, পারসোন্যাল অফিসার বা ওয়েলফেয়ার অফিসার নামক জনৈক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। সম্প্রতি কালে রাষ্ট্রীয় সরকার শিল্পপতিদিগকে তাঁদের প্রতিটি ফ্যাকটরিতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের ঐরূপ পদে নিয়োগ আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করেছেন। এঁরা মালিকদের বেতনভূক্ হলেও এঁরা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সংযোগকারী কর্মী রূপে কাজ করেন। শ্রমিকরা এঁদের কাছ হতে বহু বিষয়ে সহায়তা লাভের আশা করে থাকে। বহু ক্ষেত্রে এঁদের শ্রমিকদের পক্ষেও কথা বলবার প্রয়োজন হয়। ইনি ফ্যাকটরির খোদ বড়ো ম্যানেজার ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির অধীন নন। ম্যানেজারকে যন্ত্রাদি ও কাঁচা মাল সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারগণ আছেন। যে মানুষ এই যন্ত্র চালাবে ও দ্রব্যাদি উৎপাদন করবে তাকে বুঝবার ভার এই লেবর অফিসারদের উপর ন্যস্ত। এই লেবার অফিসার বা পারসোন্যাল অফিসারগণ [শ্রমিক] মানুষ সম্পর্কিত রীতিনীতি সম্বন্ধে সুপরামর্শ দেন। আইনানুযায়ী এই লেবর অফিসারের উপর শ্রমিক ভর্তি ও তাদের বরখাস্ত করার ভার আছে। একমাত্র ম্যানেজার ও লেবর অফিসার ব্যতিরেকে কোনও শ্রমিককে অন্য কেহ বরখাস্ত করতে পারে না। এমন কি, ম্যানেজারেরও এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে লেবার অফিসারের মত নেওয়া উচিত। কারণ, প্রতিটি শ্রমিকের দক্ষতার পৃথক পৃথক মূল্যায়নের ভার এই লেবর অফিসারের উপর ন্যস্ত থাকে। এক বিভাগের কর্মকর্তার সাথে বনিবনা না হলে তাকে অন্য বিভাগের কর্মকর্তার অধীনে বদলি করার অধিকার আছে। কার্যক্ষেত্রে অনুরূপ] শ্রমিকদের প্রতি সুবিচারের জন্য এইরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এই লেবর অফিসারগণ শ্রমিকদের

অভাব-অভিযোগ শুনে তার প্রতিকার করেন এবং তদুপরি শ্রমিকদের ক্যান্টিন পরিচালনা, আমোদ-প্রমোদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বিধির প্রচলন ও কুলি লাইনের [আবাস] সুব্যবস্থার ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত।

[এই সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেবর অফিসার কর্তৃক প্রেরিত শ্রমিকদিগকে ফ্যাকটরির বিভাগীয় কর্ম-কর্তারা অনুপযুক্ত—এই অজুহাতে গ্রহণ না করে নিজেদের মনোনীত ব্যক্তি গ্রহণ করে থাকেন। ফ্যাকটরির বিভাগীয় কর্মকর্তার অভিযোগ অনুযায়ী লেবর অফিসারকে শ্রমিকদের বরখাস্ত মেনে নিতে বাধ্য হতে হয়। প্রায় দেখা যায় যে কেহ এক বিভাগে উপযুক্ত বিবেচিত না হলেও অন্য এক বিভাগে সে উপযুক্ত হয়। কিন্তু এইরূপ অদল-বদল দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষমতা কোনও লেবর অফিসারের নেই। নথিপত্র সংরক্ষণ এবং ছুটির হিসাব রাখা ও অন্যান্য শ্রমিক-সম্পর্কিত করনিক কার্যে তাঁকে অধিক সময় নিয়োগ করতে হয়। একমাত্র শ্রমিকদের খেলা ও আবাস নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত অন্য বিষয়ে তাঁদের কার্যতঃ স্বাধীনতা নেই। আমি বরং তাঁদেরকে প্রতিটি বিষয়ে ম্যানেজারদের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে দেখি। এঁদের বেতনের ক্রমিক বৃদ্ধির কোনও নিয়ম সরকার বেঁধে দেন নি। এঁদের সকল ক্ষেত্রে ম্যানেজারদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। তাই যে উদ্দেশ্যে লেবর অফিসারের পদের সৃষ্টি তা আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এঁদের অবস্থা আজ যাত্রাদলের বাবার বা রাজার মতন। এঁদের দ্বারা শ্রমিকদের খুব বেশি উপকার হয় ব'লে মনে হয় না।]

লেবর অফিসারগণকে লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞ দরদী অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব পূর্ণ মানুষ হতে হবে। এই সকল গুণ না থাকলে তাঁরা

শ্রমিকদের আস্থাভাজন হতে পারেন না। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে হৃদ্যতা রক্ষার ভার এই ভদ্রলোকের উপর ন্যস্ত আছে। এঁদের সৎ, কর্মকুশল, কর্মে আগ্রহী, ভাষাবিদ্, ধৈর্যশীল, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে শ্রমিকরা এঁদের নিকট হতে নিরপেক্ষতার আশা করে। কেহ কেহ চাহেন যে গভর্নমেণ্ট হতে এঁদেরকে নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু দ্বৈত শাসনের কুফল বিবেচনা করে উহা কারুরই কাম্য হয় নি। লেবর অফিসারগণ শ্রমিকদের প্রকৃত মনোভাব ও শক্তি সম্বন্ধে মালিকদের অবহিত করে তাদের সুপরামর্শ দিতে পারেন। উভয় পক্ষের বিবাদে মধ্যস্থতা করাও ইঁহাদের পক্ষে সম্ভব। উপরন্তু শ্রমিক বিক্ষোভের মূল কারণ সমূহও এঁরা খুঁজে বার করতে পারেন। এই সকল কারণ এমন প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্তায় যে অনভিজ্ঞ চক্ষে উহা ধরা পড়ে না। এর প্রকৃত কারণগুলি খুঁজে বার করে সময় মত উহাদের যথাযথ বিহিত করলে বহু সমস্যার সমাধান হতে পারে।

আমি শ্রমিক বিক্ষোভের সঙ্গত কারণ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম। আমি নিজে কয়েকটি অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে ইহা অবগত হই। লেবর অফিসারগণ এইরূপ বহু অভিযোগ সরজমিন তদন্ত করে উহাদের অসারতা প্রমাণ করে শ্রমিকদের অশেষ উপকার করতে সক্ষম। কিরূপ অন্যায় ভাবে শ্রমিকদের উৎপীড়ন করা হয় তা নিম্নে আমার সরজমিন তদন্ত লব্ধ তথ্য হতে বুঝা যাবে।

[১] একদিন দুইজন তাঁত কর্মীকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দ্রব্যোৎপাদনে অক্ষমতার অভিযোগে আমার নিকট প্রেরণ করা হয়। আমি প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে তদন্ত করে অবগত হই যে মাত্র দুই দিন পূর্বে

আ হেডের এক ট তাঁত হতে বারো হেডের তাঁতে তাকে বদলি করা হয়েছে। এই নূতন জটিল তাঁতে অভ্যস্ত হবার সুযোগ দান না করে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ আনয়ন করা হয়। আমি তার পর দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে তদন্ত করে জানতে পারি যে, সে পূর্বে মোটা সূতার তাঁত চালিয়ে এসেছে। কিন্তু ঐদিন হঠাৎ তাকে সরু সূতার তাঁতে কার্য করতে বলা হয়। কিন্তু তাতে অভ্যস্ত হবার প্রয়োজনীয় সুযোগ না দিয়ে তার বিরুদ্ধে ঐরূপ অভিযোগ আনা হয়েছে। [এক ঝাঁপের তাঁতেব কর্মীরও দুই ঝাঁপের তাঁতে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে।]

(২) একদিন মালিক পক্ষ থেকে কোনও এক শ্রমিক দলের বিরুদ্ধে ভালো কাজ না করার অভিযোগ আমার দপ্তরে করা হলো। কিন্তু সরজমিন তদন্ত করে দেখা গেলো যে তাদেরকে দুই জন তদারকী কর্মীর আজ্ঞাধীন করা হয়েছে। এই দুইজন কর্মকর্তা এমন পরস্পর বিরোধী হুকুম দেন যে শ্রমিকরা দিশেহারা হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কিন্তু এই সম্বন্ধে সুবিচার না করে তাদেরকে কার্যে গাফলতির অপরাধে চার্জসিট দেওয়া হয়।

(৩) অন্য একটি অভিযোগের তদন্তে আমি জানতে পারি যে কোনও এক বিভাগীয় কর্তা তাঁর অব্যবহিত অধস্তন কর্মীদের পাশ কাটিয়ে তাঁদের অধীন কর্মীদের সরাসরি হুকুম পাঠাতেন। অথচ তাঁর একার পক্ষে নিম্নস্তরের প্রতিটি কর্মীর কার্যে লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়। এর ফলে ঐ বিভাগীয় কর্তা এবং সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যবর্তী কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে কর্তব্যচ্যুত হতে থাকেন। এর ফলে প্রথমে বিশৃঙ্খলা ও পরে সেখানে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

(৪) একদা মালিক পক্ষ হতে অভিযোগ আসে যে, একটি

ফ্যাকটরিতে কর্মীদের কাজ-কর্ম সন্তোষজনক নয়। তাঁদের মতে সেখানে কর্মীদের কাজ-কর্মে মনোযোগ নেই। শ্রমিকদের পাল্টা অভিযোগ ছিল যে তাদের উপর অযথা অত্যধিক [গুরুভার] কর্মের [work load] ভার দেওয়া হয়েছে। সরজমিন তদন্তে দেখা যায় যে শ্রমিকদের প্রদেয় পরিশ্রমে কোনও তারতম্য ঘটে নি। উর্ধ্বতনদের বারে বারে (নিষ্প্রয়োজনে) হস্তক্ষেপ, দ্বৈত তদারকী, যান্ত্রিক দোষসমূহ এবং কাঁচামালের নিকৃষ্টতা প্রভৃতি উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ।

এই তদন্ত দ্বারা প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়া লেবর অফিসারদের অবশ্য কর্তব্য কার্য। আমার মত এইরূপ তদন্ত কার্যের সুবিধা তাঁদের নাও থাকতে পারে। এইরূপ তদন্ত কর্মে ফ্যাকটরির বিভাগীয় কর্তাদের বিরাগ ভাজন হওয়া তাঁদের উচিত হবে না। কোনও বিভাগে তদন্তে এলে তাঁদের সর্বপ্রথম ঐ বিভাগের কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করা উচিত হবে। একটু কায়দা করে তাঁর পূর্বপরিচিত কোনও শ্রমিককে তাঁদের সমক্ষে তিনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন— 'আচ্ছা, তোমার পরিবার এখন কেমন আছেন? তাঁকে কি কোনও এক হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজন আছে?' এইরূপ কথাবার্তা শুনে বিভাগীয় কর্তার লেবর অফিসারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকল সন্দেহ অপসারিত হয়। লেবর অফিসারদের পক্ষে ফ্যাকটরির কোনও বিভাগীয় কর্মকর্তাকে তাঁর নিজের দপ্তরে না ডেকে বরং তাঁর নিজেরই তাঁদের বিভাগে কথোপকথনের উদ্দেশ্যে যাওয়া উচিত। পরে অবশ্য প্রয়োজন হলে তাঁদের লেবর অফিসে যেতে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। প্রতিটি নির্দেশ এদের

[বিভাগীয় কর্মকর্তাদের] নামে না পাঠিয়ে ম্যানেজারের নামে [মাধ্যমে] পাঠানো ভালো।

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চার্জসিটের তদন্ত এদেশে লেবর অফিসারের দপ্তর হতে করা হয়। আমার মতে এইগুলি ফ্যাকটরির বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিজেদের করা উচিত। এতে তাদের অধিকারের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকে এবং শ্রমিকগণ লেবর দপ্তরকে একটি পুলিশি প্রতিষ্ঠান মনে করে না।

শ্রমিক-মনবিশেষজ্ঞ লেবর অফিসার বা পারসোন্যাল অফিসারকে একাধারে পরামর্শদাতা ও কনসিলিয়েটর এবং নিজ বিভাগের কর্মকর্তার কাজ করতে হয়। ফলাফল সম্বন্ধে চিন্তা না করে লেবর অফিসারদিগকে মালিক ও শ্রমিকের বিবাদ মেটানোতে সচেষ্ট হতে হবে। শ্রমিক-আদালতে লেবর অফিসারকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সওয়াল করতে বলা হয়। এঁদের পক্ষে স্বয়ং এ কাজ না করে তা বাহিরের কোনও ব্যক্তি বা উকিল দ্বারা করা উচিত। এতে শ্রমিকরা তাঁকে পুরাপুরি মালিক পক্ষীয় ব্যক্তি মনে করার সুযোগ পাবে না। অবশ্য তাঁর পক্ষে ঐ উকিলকে মামলা সম্পর্কিত কাগজ-পত্র বুঝিয়ে দেওয়াতে কোনও বাধা নেই। সাধারণতঃ মালিকগণ ফ্যাকটরিতে শ্রমিক সম্পর্কিত পলিশিগুলি নির্ধারণ করে থাকেন এবং ঐগুলি কার্যে পরিণত করার ভার অন্যদের সাথে লেবর অফিসারকেও দেওয়া হয়। এইখানে তাঁদেরকে উভয় পক্ষের মনস্তুষ্টি করে কাজ করার মত ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। এইজন্য একমাত্র সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিরই লেবর অফিসার রূপে গভর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হওয়া উচিত।

এদেশে চারি প্রকার প্রধান উদ্যোগ-শিল্প আছে, যথা—জুট

মিলস, ইঞ্জিনিয়ারিং [লৌহ-শিল্প], প্ল্যানটার্স ও খনিজ শিল্প। উহাদের নিজেদের জন্য পৃথক পৃথক অ্যাসোসিয়েশনও আছে, যথা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন, জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন, প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশন, মাইনার্স অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি। ডক শ্রমিকরা ও কৃষি-শিল্পীরা পৃথক শ্রমিককুল রূপে বিবেচিত হয়। জুটমিলস্ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও তাঁদের অধীনে পৃথক লেবর অফিসার নিযুক্ত করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেরও নিযুক্ত ঐরূপ লেবর অফিসার আছে।

উপরোক্ত প্রতিটি ফ্যাকটরিতে নিম্ন পর্যায়ে একজন করে লেবর অফিসার থাকা সত্বেও উচ্চপর্যায়ে উহাদের অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক লেবর অফিসার নিযুক্ত হওয়ার উপকারিতা আছে। এই উচ্চপর্যায়ের লেবর অফিসারগণ পর্যায় ক্রমে তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনের অধীন বহু ফ্যাকটরি পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার লেবর সম্পর্কিত ঘটনা সমূহ সম্বন্ধে অবহিত হন। এইজন্য অন্যান্য ফ্যাকটরির ঘটনার অভি-জ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এঁরা নিম্ন পর্যায়ের [ফ্যাকটরির] লেবর অফিসারদের পরামর্শ দিতে পারেন।

(খ) বস্তু :—এইবার বস্তু সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলা হবে। [ব্যক্তি সম্পর্কে উপরে বলা হয়েছে।] বস্তু সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার দ্বারা ব্যবসায় বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগী ভোগ্য পণ্য তৈরির রীতিনীতি ঠিক করা হয়। বিপণি সমূহের গঠন ও রূপসজ্জা এবং উহাদের স্থান নির্বাচনও বস্তুগত ব্যবস্থাপনার বিষয়ভুক্ত। একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারীদের শক্ত দ্রব্য তৈরি না করলে মুনাফা অধিক হয়। কারণ শক্ত দ্রব্য সহজে না ভাঙাতে বাজারে উহার চাহিদা ও তৎসহ বিক্রয় সংখ্যা কমে যায়।

কারণ একবার উহা কিনলে বহু বৎসর উহা কিনার প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতা এড়াতে ঐ উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে দ্রব্যের মূল্য ও মান স্থির করেন। ফ্যাকটরির আভ্যন্তরিক সংগঠন [অরগেনিজেশন], উহাদের শ্রেণী-বিভাগ ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধও বস্তু সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। ফ্যাকটরির ব্যবস্থাপকদের এই বস্তু সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলো।

(১) ক্রেতাদের চাহিদা যথাকালে মেটাতে হলে কম সময়ের মধ্যে কম খরচে ও কম পরিশ্রমে অধিক দ্রব্যোৎপাদন করতে হয়। মূলধনকে ব্লক্‌ড্‌ না করে উহাকে দ্রুতগতিতে চক্রাকারে ঘুরানো দরকার। উৎপাদনের খরচা কমালে কম মূল্যে দ্রব্য সরবরাহ সম্ভব। সুলভ দ্রব্য বাজারে এলে অধিক মানুষ অধিক সংখ্যায় তা ক্রয় করে। ফলে ফ্যাকটরির আয় বাড়িয়ে আরও শ্রমিক নিয়োগ করা যায়। এইজন্য একই দ্রব্য বহু প্রকারের তৈরি না করে উহার মধ্যে একৈকনিকতা [স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন] এনে একই আকারের ও প্রকারের ভোগ্য দ্রব্য তৈরি করা উচিত। উহাদের প্যাকিং এবং মাপ, ওজন ও বর্ণও একই রূপ হওয়া উচিত, এতে খুচরা বিক্রেতাদের পক্ষে ক্রেতাদের মন ভুলাবার জন্য বাগাড়ম্বর ব্যতিরেকে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা হয়। এই ক্ষেত্রে ক্রেতাদেরও উহা ক্রয় কালে অতো বাছা-বাছি করতে হয় না। এই ব্যবস্থাতে কাঁচা মালের ও তৎসহ শ্রমক্ষণের অযথা অপব্যয় হয় না। উৎপাদিত দ্রব্যের প্যাকিঙের আকার, বর্ণ ও মূল্য নিরূপণের মধ্যেও মনোবিজ্ঞানের স্থান আছে। এখানে দেখতে হবে ঐ সকল দ্রব্য কোন্ শ্রেণীর ক্রেতাদের মধ্যে বিক্রয় হবে। এক-এক

সমাজের লোক এক-এক প্রকার রঙ পছন্দ করে। যথা—বহু গ্রামের লোক ও শিশুরা লাল রং অধিক পছন্দ করে। প্যাকিং-এর ছোট-বড় [সাইজ] এক-এক দলের এক-এক প্রকার পছন্দ। পণ্যদ্রব্য সমূহের মূল্যের ভগ্নাংশ ক্রেতাদের বহু ব্যক্তি পছন্দ করেনি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দাম একটাকা, দুইটাকা বা আট আনা হলে ক্রেতারা খুশি। কিন্তু মূল্য ১-১৫ পঃ ও ১৫-১৩ পঃ বা সাতটাকা তিন পয়সা ধার্য হলে ক্রেতারা বিরক্ত হয়। পণ্য দ্রব্যের দামে ভগ্নাংশ না থাকলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের হিসাব রাখারও যথেষ্ট সুবিধা। [এই সকল বিষয়ে সুদক্ষ ম্যানেজারের মালিকদের সুপরামর্শ দেওয়া উচিত।]

(২) বিপণি সমূহের গঠন ও রূপসজ্জা নিরূপণ সম্পর্কেও ম্যানেজারদের জ্ঞান থাকা দরকার। কোনও এক ব্যক্তি নিউ মার্কেট এরিয়াতে দরিদ্র মজদুরদের জন্য একটি দোকান স্থাপন করেন। কিন্তু কোনও দরিদ্র ব্যক্তি একটি দিনও এই সস্তার দোকানে পা' দিল না। তদন্তে জানা যায় যে, ঐ বিপণির সম্মুখ ভাগের জাঁকজমকের জন্য দরিদ্র ব্যক্তিরা সাহস করে সেখানে ঢুকে নি। এই একই কারণে অতীতে সাধারণ লোক সাহেব কোম্পানির দোকানে ঢুকতে সাহস করতো না। কিন্তু একবার সেখানে ঢুকলে দেখা যেতো যে সেখানে অন্য মামুলি দোকান অপেক্ষা সস্তাতে দ্রব্য পাওয়া যায়। কয়েক ক্ষেত্রে দোকানীরা দুই-একটি দ্রব্য সস্তাতে বিক্রি করে অন্যান্য দ্রব্যেতে অধিক মূল্য আদায় করে নেয়। খরিদ্দাররা মনে করে যে সবগুলিই বুঝি তারা সস্তাতে বিক্রি করে দিলে। রেল স্টেশন প্রভৃতি স্থানে [চলতি পথের ধারে] দোকানে মন্দ দ্রব্যও নিরুপায় যাত্রীদের নিকট বিক্রি ভালো হয়। কারণ, ঐ ক্রেতার জীবনে আর একটিবার সেখানে আসার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অন্য স্থানে দোকানে ভালো দ্রব্য বিক্রয় না করলে উহা উঠে যাবে।

(৩) ফ্যাকটরির একটি বিভাগের সাথে উহার অপর বিভাগের যোগাযোগ স্থাপন ম্যানেজারদের প্রধানতম কার্য। সেখানে শাসন-কার্য ও চুরি বন্ধও তাঁকে করতে হবে। এ'ছাড়া তাঁকে হিসাব-কার্য, ভাণ্ডার রক্ষা ও সেরেস্তার কার্যেরও তদারকি করতে হয়। অর্ডার গ্রহণ এবং অর্ডার সাপ্লাই-এর কার্য অধুনা শহরের হেড্ অফিস হতে সমাধা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ম্যানেজারদের হেড্ অফিসের কার্যের সাথে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন আছে। বাজারের চাহিদা মত দ্রব্যোৎপাদন বাড়ানো বা কমানো ম্যানেজারের দায়িত্ব। কখনও ভবিষ্যতে অধিক মূল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনাতে তৈরি মাল সুষ্ঠু ভাবে গুদাম-জাতও এঁদেরকে করতে হয়। ফ্যাকটরির ও উহার বিভিন্ন বিভাগের স্বরূপ ও উহাদের সংগঠন সম্পর্কে 'ফ্যাকটরির সংগঠন' শীর্ষক পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

(৪) শ্রমিক ভর্তি, পেনসন দান, বেতন প্রদান, চিকিৎসা ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, বড় ও ছোট ছুটি প্রভৃতি কার্য সুষ্ঠু ভাবে সমাধার জন্য বহু ছাপা ফর্মের প্রয়োজন হয়। এখানে ম্যানেজারকে দেখতে হবে যে একই ফর্ম দ্বারা যাতে বিভিন্ন বিভাগের কাজ-কর্ম চালানো যায়। এখানে উহাদের ডুপ্লিকেশনের অর্থ অযথা অর্থ ব্যয়। একই ফর্মে কয়েকটি বাড়তি কলম্ যোগ করলে উহাদের একটি বা অপরটি গ্রহণ করে উহা দ্বারা প্রতিটি বিভাগের কাজ চালানো যেতে পারে। রাষ্ট্রের মহা কল্যাণকর উদ্যোগ-শিল্প পরিচালনাতে এই ম্যানেজারগণের কৃতিত্ব অতীব প্রশংসনীয়। সহস্র সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও ম্যানেজারদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সদা অস্বস্তি ও অশান্তিতে অতিবাহিত হয়। যা কিছু সুযোগ-সুবিধা তাঁদের পরিবারবর্গ ভোগ করলেও তাঁরা তা ভোগ করতে পারেন না।

তাঁদেরকে দিবা-রাত্র ফ্যাকটরি পরিচালনের চিন্তাতে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। একদিকে তাঁদেরকে মালিকদের এবং অপর দিকে তাঁদেরকে শ্রমিকদের খুশি করতে হয়। মালিকরা অধিক ক্ষেত্রে নেপথ্যে থাকাতে শ্রমিকদের যা কিছু ক্রোধ তা এই ম্যানেজারদের উপর বর্তিয়ে থাকে। উপরন্তু দ্রব্যোৎপাদন কম হলে মূলতঃ ম্যানেজাররাই দায়ী হন। এ জন্য ফ্যাকটরিতে মুহুর্মুহু ম্যানেজার বদল হতে দেখা যায়।

[এই নিবন্ধের প্রথমাংশে এই সকল ম্যানেজারদের প্রভূত সুযোগ-সুবিধার বিষয় আমি উল্লেখ করেছি। কিন্তু উপরোক্ত কারণে উদ্যোগ-শিল্পের এই ম্যানেজার সম্প্রদায়ের উপর কারুর হিংসা হওয়া উচিত হবে না।]

ম্যানেজারদের বুদ্ধিগত বিদ্যা, কারিগরি জ্ঞান, একাউন্টস ও বুক-কিপিং, ব্যবসায় বুদ্ধি, খবরাখবর ও যোগাযোগ, অর্থনীতি ও যন্ত্রবিদ্যা, সরকারী অর্থনীতি ও প্ল্যানিং সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা উচিত। উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন, উহাদের যথাস্থানে নিয়োগ, ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, কাঁচামাল সংগ্রহ ও উহার পরিবর্তন ও উহাতে মিশ্রণ [কাঁচা মালের অভাব ঘটলে অন্য দ্রব্য তাতে মিশ্রণ করে ঘাটতি পূরণ], উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নয়ন, শ্রমিক সন্তোষ এবং শ্রমিক আইন সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁদের থাকা চাই। স্থানীয় শাসকদের চরিত্র, মতিগতি ও তাদের সাধুতা, অসাধুতা, তাদের মধ্যে কে উৎকোচ নেয় এবং কে বা তা নেয় না এবং কি উপায়ে কাকে বশ করে কাজ উদ্ধার করা যায় ইত্যাদির জ্ঞান তাঁদেরকে রাখতে হয়। উৎপাত সৃষ্টিকারী স্থানীয় গুণ্ডাদের নাম-ধাম ও প্রয়োজন বোধে তাদের বরণ বা নিবারণ করার উপায়ও তাঁদেরকে জ্ঞাত থাকতে হয়। এই ভাবে প্রত্যেক ম্যানেজারকে একজন অতি-মানুষ রূপে নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়।

উচ্চ বেতনভোগী ম্যানেজারগণ প্রভূত সুখ-সুবিধার অধিকারী হলেও তাঁদের চাকুরির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নেই।

'সব কুছ্ অপিকো হ্যায়'—এই বলে শুরু করে যে কোনও মুহূর্তে [কার্যোদ্ধারের পর] ঐ উপকারী বন্ধুকে অকৃতজ্ঞতার সাথে বিদায় দিতে স্বার্থান্ধ ও স্বজন-পোষক মালিকদের বিবেকে বাধে না।

এদেরকে বিদায় দেওয়ার পূর্বে মালিকগণ নিষ্প্রয়োজনে একজন সহকারী ম্যানেজার নিয়োগ করেন এবং পরে ধাপে ধাপে তার ক্ষমতা বাড়াতে থাকেন. এর পর সহসা একদিন তাঁকে অন্যত্র একটি অসুবিধাজনক স্থানে বদলি করা হয়। এতে ফল না হলে তাঁরা তাঁকে বারে বারে অপমান করতে শুরু করেন। এততেও ঐ ব্যক্তি কর্মত্যাগ না করলে তাঁকে লিখিত ভাবে কিংবা মৌখিক ভাবে বিদায় দেওয়ার পর সেখানে উপরোক্ত ব্যক্তিকে কিংবা একজন স্বজনকে মোতায়েন করা হয়।

[বহু মালিক নিষ্প্রয়োজনে নিম্ন পদগুলিতে স্বজনকে ভর্তি করে অন্যান্যদের বিনা দোষে ছাঁটাই করে কর্মিসংখ্যার সমতা রক্ষা করেন। কারুর সুপারিশে কাউকে চাকুরি দিতে হলে এঁরা প্রায়ই এইরূপ অন্যায় করেন। একটা বিশেষ বয়ঃসীমার ওপারে কারুর পক্ষে নূতন করে অন্যত্র চাকুরি যোগাড় করা সম্ভব হয় না। পরিবারভারাক্রান্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে ছুতায়-নাতায় ছাঁটাই করে মালিকরা তাঁদের অশেষ দুর্গতির কারণ ঘটান। এ'বিষয়ে ম্যানেজারগণ অসহায় হওয়ায় তাঁদেরই বকলমে মালিকরা ঐ কার্য করে থাকেন। ফলে এতে যা কিছু বদনাম তা ঐ ম্যানেজারদের উপর অর্পিত হয়।]

ম্যানেজারদের পক্ষে অতো টাকার মাসিক মাহিনা যোগাড় করা

সহজ নয়। কিছুকাল আর্থিক সচ্ছলতা বাড়লে উহা কমানো দুষ্কর হয়। ফলে তাঁরা মালিকদের যে কোনও কুকাজে সাহায্য করতে বাধ্য হন। ভোটে ঐ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-অধিকার দখলে অক্ষম [ঐ বৎসরের মত] মাইনরিটি শেয়ার-হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করা ঐ ম্যানেজারদের এক পবিত্র কর্ম। এঁরা ডিরেক্টারদের অধীন হলেও সমগ্র কোম্পানির নোকর। এই কারণে ঐ সকল ম্যানেজারদের নিয়োগে ও বরখাস্তে স্থানীয় সরকারের [লেবর অফিসারদের মত] কিছুটা অধিকার থাকা যুক্তিযুক্ত। এ ব্যাপারে সর্বভারতীয় ম্যানেজার সার্ভিস প্রবর্তন করা ভালো।

সরকার গৃহীত বিস্তীর্ণ জমিদারির আয় অপেক্ষা স্বল্পভূমিতে অবস্থিত ফ্যাকটরির আয় অধিক। জমিদারির প্রজার সমসংখ্যক ব্যক্তি ফ্যাকটরিতে কর্মবহাল থাকে। ফ্যাকটরি মালিকদের যন্ত্রপাতি আমদানী করে বহু ব্যয়ে ভূমি ক্রয় করে ফ্যাকটরি স্থাপন করতে হয় বটে, কিন্তু জমিদারদেরও বহু অর্থ ব্যয়ে ও পরিশ্রম করে প্রজা বসিয়ে পথ ঘাট ও বাঁধ নির্মাণ করে জমিদারি গড়তে হয়। ফ্যাকটরি পরিচালনার মত জমিদারি পরিচালনাও এক সুকঠিন কাজ। অধুনা তহশীলদারদের বেতন, ভাতা, রাহা খরচ প্রভৃতিতে বহু অর্থ ব্যয় করেও সরকার প্রজাদের খাজনা আদায়েতে অপারক কিন্তু ঐ খাজনা স্বল্পব্যয়ে আদায় করে প্রাক্তন জমিদারগণ সরকারের প্রায় অবৈতনিক খাজনা-আদায়কারী রূপে কার্য করেছেন। উপরন্তু দুর্নীতি গ্রহণের সুযোগ আধুনিক জমিদারদের কম ছিল। [স্বার্থান্ধ বহু শিল্পপতি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদে খুবই খুশি।] এজন্যে পূর্ববর্তী নিবন্ধে আমি প্রশ্ন তুলেছি যে জমিদারির মত অন্ততঃ কতিপয় ফ্যাকটরিও রাষ্ট্রায়ত্ত করা যেতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্তের

প্রথম ধাপ স্বরূপ [ধাপে ধাপে উঠাই ভালো] সর্বভারতীয় ম্যানেজেরিয়াল সার্ভিসের প্রবর্তন করলে ক্ষুদ্র অংশীদারদের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে। এক্ষেত্রে ম্যানেজারদের সাহায্যে হিসাবের কারচুপি ধরতে গভর্নমেণ্ট সক্ষম হতে পারবেন।

এখুনি অবশ্য বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঝুঁকি নেওয়ার বিপদ আছে। কারণ, উহাদের পরিচালনার অভিজ্ঞতা এদেশেতে রাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত অর্জন করতে পারে নি। বিত্তবান মালিক-সঙ্ঘের সহিত সঙ্ঘর্ষে গরিব রাষ্ট্র বিপদগ্রস্ত হতে পারে। ডেমক্রেটিক দেশেতে ইহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। সমস্যা সঙ্কুল দেশেতে আরও সমস্যা এখুনি বাড়িয়ে লাভ নেই। কারণ এখনও ধনিককুল একত্রে অর্থ ব্যয়ে যে কোনও গভর্নমেণ্টের পতন ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু ওঁদের ক্ষমতার বিষয় উহ্য রেখেও আমি বলবো যে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকার আয়ের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বহুকাল ব্যক্তিগত মালিকানাতে রাখতে হবে। তা না হলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ও অভিজ্ঞতার অভাবে সামগ্রিক ভাবে জাতি দুর্বল হয়ে পড়বে। গভর্নমেণ্ট-ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাহিরে কাউকে ম্যানেজারের পদে নিয়োগ রহিত করা উচিত। অবশ্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐ পদে প্রমোশন দিতে হবে।

ব্যবসায়েতে লাভ না হলেও লোকসান তাতে কখনও হয় না। একমাত্র ব্যবস্থাপনার দোষে এবং মালের মাপে ও অর্থের চুরিতে লোকসান হয়। উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে আণ্ডার সেলিং এবং ক্রয় ও বিক্রয় কালে হিস্যা গ্রহণ লোকসানের অন্যতম কারণ। প্রায়ই মনে হয় ঐ ম্যানেজার পূর্বজনের মত অসাধু ও অকর্মণ্য নয়। অতএব ওনার দ্বারাই এইবার ঠিকঠিক কার্য হবে। কিন্তু তদারকির অভাব হওয়া মাত্র তিনিও পূর্বজন-পন্থা অনুসরণ করেন।

কারণ কাঁচা টাকার লোভ বহু সৎ ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত দমনে অপারক হন। বহু ক্ষেত্রে ঐ গৃহীত অর্থ [ইচ্ছা সত্ত্বেও] পুরণ করতে না পেরে তাঁরা হিসাবে কারচুপি করতে বাধ্য হন। এই জন্য বিক্রয়-বিভাগ, ম্যানেজমেণ্ট, খাতাঞ্চি [ট্রেজারার] ও হিসাব বিভাগ পৃথক থাকা ভালো। এতদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সংযত করে কারচুপির সুযোগ কমায়। সুষ্ঠু হিসাব রক্ষা অসাধুতার সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে কমাতে সক্ষম। ম্যানেজারদের পক্ষে বাজারেব চাহিদা মত দ্রব্য তৈরি করানে' উচিত হবে। প্রথমে উত্তম দ্রব্য তৈরি দ্বারা বাজারেতে নাম করে পরে নিম্ন ও মিশ্র মাল চালালে ততো ক্ষতি নেই। বেশি মূল্যের A কোয়ালিটি দ্রব্য এবং কম মূল্যের B কোয়ালিটি দ্রব্য তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ। এতে বাজারে খেলো দ্রব্য তৈরির বদনাম এড়ানো যায়। পাত্র না বুঝে বাজারেতে অধিক 'প্রাপ্য অর্থ' বকেয়া রাখা এবং বাজেট ও প্লানিং পূর্বাহ্ণে না করা বাতুলতা। ফিনিসড্ গুডসের ক্রেতাদের প্রদেয় অর্থ বকেয়া রাখতে হয় বটে, কিন্তু সেই অনুপাতে কাঁচা মাল বিক্রেতাদের প্রাপ্য অর্থ বাকি রেখে আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। তড়িৎ ঘড়িৎ মালের ক্রেতার অভাবে ফ্যাকটরিতে দ্রব্যোৎপাদন বন্ধ ক্ষতির কারণ। ঐ ক্ষেত্রে তৈরি মাল কিছুকাল গুদামজাত রাখা ভিন্ন অন্য উপায় নেই। অযথা মাল উৎপাদন না করেও শ্রমিকদের বসিয়ে বেতন দেওয়াতে লোকসান হয়। অন্যদিকে কিছু দিনের জন্য শ্রমিক বরখাস্ত করে বা ফ্যাকটরি বন্ধ করে সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ নূতন করে শ্রমিক যোগাড় করে পুনরায় ফ্যাকটরি চালু করা দুরূহ। মাল প্রাণপণে সত্বর বিক্রয়ের চেষ্টা করতে হবে। এই একটি কারণে ব্যবসায়ে বাড়্তি মূলধন থাকা উচিত। বৎসরের প্রতিটি

সময়ে সকল দ্রব্য ও মাল মানুষ ক্রয় করে না। কিন্তু মরশুম আসা মাত্র ঐ মজুত মাল অধিক মূল্যে বিক্রয় হতে থাকে। কে কিনবে ও কে কি কোথায় বিক্রয় করবে—ঐ সকল সংবাদ ফ্যাকটরি ম্যানেজারদের অবগত হতে হবে। বিজ্ঞাপন এমন ভাবে দেওয়া দরকার যাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য গৌণ এবং মাত্র ছবি ও ভাষা মুখ্য না হয়। এই বিজ্ঞাপন বাক্‌প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মানুষকে মুগ্ধ করতে সক্ষম। মূলধন আটকে না রেখে উহা তড়িৎঘড়িৎ চক্রাকারে ঘুরানো [রোল করা] উচিত। অন্যথায় ব্যবসায়ে অধিক মূলধনেব প্রয়োজন হয়ে থাকে।

প্রোডাকশন বোনাস প্রভৃতি বিবিধ উৎসাহ ব্যঞ্জক [ইনসেনটিভ্] বোনাস সম্বন্ধে পূর্ব নিবন্ধে বলা হয়েছে। আমি নিজ ফ্যাকটরিতে অ্যাটেণ্ডেন্স তথা হাজিরী বোনাস রূপ একটি বোনাসের প্রবর্তন করে সুফল পেয়েছি। মাসেতে একটি দিনও কেউ গরহাজির থাকলে ঐ মাসে ঐ বোনাস [মাসিক পাঁচ টাকা] তাকে দেওয়া হয় না। এই ভাবে গরহাজির জনিত লোকসান হতে রক্ষা পাওয়া যায়। উপরন্তু কয়েকজন শ্রমিককে বিনা ভাড়াতে ফ্যাকটরি গৃহে বসবাসে আমি উৎসাহিত করি। এতে কেউ কামাই করলে এদের কাউকে তখুনি ওভারটাইমে কাজে লাগানো যায়। ফ্যাকটরি গৃহে বাস করাতে এদের দ্বারা বিনা বেতনে পাহারার কাজ পাওয়া যায়। হোম ইণ্ডাষ্ট্রিতে তিন সিফট কাজ চালু থাকলে এই পাহারা এমনিতেই পাওয়া যায়। তবে শিল্প কিছু বড়ো হলে শ্রমিকদের উপর নজর রাখতে দ্বারবানের প্রয়োজন। গেট্ পাশ পদ্ধতি ও গেটেতে তল্লাসি চুরি বন্ধের অন্যতম উপায়। কিন্তু তল্লাসি প্রথা শ্রমিকদের বিনা সম্মতিতে প্রচলনে উহাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করবে।

প্রয়োজন বোধে শিল্পপতিদের কিছুটা অর্থনীতি ও রাজনীতি-ধর্মী হওয়া উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্তমান কর্মী নিয়োগ পদ্ধতির ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কুফল সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। বাহির হতে বহুল [অ্যাবনরম্যাল] সংখ্যাতে কর্মী আমদানি হলে স্থানীয় খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি পড়ে এবং সেখানে স্থানীয় জনগণের মধ্যে বেকারত্বের বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় গভর্নমেণ্টের কয়েকটি মাত্র চাকুরি তাদের চাহিদা মিটাতে অক্ষম। বহিরাগত ব্যক্তিদের নিজ আবাস-ভূমিতে জনসংখ্যা কমাতে সেখানে সুবিধা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেখানের চাপ-মুক্ত খাদ্য-সম্ভার ওদের নূতন [অস্থায়ী] বাস-ভূমিতে আসে না। উপরন্তু এরা তাদের অর্জিত অর্থ স্বগ্রামে পাঠিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিতে বিপর্যয় আনে। ফলে, দেশেতে বহু প্রব্লেম-প্রভিন্সের সৃষ্টি হয়। এজন্যে শিল্পাঞ্চল সমগ্র দেশে সমভাবে ছড়ানো দরকার। এতে স্থানীয় চাষবাষের ক্ষয় ক্ষতি, উদ্যোগীয় অপরাধের বর্ধন এবং মুহুর্মুহু শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কম থাকে। অবশ্য দেশেতে খনি, উদ্ভিদ প্রভৃতির অবস্থান বিবেচনা করে যথাসম্ভব উচিত ভাবে উদ্যোগ-শিল্পকে দেশব্যাপী ছড়াতে হবে। কোনও উদ্যোগের চাপে স্থানীয় ব্যক্তিদের বিলুপ্তির আশঙ্কা ঘটলে তাদের রক্ষার্থে নিশ্চয়ই বিশেষ আইনের আশ্রয় নিতে হবে। [অতি একাত্মবোধ সর্বক্ষেত্রে ভালো নয়।] স্থানীয় জনগণের মধ্য হতে অন্ততঃ শতকরা চল্লিশজনও তৎস্থানীয় উদ্যোগ-শিল্পে বহাল হলে এই সমস্যার সমাধান হবে। [এক্ষণে এরা কয়েক স্থানে মাত্র শতকরা দশ ভাগ বা পাঁচ ভাগ আছে।] সাধারণ স্থানীয় জনগণ বিদেশী সহ সর্ব-ভারতীয় মূলধনী মালিকদের সাদরে স্বভূমিতে আহ্বান জানান। তাঁদের আশা এই যে উহাতে তাঁদের অন্ন সমস্যার সমাধান হবে। এ'জন্য চাষের জমির বিলুপ্তি, দূষিত বায়ু ও পানীয় জল এবং উদ্যোগীয়

অপরাধের বর্ধন তাঁরা সহ্য করেন। কিন্তু এই বিষয়ে সুরাহা না হলে স্থানীয় বেকার যুবকগণ মালিকানা বিরোধী রাজনীতির দ্বারা উদ্যোগকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবি জানায় এবং তাদের বেকার জীবনে পর্যাপ্ত সময় হাতে থাকাতে ঐ বেকারগণ রাষ্ট্রে মুহুর্মুহু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ভুলে গেলে চলবে না যে উদ্যোগ-শিল্প স্থানীয় চাষবাসের মত স্থানীয় কুটির-শিল্পকেও ধ্বংস করেছে। সাম্প্রদায়িক নিয়োগের প্রাধান্য কালে এই বেকার যুবকগণই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রামে লিপ্ত হয়।

মালিকগণ প্রতিষ্ঠান গড়েন শুধু নিজেদের জন্য নয়। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরও উহাতে ভোগ তাঁদের কাম্য। তাঁরা [অন্ততঃ] শত-করা চল্লিশজন স্থানীয় ব্যক্তিকে তাঁদের কর্মে নিয়োগ না করলে স্থানীয় সরকার স্থানীয় জনগণের চাপে ঐগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে বাধ্য হবেন। অন্যথায় তাঁদের বিদায় গ্রহণ ভিন্ন উপায় থাকবে না। এইভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার অভাবে সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, বর্তমানে উদ্যোগ-শিল্পের পরিচালনার ক্ষমতা এদেশে রাষ্ট্র এখনও অর্জন করে নি। বরং ঐ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণই প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রায়ত্ত করণে বাধার সৃষ্টি করে মালিকদের কর্তৃত্ব রক্ষাতে সাহায্য করবে।

এখানে স্থানীয় মানুষ বুঝাতে কোনও একটি প্রদেশীয় মানুষ বুঝানো হয় নি। মিল, ফ্যাকটরির চতুর্দিকের স্থায়ী বাসিন্দাদেরই বুঝানো হয়েছে। কাছাকাছি [আপন] বাটী থাকাতে এদের জন্য কুলি-লাইন বা অন্য বাসগৃহের প্রয়োজন নেই। স্ব পরিবারের মধ্যে বসবাস করাতে এদের মধ্যে উদ্যোগীয় অপরাধ নেই। [এজন্য এরা বেপরোয়া নয়।] এরা ফেটিগ ব্যতিরেকে দ্রুত কর্ম স্থলে যাতায়াতে সক্ষম। কর্ম-স্থলে এবং স্বগ্রামে—এই দুইটি এস্ট্যাবলিশমেণ্টের এদের প্রয়োজন নেই। গরহাজির জনিত কর্মীর [হঠাৎ] ঘাটতি হলে নিকটের বাটী হতে

এদেরকে ডেকে এনে ওভার টাইমে খাটিয়ে বন্ধ যন্ত্র চালু রাখা যায়। স্থানীয় জনগণ পাড়ার ফ্যাকটরিকে পাড়ার সম্পত্তি মনে করে মালিক-দিগকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে অন্নদাতা সুলভ আনুগত্য দেখায়। বিজ্ঞ য়ুরোপীয়গণ ঐ কারণে সম্ভব মত স্থানীয় ব্যক্তি নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। এতদ্বারা উদ্যোগীয় অপরাধ এবং শ্রমিক-বিক্ষোভ কমে যায়। পুরুষানুক্রমে অর্জিত, স্থানীয় সংস্কৃতিতে বর্ধিত, পৈতৃক জমি-জমা এবং বাসগৃহ ও অন্যান্য উপসত্বভোগী স্থানীয় সমাজ-বদ্ধ মানুষ স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকে। কেউ কেউ স্থানীয় ব্যক্তিদের শ্রম-বিমূখতা সম্বন্ধে অনুযোগ করেন বটে; কিন্তু কৃষিধর্মী স্বভাব-সিদ্ধ ঐ স্বভাব দূরীভূত করার চিন্তা কেহ করেন না। [এই পুস্তকে উহার উপায় বিবৃত হয়েছে।] কিন্তু করনিক, হিসাব রক্ষক, কোষাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার শিল্পচাতুর্য ও দৈহিক শ্রম সম্পর্কে ঐরূপ বলা বাতুলতা। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেও স্থানীয় ব্যক্তিগণ ধীরে ধীরে বিতাড়িত হলে কি বলা যাবে?

পাঁচমেশালী নাগরিকের দেশে পাঁচমেশালী কর্মী নিয়োগ জাতীয়তা বোধ আনে এবং সর্বদেশব্যাপী বিভিন্নস্থানের মানুষরা পরস্পরকে চিনে ও বুঝে। আমার মতে শতকরা ষাইট জন স্থানীয় ব্যক্তিকে এবং বাকি শতকরা চল্লিশজন ভারতের প্রত্যেক প্রদেশীয় গোষ্ঠী [একটি মাত্র প্রদেশ থেকে নয়] হতে সংগ্রহ করা উচিত। মাত্র আগামী বিশ বৎসর কাল এইভাবের নিয়োগ প্রথা থাকা উচিত। সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের সংখ্যা একত্রিত করে উহার সামগ্রিক হার ঐরূপ হলে চলবে। তাতে এদের প্রত্যেককেই স্থানীয় ভাষা যথাসম্ভব শিক্ষা করাতে হবে। [বিবিধ গোষ্ঠীর মানুষের একত্রিত হয়ে শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটানোর সুযোগ কম।] বিপদ ভিতর হতে যেমন আসে তেমন উহা বাহির হতেও আসে।

১৭

প্রশাসন

প্রশাসন বিদ্যাকে অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশন এবং ব্যবস্থাপনাকে ইংরাজিতে ম্যানেজমেণ্ট বলা হয়ে থাকে। একই নিয়ামক [ব্যবস্থাপক] -কে একাধারে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের কার্য করতে হয়। এই ব্যবস্থা-পনা ও প্রশাসনের মধ্যে যথেষ্ট মূলগত প্রভেদ আছে। ব্যবস্থাপনার সাথে [বহুরঙা] ফুলের এবং প্রশাসনেব সাথে উহার সুবাসের তুলনা করা চলে। গানের সহিত তার সুরের যা সম্বন্ধ ব্যবস্থাপনার সাথে প্রশাসনের সেইরূপ সম্বন্ধ। অর্থাৎ একটি হতে অপরটি অধিকতর সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। প্রশাসনের প্রতিটি বিষয় ব্যবস্থাপনার মত লিখিত ভাবে প্রচার করা যায় না। এমন কি সকল ক্ষেত্রে উহা প্রকাশ্যে আলো-চনার বস্তুও নয়। ব্যবস্থাপনা সংগঠনেব উপর এবং প্রশাসন কুটনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনস্বার্থের কারণে এইখানে উহা মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। উহার অধিকাংশ বিবেচ্য বিষয় এখানে উহ্য রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

প্রশাসকদের বারে বারে অন্যায়ের সাথে আপোশ করতে হয়ে থাকে। অন্যথায় তাদেরকে কর্ম জীবনে অসফল হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ তাদের বলি দিতে হয়। বড় বড় যুদ্ধ জয় করার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ থাকে প্রোপাগাণ্ডা এবং এক-চতুর্থাংশ থাকে অস্ত্র-সম্ভার। নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে ঐরূপ

বহু বিষয় প্রশাসকদের স্বীকার করতে হয়। একটি বড়ো ক্ষতি নিরোধার্থে তাঁদের নিকট ছোট ক্ষতি ক্ষতিই নয়। বড় অন্যায় রোধ করার জন্যে তাঁদেরকে ছোট অন্যায় করতে হয়। এই সব বিষয়ে তাঁদের বহু প্রকার যুক্তি-তর্কের [জাগলারি অফ্ ওআর্ডস] অবতারণা করতে হয়। কিন্তু তাঁদের এই যুক্তি-তর্ক এক প্রকার উকিল, যাকে আমরা সাধারণ ভাষাতে আইনজীবী বলি। এঁরা নিজে কিছু বুঝেন না। এঁরা অপরকে বুঝান মাত্র। জগৎ এঁদের কাছে একপ্রকার 'মেক বিলিফ' মাত্র। এঁরা এমন বহু কথা বলে থাকেন যা তাঁরা নিজেরা বিশ্বাস করেন না। অন্তরে অসহায়তা অনুভব করলেও বাহিরে তাঁদেরকে জবরদস্ত ভাব দেখাতে হয়।

একটি বড়ো উদ্যোগ-শিল্পের ম্যানেজারের সাথে ছোট একটি রাষ্ট্রের কর্ণধারের তুলনা করা চলে। পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন স্বার্থ সম্বলিত কয়েক শত ব্যক্তিকে পরিচালনা সহজ কার্য নয়। ফলে এঁদেরকে মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই বিরাগ ভাজন হতে হয়। এইজন্য বহু ক্ষেত্রে বিপর্যয় এড়াবার জন্যে তাঁদেরকে কুটনীতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু এই সব কাজে সামান্য একটু ভ্রান্তি কিংবা সমীক্ষার ভুল মহা বিপর্যয়ের কারণ ঘটিয়ে থাকে। এই জন্য ব্যবস্থাপনার সাথে এঁদের প্রশাসন বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই প্রশাসন-বিদ্যা প্রয়োগ করার রীতি। এই প্রশাসন-বিদ্যার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিক আছে। এইখানে মাত্র ইহার প্রকাশ্য দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

(১) বহু ম্যানেজার ফ্যাকটরিতে একাধিক শ্রমিক য়ুনিয়ন রাখার পক্ষপাতী। এজন্য তাঁরা চেষ্টা করে অর্থব্যয়ে বিরোধী য়ুনিয়ন সৃষ্টি করে দেন। কয়েক ক্ষেত্রে তাদের জোরাল করার জন্যে তাদের সুপা-

রিশে নূতন শ্রমিক ভর্তি করে নিয়েছেন। এই ভাবে এঁরা একটি য়ুনিয়নের সাথে অপরটিকে লড়িয়ে নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। লেবর অফিসে ঘুষ দিয়ে কোন দলের কতো লোক ভর্তি হলো—তার কোনও খবর এঁরা রাখেন না। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে ইহার বিরোধী। এতে ফল ভালো না হয়ে মন্দ হয়ে থাকে। এতে একটি য়ুনিয়ন যে দিকে যায় অপর য়ুনিয়ন তার বিপরীত দিকে যায়। এইজন্য এদের একটি য়ুনিয়নের সাথে কোনও বন্দোবস্ত সমাধা করা সম্ভব হলেও ওদের অপর য়ুনিয়ন তা মেনে না নেওয়াতে কর্তৃপক্ষের অসুবিধা ঘটে থাকে। এরা পরস্পর বিরোধী হওয়ায় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তারা এইরূপ করে থাকে। বহু ম্যানেজার প্রয়োজন হলে কংগ্রেস য়ুনিয়নকে হটিয়ে কমিউনিস্ট প্রভৃতি বামপন্থী য়ুনিয়ন এনেছেন। কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াতে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পুলিশের সমধিক সাহায্য পাওয়া যাবে না, কিন্তু প্রয়োজন হলে তাদের সাহায্যে কংগ্রেস বিরোধীয় য়ুনিয়নগুলিকে তাঁরা নিষ্পেষিত করতে পারবেন এইরূপ এক ভুল বিশ্বাস মনেতে পোষণ করার জন্যে এঁদের কেউ কেউ এইরূপ দুষ্কার্য করে থাকেন। অন্য বহু ম্যানেজার মনে করেন যে কংগ্রেস রাষ্ট্রের পরিচালক হওয়াতে কংগ্রেস চালিত য়ুনিয়ন সমূহ সংযত আচরণ করতে বাধ্য। অতএব কংগ্রেস য়ুনিয়নকে শিকড় গাড়বার জন্য তাঁরা সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর। অন্যান্য বহু ম্যানেজার জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র ও সোসিয়ালিস্ট্ ইত্যাদি রাজনৈতিক দল কর্তৃক একটি তৃতীয় পার্টি তৈরি করে দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁদের উদ্দেশ্য এই ভাবে শ্রমিকদের মধ্যে ট্রাইঅ্যাঙ্গুলার বিরোধে এদের দুর্বল রাখা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রাজনীতির সহিত সম্পর্ক বিরহিত শ্রমিক-সঙ্ঘ তৈরি করার চিন্তা

তাঁরা কোনও দিনই করেন নি। কেউ কেউ মনে করেন যে ঘন ঘন য়ুনিয়ন বদলের পিছনে ম্যানেজারদেরও নেপথ্য সাহায্য আছে। অবশ্য একটি য়ুনিয়ন বেশি বাড়াবাড়ি করলে আত্মরক্ষার্থে অপর য়ুনিয়নকে তাঁদের বাড়তে দিতে হয়। কিন্তু বহু ম্যানেজার শ্রমিকদের এই সব য়ুনিয়নের ভাঙা-গড়ার ব্যাপারে তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করার বিরোধী। এঁরা মনে করেন যে ম্যানেজারদের সর্বক্ষেত্রে রাজনীতির বাইরে থাকা উচিত। কারণ কোন রাজনৈতিক দল কখন গদি দখল করবে তার স্থিরতা নেই। তাঁরা পার্টি-ইন্-পাওয়ার-এর সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য।

[কয়েকটি পারিবারিক উদ্যোগ-শিল্পের মালিক ভ্রাতারা এক-এক জন এক-একটি রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত থাকেন। সেই ভাবে তাঁরা বিভিন্ন দলকে চাঁদা দিয়ে সাহায্য করেন। কারণ, কোন্ দলটি কখন আধিপত্য বিস্তার করবে তা বলা দুষ্কর। রাজ্য পর্যায়ে সেরূপ অদল-বদল হলে বোম্বাই-এ কার্যরত ভ্রাতা কলকাতাতে এসে এবং কলকাতাতে কার্যরত ভ্রাতা বোম্বাইতে গিয়ে আসর জমাতে পারবেন। মালিক-বিরোধী আইন রোধের জন্য এঁদের পক্ষে আইন-সভার বিরোধীয় দলের কাউকে সাহায্য করাও সমীচীন।]

(২) বহু ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে বহুবিধ অসুবিধা ও অবিচারের বিষয় উচ্চৈঃস্বরে বলে থাকে। কখনও বা এই সকল বিষয়ে তারা কর্তৃপক্ষের সাথে তর্ক-বিতর্ক পর্যন্ত করতে চায়। বাহিরে মিটিঙে তারা কর্তৃপক্ষকে অশ্রাব্য ভাষাতে গালিগালাজও করতে থাকে। বহু ম্যানেজার শ্রমিকদের এই সকল ব্যবহার পছন্দ না করে উহা তাঁরা বন্ধ করতে চান। কিন্তু প্রশাসকগণের পক্ষে এতে ধৈর্যহারা হলে

চলবে না। বরং ঐভাবে শ্রমিকদের মনের মধ্যে সঞ্চিত [প্রদমিত] ক্ষোভ উদ্গীরণ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই সকল ক্ষোভের বিষয় উজাড় করে বলার পর তাদের মন আপনা হতেই শান্ত হয়। সকলেই জানেন যে শোকগ্রস্ত নর-নারীরা কাঁদলে তাদের শোকের অবসান হয়। তেমনি মনের প্রদমিত ক্ষোভ বার করলে শ্রমিকদেরও মনের শান্তি ফিরে আসে। এই জন্য ম্যানেজারদের এদের প্রত্যেকটি অভিযোগ [ন্যায্য না হলেও] উহা বহুক্ষণ ধরে ধীর ভাবে সহানুভূতির সহিত শুনা উচিত। এমন কি, তখনকার মত [উচিত না হলেও] তাদের প্রতিটি অসুবিধা স্বীকার করে তাদের অভিযোগের প্রতিকারার্থে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। প্রায় দেখা যায় ঐরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর তারা শান্ত ভাবে স্থান ত্যাগ করেছে। উপরন্তু ম্যানেজার ঐ ভাবে দুঃখ প্রকাশ করাতে তারা লজ্জিত হয়ে উঠেছে। পরে সময়ের ব্যবধানে তারা পূর্ব অভিযোগ ভুলে গিয়ে উহা আর কখনও উত্থাপন করে নি। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে উত্তেজনার মুখে কয়েকজন মারমুখী হয়ে উঠে এবং অধিকাংশ অন্য শ্রমিক কেবল মাত্র তাদের আশে-পাশে [নির্লিপ্ত ভাবে] খাড়া হয়ে যায়। এইখানে এই উত্তেজিত কয়জনকে বাকি লোক হতে আলাদা করে তাদেরকে চেম্বারে ডেকে পূর্বোক্ত পন্থাতে বুঝালে ফল শুভ হয়। ম্যানেজারের চেম্বার হতে তারা বার হবার পূর্বেই বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করে জনতার বহু ব্যক্তি স্থান ত্যাগ করে। বাকি লোকগুলি তাদেরকে হাসি মুখে সহজ ভাবে বেরুতে দেখে বিনা বাক্য-ব্যয়ে স্ব স্ব কাজে ফিরে যায়। কিন্তু বহু ম্যানেজার ঐ সকল ক্ষেত্রে ধৈর্যহারা হয়ে ঘটনাকে ধর্মঘট বা বিদ্রোহের সামিল মনে করেছেন। কয়েক ক্ষেত্রে 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে ; এখন তোমরা যে যার

কাজে যাও—কাজ করো। ঐ অভিযোগ সত্য হলে উহা গুরুতর ও অন্যায় বৈ কি! প্রতিকার করা হবে বা ওসব দেখা যাবে'—মাত্র এই কথাটুকু শুনার পর এরা আর বাক্যব্যয় না করে স্ব স্ব কার্যে যোগ দিয়েছে। উত্তেজনা মানুষকে প্রায়ই হঠাৎ মনোরোগীতে পরিণত করে। উপরন্তু গণ-বাক্ প্রয়োগ বা মাস্ সাজেসশন্ তাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব লোপ করে পশুতে পরিণত করে। এই সময় তারা যা করে বা বলে তা সহজ অবস্থাতে তারা করে বা বলে না। এইজন্য টাল-বাহনা করে বা কথা-বার্তা চালিয়ে সময় অতিবাহিত করলে সময়ের ব্যবধানে উত্তেজনা আপনা হতেই প্রশমিত হয় এবং তার ফলে তারা আপন [পৃথক পৃথক] সত্তা ফিরে পেয়ে পুনরায় পূর্বের মত চাকুরি লোপের ভয়ে ভীত অনুরাগী [সহজ] মানুষ হয়ে উঠে। বহু ম্যানেজার সাহস করে মারমুখী জনতার সম্মুখীন হয়ে বলেছেন,—'আচ্ছা। তোমাদের অতো জনার সাথে একা কথা কওয়া সম্ভব নয়। তোমরা বরং তোমাদের কয়জন নেতাকে আমার চেম্বারে পাঠাও।' সেই ক্ষেত্রে দল-ছাড়া হওয়া মাত্র ছোট কক্ষে এসে এরা শান্ত মূর্তি ধারণ করে। এই ক্ষেত্রে ম্যানেজারের পক্ষে এদের উস্কানি-দাতা নেতাদের চিনে নেওয়া সম্ভব হয়। পরবর্তী কালে সুযোগ বুঝে এইরূপের স্বভাবের লোকদের [আন্দোলনকারী] অন্যত্র বদলি করে তাদের দল ভেঙে দিতে পারেন, কিংবা অন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি শায়েস্তা করতে পারেন। কিন্তু কোনও ক্রমে ঐ ঘটনার সময়ে বা দিনে বা তার অব্যবহিত পরে কোনও ব্যবস্থাবলম্বন করা উচিত হবে না। যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা

হোক তা তাদের অন্যস্থানে ছুতায়-নাতায় বদলি করার পর করা উচিত। কিন্তু আমার মতে শত্রুকে বন্ধু করাই শ্রেয়ের কাজ। ঐ ব্যক্তি যখন দেখে যে তার আশঙ্কার বিপরীতে ঐ কারণে বদলির পর তার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন সে অবাক হয়ে যায় এবং আপনার অজ্ঞাতে অভাবনীয় ভাবে কর্তৃপক্ষের অনুগামী এক অতি বশংবদ ব্যক্তি হয়ে উঠে। প্রতিশোধ গ্রহণ দ্বারা এখনও কোনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় নি। কারণ, আজ যে সৎ কাল সে অসৎ এবং আজ যে অসৎ কাল সে সৎ হতে পারে। মানুষ ও তার চরিত্র বদলালেও মনুষ্য জাতি এবং উহার স্বভাব বদলায় না। ঐ স্থানে ঐ একই সমস্যা অপর আর এক ব্যক্তি সৃষ্টি করতে পারে। এই জন্য মূল সমস্যার প্রতিবিধান করতে ম্যানেজারগণ বাধ্য। বহু ম্যানেজার জনপ্রিয় হওয়ার্থে সকল দোষের জন্য সর্ব সমক্ষে মালিককে দায়ী করেন। কিন্তু এর ফল সুদূরপ্রসারী হয়ে অতীব ক্ষতিকর হয়। ঐ অজুহাতে পরে তাদের কাউকে সামলানো অসম্ভব হয়। ইহা তাদের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা ও কুরুচির পরিচায়ক হয়ে থাকে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, উর্ধ্বতনদের ব্লাফ্ দেওয়া সম্ভব হলেও অধস্তনদের তা দেওয়া যায় না। অধস্তন কর্মীরা তাদের অব্যবহিত উর্ধ্বতনের কুকার্য [সান্নিধ্যের কারণে] আরও সহজে ধরে ফেলে। প্রকৃত কথা এই যে, কোনও ক্রমে অধস্তনদের শ্রদ্ধা হারানোর মত এমন কোনও কাজ ম্যানেজারদের করা উচিত হবে না। ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে লালিত মানুষ একটি বিশেষ গুণের অধিকারী। তারা নিজেরা অসৎ হলেও তারা ক্ষমতাসীন উর্ধ্বতনদের সর্বদা সৎ ও সচ্চরিত্র দেখতে চায়। [য়ুরোপীয় শ্রমিকরা

অবশ্য ফ্যাকটরির উর্ধ্বতনদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর কোনও গুরুত্ব দেয় না।] অসচ্চরিত্র ও মদ্যপায়ীরাও আর্থিক কারণে প্রায়ই তহবিল তছরুপ ও উৎকোচ গ্রহণ করে।

কখনও শ্রমিকরা দলবদ্ধ ভাবে তাদের কোনও এক তদারকি কর্মীকে দোষী করে। এই ক্ষেত্রে নিয়ামকের পক্ষে স্বয়ং ঘটনাস্থানে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। অবস্থা অতি খারাপ বুঝলে কেহ কেহ ক্রুদ্ধ জনতার সম্মুখেই ঐ তদারকি কর্মীকে ভৎর্সনা করে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। অধস্তনদের সম্মুখে সাধারণতঃ উচ্চপদী কর্মীকে ভৎর্সনা করলে নিয়মতান্ত্রিকতার হানি ঘটে। সাধারণতঃ উনি অন্যায় করলেও অধস্তনদের সম্মুখে তাঁকে সমর্থন করে বরং অধস্তনদের [মৃদু] ভৎর্সনা করা হয়। পরে অবশ্য আড়ালে ঐ উচ্চপদী কর্মীকে ট্যাক্টলেশ ব'লে ভৎর্সনা করা যায় কিন্তু উপরোক্ত বিপাকে বড় অঘটন এড়াতে বিপরীত কার্য করারই রীতি। পরে অবশ্য অন্যায়ী শ্রমিকদেব খুঁজে বার করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আড়ালে ডেকে নিয়ামকরা ঐ উচ্চপদী কর্মীকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন এবং 'কেন ঐরূপ করা হলো' তা তাকে এই বলে বুঝানো যেতে পারে যে তা না করলে তাকে ওখান হতে উদ্ধার করা যেতো না, ইত্যাদি। তবে এও দেখতে হবে যে ঐ উচ্চপদী কর্মী [অকারণে] ট্যাক্টলেশ হওয়াতে ঐ অঘটন ঘটেছে কিনা। এই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে অধস্তনদের কনট্রোল করার অক্ষমতার জন্যে ভৎর্সনা করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, ট্যাক্ট দ্বারা অঘটন যারা এড়াতে পারে তারা নিশ্চয়ই দক্ষ অফিসার। বারে বারে একই উচ্চপদী কর্মী দ্বারা সমস্যা [ঝামেলা] সৃষ্টি হলে তাকে ট্যাক্টলেশ কর্মী রূপে অভিযোগ করা যায়। অধস্তনদের সাথে বনিবনা না হলে তখনই উর্ধ্বতনদের বদলি করা উচিত নয়। পরবর্তী কালে এক সময়

তাহা করলে নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষা হয়। তা না হলে পরবর্তী উচ্চপদী কর্মী ঐ সকল অধস্তনদের তাঁবে রাখতে অপারক হবেন। কিন্তু ঐ কারণে কোনও এক বড় অঘটন ঘটলে ঐ উর্ধ্বতনকে অন্য কোনও বিভাগে অপসারণ করা শ্রেয়ের কাজ।

ফ্যাকটরি ম্যানেজারদের ন্যায় মালিকদেরও বহু প্রশাসনিক ঝামেলা ভোগ করতে হয়েছে। কয়েক ক্ষেত্রে অবাধ্য ম্যানেজারকে শীঘ্র সরানোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে এঁরা মালিকদের এতো গোপন তথ্য জেনে ফেলেন যে এঁদেরকে একেবারে সরালে বিপদ আসে। এই ক্ষেত্রে এঁদের প্রমোশন দিয়ে অধিক বেতনে হেড অফিসে বা অন্যত্র নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। বেশ কিছুকাল পরে অবশ্য প্রয়োজন বোধে তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ম্যানেজার শ্রেণীর ব্যক্তিদের কোনও ফ্যাকটরি হতে হঠাৎ সরালে বিপর্যয় ঘটতে পারে। এইজন্য জনৈক উপযুক্ত চতুর বিশ্বাসী ব্যক্তিকে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার রূপে সেখানে আণ্ডার ট্রেনিং রাখা হয়। পরে ম্যানেজারকে অন্যত্র বদলি করে [কিংবা ছুটি মঞ্জুর করে] কিংবা বরখাস্ত করে তাঁকেই ম্যানেজার করা হয়। এই অবস্থাতে মূল ম্যানেজার ছুটি হতে ফিরে এলে তাঁকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হয় না। কখনও কখনও এই উদ্দেশ্যে ম্যানেজারকে কাজের ছুতাতে বিদেশেও পাঠানো হয়েছে।

(৩) ব্যবস্থাপক তথা নিয়ামকদের [ম্যানেজার] তাঁদের প্রতি শ্রমিকদের 'সেরিমোনিয়াল ফিয়ার' অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। অজানা বস্তু ও ব্যক্তিকে মানুষ ভয় ও সমীহ করে চলে। অজ্ঞতা ও দূরত্ব এই ভয়ের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এই জন্য ম্যানেজারদের কথা-বার্তা ও চালচলনে কখন নিজেদের সহজ সুলভ প্রতিপন্ন করা উচিত নয়।

তাঁদের অবশ্য শ্রমিকদের সাথে মধ্যে মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্তা কইতে হবে। কিন্তু তাঁদের মঙ্গলামঙ্গল ও সুবিধা-অসুবিধার বাইরে অন্য কথাবার্তা না কওয়াই ভালো। এতে দূরত্বের বিলোপ ঘটায় অতি সান্নিকট্যে তাঁদের প্রতি শ্রমিক সাধারণের—'সেরিমোনিয়াল ভীতি', বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মৃদু মিষ্টি হাসির সাথে গাম্ভীর্য-পূর্ণ ভাব এনে তাদের ব্যক্তিত্ব অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। কারুর আর্জি প্রত্যাখ্যান কালে স্নিগ্ধ হাসির সাথে এমন ভাবে তা করতে হবে যাতে মনে হয় যে ইচ্ছা থাকলেও অক্ষমতার কারণে তাদের ঐ আব্দার রক্ষা করা গেল না। কখনও উহা প্রকাশ্যে দুঃখের সাথে তাদেরকে বলাও যেতে পারে। কারুর সর্বোত্তম কার্য দেখলেও তার ঐ কাজকে সর্বোত্তম বলা উচিত হবে না। বরং তাকে উৎসাহ দিয়ে মিষ্টস্বরে বলতে হবে—'হ্যাঁ, ভালো। কিন্তু আরও ভালো চাই।' তাদের এনার্জি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এইরূপ বলা দরকার। কাউকে ভর্ৎসনা করলে তাকে অন্য শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। উর্ধ্বতনদের অবিচার হতে অধস্তনদের রক্ষা করা নিয়ামকদের প্রধান কর্তব্য। এই জন্য সর্বত্র সদা সজাগ দৃষ্টি রেখে তাদের সংবাদ সংগ্রহার্থে গুপ্তচর নিয়োগ পর্যন্ত শ্রেয়ের কাজ। কাউকে জরিমানা করার সময় তার মাসিক বেতন বিবেচনা করে তার হার নির্ণয় করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সুষ্ঠু তদারকির অভাবে ভালো লোকও [অভাবে বা দুর্বলতাতে] মন্দ হয়ে পড়ে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভালো কাজের স্বীকৃতি চায়। এজন্য কে প্রকৃত ভালো কর্মী তাকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব উর্ধ্বতনদের। অন্যথায় তাঁরা প্রোপাগাণ্ডাতে বিভ্রান্ত হতে পারেন। পার্শ্বের টেবিলে কর্মরত অসৎ কর্মীকে পদোন্নতি করতে দেখলে

সৎ ব্যক্তিরও অসৎ হওয়ার প্রবৃত্তি হয়। উপযুক্ত শ্রমিকদের কেউ তাদের সমীপে উপযুক্ত পদোন্নতির দাবি পেশ করলে ম্যানেজারগণ যেন গর্বের সাথে বলতে পারেন,—'আই নো [know] মাই ডিউটি।' শ্রমিকদের প্রতি অতি উর্ধ্বতনদের সরাসরি হুকুম প্রদান ও তাদের কার্যের তদারকি সর্বত্রই পরিত্যাজ্য। এখানে তাদের প্রতি যা কিছু হুকুম তা তদারকি কর্মী ও বিভাগীয় কর্তাদের মাধ্যমে দেওয়া চাই। শ্রমিকদের কাজে গাফলতি দেখলে শ্রমিকদের সরাসরি ভৎর্সনা না করে বরং সুষ্ঠু ভাবে তদারকি কার্য না করার জন্য উচ্চপদী কর্মীদেরই [তাদের সামনে] ভৎর্সনা করা উচিত। এতে উচ্চপদী কর্মীদের তাদের অবহেলার জন্য অপদস্থ হতে দেখে তারা [শ্রমিকরা] লজ্জিত হয়ে কাজে আর গাফলতি করে না। ঐ সকল উচ্চপদী কর্মীরাও আরও কঠোরতার সাথে তদারকি কার্য শুরু করেন। এতে জনপ্রিয়তা-হানি [আনপপুলারিটি] প্রত্যেক শ্রেণীর উচ্চপদী কর্মীদের মধ্যে ভাগা-ভাগি হয়ে যায়। ম্যানেজারকে সাক্ষাৎ ভাবে নিজে তদারকি করতে গিয়ে একাকী জনপ্রিয়তা হারাতে হয় না! উপরন্ত ম্যানেজারদের সাক্ষাৎভাবে হস্তক্ষেপ তদারকি কর্মীদের ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করে। ভুলে গেলে চলবে না যে এই জটিল পৃথিবীতে একা সব কাজ করা যায় না। এজন্য সকল কাজ সকলের দ্বারা করিয়ে নেওয়া চাই। এই জন্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ নানা শ্রেণীর তদারকি কর্মীর নেট্ওআর্কের প্রয়োজন হয়ে থাকে। মধ্যেকার অফিসারদের ডিঙিয়ে নিম্নপদীদের সাথে সাক্ষাৎ সংযোগ নিশ্চয়ই বিপর্যয়ের কারণ হবে। স্বভাবতঃই নিম্নপদীদের মন মেজাজ তদারকি কর্মীদের মত ম্যানেজারের পক্ষে জানা সম্ভব হতে পারে না। যেহেতু ম্যানেজারগণ সর্বোচ্চ আপিলের অথরিটি সেহেতু তাঁর পক্ষে স্বয়ং কারুর বিচার বা কারুকে শাস্তি দেওয়া বা কারুর

দোষের তদন্ত করা কোনও ক্রমেই উচিত হবে না। অপরের নামে অভিযোগ এলে ম্যানেজার বিচার করে থাকেন। এই ক্ষেত্রে মালিকের অগোচরে ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি স্বয়ং শুধরাতে বা সামলাতে পারবেন। কিন্তু নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে উহাতে জড়িত হ'লে কার কাছে শ্রমিকরা অভিযোগ করবে? ঐ স্থলে তারা বাধ্য হয়ে তাঁর বিপক্ষে মালিকদের শরণাপন্ন হলে উহা অবমাননাকর হয়। এইজন্য ম্যানেজারের পক্ষে সাক্ষাৎ ভাবে কোনও মামুলি বিষয়ে নিজেকে জড়ানো উচিত নয়। বরং শ্রমিকদের গাফলতি সমূহ দেখেও না দেখার ভান করে ফিরে এসে সংশ্লিষ্ট তদারকি কর্মীকে ডেকে ভৎর্সনা করা যেতে পারে। এক দল ব্যক্তিকে শায়েস্তা করার সময় অপর দলকে একটু আসকারা দেওয়াই ভালো। এক সাথে সব ফ্রন্টে লড়াই বাধানো কখনও কাম্য নয়। বরং এক দলের সাহায্যে অপর দলকে শায়েস্তা ক'রে পরে ঐ শায়েস্তা হওয়া দলের সাহায্যে পূর্বতন দলটিকে শায়েস্তা করা বাঞ্ছনীয়। বহু ম্যানেজার স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজপুরুষদের খুশি রাখার জন্য তাঁদের সাথে আলাপ রাখতে চান। এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে দেখা করার সাথে সাথে তাঁদের আত্মীয়দের চাকুরি দেবার অনুরোধ আসে। চাকুরি তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিদের না দিতে পারলে বা তা দেওয়ার পর অদক্ষতার জন্য তাদেরকে বরখাস্ত করলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া ঐ সকল ব্যক্তি মুহুর্মুহু অন্যত্র বদলি হয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে চেনার চেয়ে অচেনা থাকাই ভালো। এ জন্যে মাত্র প্রয়োজনের কয়দিন পূর্বে তাঁদের নিকট আর্জি পেশ করা উচিত। বহু ম্যানেজার পুলিশের করণীয় কাজ প্রাইভেট পুলিশ তথা গুণ্ডাদের দ্বারা করাতে চান। কিন্তু গুণ্ডা এবং পুলিশ কখনও কারও আপনার হয় না। বহু ম্যানেজার মালিকদের নিকট নিজের কৃতিত্ব প্রমাণের জন্য ইচ্ছা করে শ্রমিক-

বিভ্রাট সৃষ্টি করে তা জিইয়ে রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু অল্ দি টাইম অল দি পিপল্‌কে ব্লাফ দেওয়া সম্ভব নয়। ঐক্ষেত্রে ওনাদের নাচানো বাঁদর পরে ওঁদেরকেই কামড়ায়। জনস্বার্থের কারণে এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা শ্রেয়ঃ না হলেও ঐ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি তথ্য নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

(১) প্রশাসকদের প্রায়ই ভিজিটরদের [সাক্ষাৎ-প্রার্থী] সহিত স্ব স্ব চেম্বারে বা নির্দিষ্ট কক্ষে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়। প্রতিদিন ঐরূপ বহু ব্যক্তি তাঁদের প্রার্থনা বা অভিযোগ জানাতে অফিসের দুয়ারে এসে ঐ কক্ষের বহির্দেশে উপবিষ্ট বেয়ারার মারফৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জানিয়ে নেম-কার্ড বা পরিচয়-পত্র পাঠা'ন। বহু প্রশাসক এঁদেরকে পর পর ডাকিয়ে [একে একে] এঁদের সাথে দেখা করার পক্ষপাতী। ঐ সকল ব্যক্তি সহজে তাঁদের বক্তব্য শেষ করে সেখান হতে উঠতে চান না। বহু ক্ষেত্রে তাঁরা প্রশাসকদের স্বমতে আনয়নে অযথা পীড়াপীড়ি করেন। এতে বহু সময়ের অপচয়ে কাজ-কর্মের অসুবিধা হয়। এমন বহু প্রশাসক ঐ অসুবিধা এড়াতে ওঁদেরকে একত্রে ডাকিয়ে অফিসে তাঁর সম্মুখেতে বসান। এই উদ্দেশ্যে বহু চেয়ারও ঐ অফিসে রাখা হয়। এঁদেরকে একে একে সেখানে তাঁদের আর্জি পেশ করতে বলা হয়। এতোগুলি ব্যক্তিকে অপেক্ষারত দেখে দর্শনপ্রার্থীরা তাঁদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হন এবং কোনও বিষয়ে ঐ প্রশাসককে সর্বসমক্ষে পীড়াপীড়ি করতে লজ্জিত হন। একজন এঁদেরকে সত্বর উঠানোর জন্যে কাষ্ঠাসন তথা চেয়ারে ছারপোকা কালচার পর্যন্ত করেছিলেন। কয়েক ক্ষেত্রে বক্তব্য গোপনীয় বুঝলে সেই ব্যক্তির সাথে পরে সাক্ষাৎ করা যেতে পারে। অন্যদের মতে অফিস-

কক্ষ মেছোহাটাতে পরিণত হলে উহার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। এখানে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা সমীচীন।

দর্শনপ্রার্থীরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে বেদনাতুর হয়ে কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎ-প্রার্থী হন। উহার প্রতিকারে অসমর্থ হলেও তাঁদের অভিযোগ ধৈর্যের সাথে শুনলে তাঁদের মনের বেদনার লাঘব হয়। [কাঁদলে বা বললে ব্যথা কমে।] এঁদেরকে সহানুভূতির বাণী শুনালেই এঁরা খুশি। যৌথ আনুগত্য তথা মরেল রক্ষার্থে এবং বিক্ষোভ এড়াতে ইহার প্রয়োজন আছে।

ইনডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজারদের কোনও কালে ভয়াতুর স্পর্শকাতর হলে চলে না। কেউ কড়া কথা শুনালে মাত্র মাথা নেড়ে একটু হেসে তিনি প্রতিবাদ করবেন। কেউ গাল দিলে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন তিনি তা শুনতে পান নি। পরে অবশ্য ঐ ব্যক্তিকে অন্য ভাবে জব্দ করা যেতে পারে। কয়েক ক্ষেত্রে অবশ্য তখুনি উহার প্রতিবিধান করা প্রয়োজন। উত্তেজিত শ্রমিকদের বিনা বাধায় কথা বলতে দিলে এবং তাদেরকে প্রাণভরে গাল পাড়তে দিলে তাদের মনের ক্ষোভ বিদূরিত হয়ে উহা হাল্কা হয়। ওদের মিটিংএ ও প্রসেশনে চেঁচিয়ে মনের খেদ বার করে ওরা মনের শান্তি ফিরে পায়। সুতরাং এতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। গুমরে না থেকে চেঁচালে তারা কামড়ানোর শক্তি হারায়। বহু প্রশাসকের ধারণা ঐখানে তারা দল পাকায়। এজন্যে কোন্ পার্টির কে কোথায় সভা করলো তাঁরা তার খোঁজ করেন। শ্রমিকদের মতিগতি ও ভবিষ্যৎ কার্যপন্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা অবশ্য শ্রেয়ের কাজ।

(২) বহু প্রশাসক অভিযোগ শুনা মাত্র তা বিশ্বাস করে তদন্ত করে জানেন যে উহা সত্য কি'না। অন্যেরা উহা প্রথমে অবিশ্বাস

করে তদন্ত করে বুঝেন যে উহা সত্য কি'না। মানুষের মন সর্বদা অবিশ্বাসী না হয়ে বিশ্বাসী হয়। ফলে অনেকে চুকলামি, চাটুকারিতা ও বহিঃচাকচিক্যে ভুলে যান। চিত্ত-প্রস্তুতি [প্রিডিসপোসিশন], পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাব ও মনোজটের [কমপ্লেক্স] কারণে বহু অবিচারও তাঁরা করে বসেন। কিন্তু বন্ধুকে শত্রু না করে শত্রুকে ডিপ্লোমেসিতে বন্ধু করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে অযথা 'বিরোধীয় দল রাখা কখনও শ্রেয়ঃ নয়। অধস্তন কর্মচারীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে টাইম সার্ভার হয়ে থাকে। যার অধীনে যখন তারা থাকে তখন তারা তারই কথা কয়। স্বার্থ রক্ষার্থে তাদের মত ও পথ তারা ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। এজন্য অন্যত্র তাদের অন্যের অধীন থাকা কালীন পূর্ব ব্যবহারের কারণে অযথা তাদের আনুগত্যে সন্দিহান হওয়া নিরর্থক। বদলির সাথে সাথে তারা পূর্ব মনিবের মত বর্তমান মনিবের অনুগত হয়। বহু প্রশাসক এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে গোপনে তাঁকে কিছু বললে তা তখুনি সেই ব্যক্তির গোচরে আনেন। এতে বহু গোপন সংবাদ জানতে তাঁরা অপারক হন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কবল হতে সত্য সংবাদ-দাতাদের রক্ষা করাও প্রশাসকদের পবিত্র কর্ম। সাঙ্ঘাতিক সংবাদ না হলে অধস্তনদের ঊর্ধ্বতনদের বিরুদ্ধে গোপন নালিশে উৎসাহ না দেওয়া ভালো। এতে প্রতিষ্ঠান সমূহে নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। এছাড়া বিবিধ মনোজট বা কমপ্লেক্স এবং চিত্ত-প্রস্তুতি প্রভৃতির কারণে বহু অবিচার ঘটে থাকে। এইরূপ একটি অঘটনের দৃষ্টান্ত নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমি অকারণে আমার জনৈক অধস্তনকে দেখা মাত্র বিরূপ হয়ে উঠতাম। এর প্রকৃত কারণ বুঝতে আমি আত্ম-বিশ্লেষণে তথা মনো-বিশ্লেষণে রত হই। মনের পথে পিছুতে পিছুতে আমি বুঝি যে

বাল্যকালে ঐরূপ আকৃতির এক ব্যক্তি আমাকে অপমানিত করলেও তার বিরুদ্ধে আমি তখন কোনও প্রতিশোধ নিতে পারি নি।"

সর্প আসলে এক প্রকার ভীরু জীব। সে ভয় পায় বলে কামড়ায়। অনুরূপ ভয়াতুর বহু প্রশাসকের সদা ভয় যে ঐ বুঝি তাঁকে অন্যকে তাচ্ছিল্য বা তাঁর ক্ষতি করলো। হীনমন্যতার তথা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের কারণেও ইহা ঘটে। ফলে, তখুনি উনি তাদের আক্রমণ করে ক্ষতি করেন। সুবিধাজনক ভাবে ক্ষমতাসীন পদে থাকাতে এঁরা দুর্বল ব্যক্তিদের অপকার করতে সক্ষম। কিন্তু এঁদের বুঝা উচিত যে অত্যাচারে ও অবিচারে পিঁপড়ারাও সুযোগ মত একাকী বা দল বেঁধে কামড়াতে পারে। কারুর কাছে উত্তেজনা এক প্রকার ফুড্ বা খাদ্য। তাঁরা এজন্যে সর্বদা হৈ চৈ করা ভালবাসেন। ইহা তাঁদের একটি নিকৃষ্ট রূপ মনোজট বা কমপ্লেক্স। অহেতুক ভয়ে বহু ম্যানেজার গুলিবর্ষণ করে জীবনহানিও ঘটিয়েছেন।

(৩) বহু কার্য একত্রে গ্রহণ না করে উহাদের একটি সমাধা করে অন্যটি গ্রহণ করা উচিত। কারুর মতে উহাদের একত্রে গ্রহণ না করলে পরে অন্যগুলির সন্ধান মিলে না। একা সকল কাজ না করে সকলকে দিয়ে সকল কাজ করানো উচিত। হয় নিজে খাটো, নয় ওদেরকে খাটাও। এই উভয়ের একটিও না করতে পারলে বিপদ অনিবার্য। আত্মবিশ্বাসহীন প্রশাসকরা অধস্তনদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে ভয় পান। কিন্তু দক্ষ প্রশাসক উপযুক্ত সহকারী তৈরি করেন। অন্যায়মন্য হুকুম পালন করার পর মাত্র উহার প্রতিবাদ করা যেতে পারে। বহু হুকুম কার্যক্ষেত্রে তামিল করা যায় না। ফলে, স্বল্প কাল পরে উহা প্রতিপালিত হয় না।

অতএব এমন হুকুম দিতে হবে যা পালন করা সম্ভব। বহু হুকুম সুবিবেচিত মনে না হলেও উহা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা উচিত। বহু প্রশাসক হুকুম দেওয়ার পর উহা তামিল করা হলো কি'না দেখেন না। কিন্তু উহা নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ করে বিপর্যয় আনে।

[জনৈক শিল্পপতিকে তাঁর ম্যানেজারকে আমি বলতে শুনেছিলাম, 'বাবুজী! উলোক ঘর না ছোড়েতো কালহী রাতমে ওহী ঘর মে জ্বালায় দেগে।' ঐ ম্যানেজারকে পরে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, পরদিন ঐ বিষয় পুছ করলে উনি কি বলবেন? আমার এই উত্তরে ঐ ম্যানেজার বলেছিলেন, 'হাঁ! উবাত মনে পড়লে উনি তা জিজ্ঞাসা করবেন। এর উত্তর আমার ভালো ভাবে এইরূপ ভাবা আছে— হুজুর! ওরা গোড় পাকড়ে 'উঠে যাবো' বললো। তাই ঐ রাত্রে ওর ঘর জ্বালাই নি। হামাদের তো উঠানোই কাম।' পরে ওঁরা ঐ সব বিলকুল ভুলে যাবেন। ঐ হুকুম কোন ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন এবং তা আদপে কাউকে দিয়েছিলেন কিনা পারসিউ না করাতে ওঁদের তা মনে থাকবে না।]

সিপাহী-জমাদার, নিম্নপদী উচ্চপদী ছোট-সাহেব বড়-সাহেব প্রভৃতির স্ব স্ব নির্দিষ্ট কর্ম আছে। যে দক্ষ জমাদার সে দক্ষ সিপাহী নাও হতে পারে। এর জন্যে একের কাজ অপরকে করতে দেওয়া ঠিক নয়। সাধারণ শ্রমিকদের প্রতি প্রতিটি আদেশ [শ্রেণী মত পর পর] উহাদের নিজ নিজ ঊর্ধ্বতন কর্মীর মাধ্যমে দেওয়া চাই। অন্যথায় ম্যানেজারের নিজের সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ম্যানেজমেণ্টের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের রোষ তাদের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতনরা সংযত করেন। ঐ তদারকি কর্মীরা সাক্ষাৎ ভাবে তাঁদের অধীন কর্মীদের দুর্বলতা জানেন।

প্রতিদিন নিবিড় সাক্ষাতে তাদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা জন্মায়। তদারকি কর্মীদের সম্মান ও প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন থাকলে ম্যানেজার প্রভৃতি প্রশাসকেরও সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় থাকে।

(৪) বহু প্রশাসকের মতে জয়েন করার পর কিছু কাল স্ট্রিক্ট বা গরম থাকা ভালো। পরে ধীরে ধীরে নরম বা লিনিয়েন্ট হলে চলবে। কিন্তু বিপদ বুঝে হঠাৎ স্ট্রিক্ট হওয়া ঠিক নয়। ঐ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সইয়ে সইয়ে স্ট্রিক্ট হতে হবে। কারুর স্ট্রিক্টনেস্ মানুষ অভ্যাস দ্বারা মেনে নেয়। অতি স্ট্রিক্ট বা অতি সফট্ না হয়ে মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণীয়। অধস্তনদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে সুনাম অর্জন সম্ভব নয়। প্রথম প্রথম কয়েকদিন অধস্তনদের খুঁটিনাটি কাজ পরীক্ষা করে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে কে কোন্ বিষয়ে কতটুকু পারদর্শী, কে কতোটা বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভর-যোগ্য, সৎ বা অসৎ কে ও কারা ফাঁকিবাজ বা ধাপ্পাবাজ, কার কোথায় কতটুকু দুর্বলতা, কার প্রতি কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নিষ্প্রয়োজন ইত্যাদি অধস্তনদের গুণ ও দোষ জানা যেতে পারে। প্রয়োজন মত এদের কাকে কোন্ বিশেষ কার্যে নিয়োগ করা বা না করা উচিত—তা প্রশাসকগণ এরূপ পন্থাতে পূর্বাহ্নে অবগত হন। এ'ক্ষেত্রে পরে নির্ভরযোগ্য অফিসারদের কাজ-কর্মে অতো লক্ষ্য না রাখলেও ক্ষতি নেই। এতে তদারকি কার্যের গণ্ডী কমে আসাতে বৃথা এনার্জি এবং সময়ের অপচয় হয় না।

(৫) কোনও প্রশাসক মনে করেন যে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপর তাঁদের মনোমত কর্মী নিয়োগ করার ভার দেওয়া উচিত। তাতে উপযুক্ত কর্মী সিলেকশনের দোষে কর্ম নষ্ট হওয়ার অজুহাতে নিজেদের কর্ম-সম্পর্কিত দায়িত্ব ওঁরা এড়াতে পারেন না। কেউ কেউ মনে করেন যে,

ঐ কর্মী নিয়োগের ভার কানুন মত লেবর অফিসারের উপর থাকা উচিত। তা না হলে বিভাগীয় কর্মকর্তারা স্বজনদের মধ্য হতে কর্মী নির্বাচন করে বিভাগে নিজেদের সমর্থনকারী দল [ক্লিক] সৃষ্টি করবেন।

বহু ম্যানেজার ভবিষ্যতে সাহায্যের আশাতে ক্ষমতাসীন সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিদের সাথে আগে-ভাগে বন্ধুত্ব রাখার পক্ষপাতী। উপকার করার ক্ষমতা ওদের আছে কি না তা না জেনে ও বুঝে তা তাঁরা করেন। বহু ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন অপেক্ষা তাঁদের অধীন কর্মী হতে বেশি কাজ পাওয়া যায়। তাই উভয় স্থরেই সংযোগ রাখা দরকার। কাজ আদায়ের অব্যবহিত পূর্বে তাদের সাথে দেখা করা ভালো। পূর্ব হতে ভাব জমালে তাঁদের আশ্রিতদের জন্যে তাঁরা ফ্যাকটরিতে চাকুরি চান এবং তা না দিতে পারাতে তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। বেশি আলাপ থাকার কারণে এঁদের কোনও অভিযোগে তাঁরা চিন্তিত থাকেন না। কিন্তু আলাপ না থাকলে ওঁদের উপর মহলে নালিশ করার সম্ভাবনা থাকাতে ওঁরা ঐসব অভি-যোগের প্রতিকারার্থে ব্যস্ত হন। সকল সময়ে চাহিবা মাত্র পুলিশী সাহায্য না পাওয়াতে বহু প্রশাসক প্রাইভেট পুলিশ রাখেন। এ জন্যে প্রতিটি ফ্যাকটরিতে সিকিউরিটি বিভাগ আছে। কিন্তু মিলের ভিতরে ও বাহিরে তাদের পুলিশী ক্ষমতা কৈ? শ্রমিক বিক্ষোভ দমনে কিংবা আত্মরক্ষার্থে কেউ কেউ গুণ্ডার বিরুদ্ধে গুণ্ডা নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রীয় পুলিশ করণীয় কার্য দ্রুত না করলে সমাজে আদর্শবাদী প্রতিরোধী দল তথা প্রাইভেট পুলিশ সৃষ্টি হয়। ঐ গুণ্ডা কারুর আপনার নয় বুঝলেও বহু ম্যানেজার সঙ্গত কারণে গুণ্ডা পুষতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, বিরোধীয় ব্যক্তিরা চাকুরির জন্য চাঁদা ও টোল আদায়ার্থে এবং

অন্যান্য বহু প্রকার কারণে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে এদেরকে নিয়োগ করে। পুলিশের আগমনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সম্পত্তি ধ্বংসে উদ্যত বিদ্রোহী শ্রমিকদের রুখতেও এদের প্রয়োজন হয়। এই কারণে অধুনা পৃথক ইণ্ডাস্‌ট্রিয়াল পুলিশের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু এই সকল গুণ্ডা দ্বারা গুণ্ডা প্রতিরোধে বিপদ আছে। এরা পরে ম্যানেজারের উপরে অর্থ আদায়ের জন্য গুণ্ডামি শুরু করে। এদের মাত্রাজ্ঞানহীনতার জন্যে খুন-জখম হলে এরা ম্যানেজারকে জড়িয়ে পুলিশে বিবৃতি দেয়। এদের কেউ জেলে গেলে এরা পরিবার প্রতিপালনের অছিলায় তাদেরকে ব্ল্যাক-মেইল শুরু করে। ঐ সকল অপরাধী ব্যক্তিরা উপযুক্ত না হয়েও ফ্যাকটরির চাকুরির জন্য বারে বারে তাঁদেরকে পীড়াপীড়ি করে।

(৬) প্রশাসকগণ নিজেরা অ্যাপেলেট্ অথরিটি হলে তাঁদের পক্ষে কর্মীদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তদন্ত করা বা তাতে আগ্রহ প্রকাশ করা অনুচিত। অন্যান্য কারণেও স্বয়ং তদন্তাদি ব্যবস্থা অবলম্বন না করে ঐ কাজের ভার ওঁদের অধীন কোনও উচ্চপদী কর্মীর উপর অর্পণ করা ভালো। ঐ উচ্চপদীদের বিরুদ্ধে অধস্তনদের কোনও কমপ্লেন এলে ম্যানেজার স্বয়ং তদন্ত করে উহা বাতিল করতে পারবেন। কিন্তু ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কমপ্লেন হলে উহা মালিকের এক্তিয়ারে আসে। এ কারণে ছোট-খাটো ঘটনাতে নিজেকে না জড়ানো ভালো। প্রশাসনে কোনও দয়া বা ক্ষমার স্থান নেই। এই ক্ষমা আধা-আধি হয় না। তদারকি কার্যে কর্মীদিগকে মুহুর্মুহু পুরস্কার-তিরস্কার করতে হয়। এজন্যে তদারকি কর্মীদের জনপ্রিয়তা তথা পপুলারিটি ক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। এই অপ্রিয়তা সকলের মধ্যে ভাগাভাগি হলে ম্যানেজারকে একা অপ্রিয় হতে হয় না। এ'জন্য সাধারণ কর্মীদের উপর নিজে স্ট্রিক্ট না হয়ে [ওদের সাথে কথাটি না কয়ে] ঐ তদারকি

কর্মীর উপর ম্যানেজারকে ষ্ট্রিক্ট হতে হবে। ম্যানেজার তদারকি কর্মীদের উপর চাপ দেবেন আর তদারকি কর্মীরা সাধারণ কর্মীদের উপর চাপ দেবেন। এতে তদারকি কর্মীরা ম্যানেজারের ওপর কঠোরতা সম্পর্কিত দোষ চাপিয়ে নিজেরা পপুলারিটি অর্জন করে দল পাকাতে পারবেন না। তদারকি কর্মীদের ওদের সম্মুখে বকাবকি করার অর্থ পরোক্ষে সাধারণ শ্রমিকদের বকাবকি করা। এই বলে ওদেরকে মৃদুভাবে ধমকানো যেতে পারে যে 'ওরা তো সুবিধে পেলে ফাঁকি দেবেই। কিন্তু তোমরা ওদের ওপর নজর রাখো কৈ? তাহলে তোমাদের সকলকেই অন্যত্র কাজ খুঁজতে হবে' ইত্যাদি। তদারকি কর্মীদের একান্তে [চেম্বারে] ডেকে তাদের উপর ঐ বিষয়ে চাপ দেওয়া আরও ভালো। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সম্ভব মত এড়ানো উচিত। আর্মি ও পুলিশে পরিদৃষ্ট নিয়মতান্ত্রিক কঠোরতা শ্রমশিল্পে অচল। অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হলেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বারে বারে অভিযোগ আসে কেন? এতে তাঁরা ট্যাক্টলেশ, অতিষ্ট্রিক্ট, এমব্রেসিঙ্ আখ্যায় ভূষিত হতে পারেন। যে কাজ একদিনে করা যায় সেই কাজ পরের দিন পর্যন্ত মুলতুবি রাখা ঠিক নয়। কারণ পরের দিন আরও বহু কার্য উপস্থিত হবে। যে কাজ নিজে সামলানো যায় তা মালিকদের গোচরীভূত না করাই ভালো। মালিকদের কাজ দেখানোর জন্য কেহ কেহ উহা করেন বটে, কিন্তু মুহুর্মুহু সমস্যা সৃষ্টি মালিকরা পছন্দ না'ও করতে পারেন। বহু ম্যানেজার নিজেদের কৃতিত্ব দেখানোর জন্যে কিংবা মালিকদের ভয় দেখানোর জন্য নিজেরা ধর্মঘট ঘটিয়ে উহা তাঁরা পরে নিবারণে সচেষ্ট হন। কিন্তু ইহাতে তাঁদের নিজেদেরই পক্ষে ক্ষতিকর কুফল ঘটে থাকে।

বহু ম্যানেজার বিপদ বুঝলে ছুতা করে আড়ালে সরে থেকে

অধস্তনদের মালিকদের সম্মুখে এগিয়ে দেন। ঐ সুযোগে অধস্তনরা ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে ঠারে ঠোরে চুকলি করে এবং নিজেকে বিকল্প ম্যানেজার রূপে জাহির করে। বহু সত্যের সাথে কিছু মিথ্যা বললে বিশ্বাসযোগ্য হয়। বহু প্রশাসক নিজেরা উপস্থিত থাকলে তাঁকে ডিঙিয়ে অধস্তন কর্মীকে মালিকের নিকট যেতে দেন না। অবশ্য ওদের মধ্যে বিশ্বস্ত ও উপযুক্তমন্য কাউকে নিজেদের অবর্তমানে কাজ চালানোর জন্য ট্রেণ্ড করার প্রয়োজন হলে তা স্বতন্ত্র কথা। ব্যবসায়ে লোকসান কালে মালিকেরা মনের দুর্বলতাতে চুকলামিপ্রিয় হয়ে উঠেন। এখানে আশার বাণী শুনিয়ে মালিকদের আশ্বস্ত করা উচিত। অবুঝ মালিকদের ভালোর জন্যে কয়েক ক্ষেত্রে তাঁদেরকে মিথ্যা ব'লে বা ধাপ্পা দিয়ে সামলাতে হয়। বহু ক্ষেত্রে ভুল কাজ ঠিক আছে ব'লে তাঁদেরকে বুঝিয়ে পরে সেই ভুল সেরে নিতে হয়। কোনও অধস্তন তা না বুঝে প্রকৃত তথ্য ম্যানেজারের অবর্তমানে তাঁদেরকে জানালে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এইজন্যে এদের সকলকে মালিকের নিকট যখন তখন যেতে দেওয়া উচিত হবে না।

বহু ম্যানেজার নিজেরা স্বয়ং কিংবা অধীন কর্মীদের দ্বারা মালিকদের ব্যক্তিগত কার্য করেন ও করান। মালিকদের বুঝা উচিত যে ঐ প্রথা কায়েম হলে ম্যানেজার নিজের ব্যক্তিগত কাজও ওদের দ্বারা করিয়ে নেবে। ঘরের কাজের সুযোগে ঐ কর্মীরা মালিকদের ও ম্যানেজারদের অন্তঃপুরের সাথে যোগ স্থাপন করে তাঁদের পত্নীদের ভরসাতে ফ্যাকটরির নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ করেন।

(৭) বহু ভীরু প্রকৃতির প্রশাসক সামান্য শ্রমিক বিক্ষোভে বা উহার সম্ভাবনাতে ফ্যাকটরিতে পুলিশ ডাকার পক্ষপাতী। কিন্তু ঐ

তৃতীয় পক্ষের আগমনে উহা আর তাঁদের ঘরোয়া বিবাদ থাকে না। চরম ব্যবস্থাবলম্বনের কারণ না ঘটলে ফ্যাকটরিতে পুলিশ না ডাকা যুক্তিসঙ্গত। পুলিশ এলে সেখানে প্রায় অন্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। ম্যানেজার তথা ব্যবস্থাপক এবং নিয়ামক তথা ডিরেক্টারের ফল্‌স্‌ প্রেসটিজ পরিহার্য। বিক্ষোভের অদৃশ্য মূল কারণ তাঁদেরকে খুঁজে বার করতে হবে। কয়েকজন মারমুখী শ্রমিকের পিছনে ভিড়েতে বেশি সংখ্যায় নির্বিরোধী শ্রমিক খাড়া হয়ে যায় মাত্র। 'আচ্ছা য'ও! কালকে এখানে এসো। এই অন্যায়ের বিহিত নিশ্চয়ই করবো'—এই ব'লে সাহসিকতার সাথে স্নেহসূচক ধমকে তাদের বিদায় করলে পরদিন তাদের মনে ঐ টেম্পো আর থাকে না। জন-গণের মনের রোষ সম্পর্কিত টেম্পো প্রায়ই চারদিনের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। এজন্য ছুতায়-নাতায় তাদেরকে আশাতে রেখে কালক্ষেপ করা উচিত। বহু ক্ষেত্রে ঐ বিষয়ে অন্যায়ের সাথে কিছুটা আপোশ করতে হয়। শ্রমিকদের দোষ বুঝেও ওদেরকে তখনকার মত শান্ত করতে ওদের অভিযোগে নির্দোষ উর্ধ্বতন বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে তাদের সম্মুখে ট্যাকট্‌লেশ বলে ধমকানো প্রয়োজন হয়। পরে অবশ্য তাকে ডেকে একান্তে বা সর্বসমক্ষে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে। শ্রমিকদের বলতে হবে যে, যেহেতু অতো ব্যক্তির সাথে একত্রে আলাপ করা অসুবিধা, সেহেতু তোমাদের নেতৃস্থানীয় বা মুখপাত্রদের কয়জনকে আমার চেম্বারে পাঠাও। এই ভাবে ওদের মধ্যে প্রকৃত আন্দোলনকারীদের চিনে বুঝে পরে সুযোগ-সুবিধামত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। সাধারণতঃ সকল শ্রমিক কখনও এক হতে পারে না। ওদের মধ্যে একদল লড়াকু প্রকৃতির সংখ্যালঘুরা এক হয় এবং ওদের ভয়ে ও চাপে কিংবা লোভে অন্যেরা তাদের অনুসরণ করে। ঐ

লড়াকু শ্রমিকদের অপসারণ করা মাত্র ওদের ঐ দল ভেঙে পড়ে।

(৮) প্রশাসকদের কাবুলি উত্তমর্ণদের নিকট হতে কার্যকরণ শিক্ষা করা উচিত। দুইজন কাবুলি একত্রে ধার দেওয়া অর্থ আদায় করতে যায়। ওদের একজন লাঠি উঁচিয়ে মারমুখী হলে ওদের অন্যজন বন্ধুকে শান্ত করে বলে—'আরে! মাৎ মারো। রুপেয়া উনে দে'দেগা।' অনুরূপ ভাবে শ্রমিক বিক্ষোভে জনৈক কর্তাকে গরম হয়ে তাদেরকে ভয় দেখাতে হবে। এতে উনি অকৃতকার্য হলে অন্য কর্তাব্যক্তি সেখানে তাঁকে শান্ত করে শ্রমিকদের ভালো কথা শুনাবেন। কিন্তু যিনি একবার গরম হবেন তাঁর আর নরম হলে চলবে না। এইরূপ নরম-গরম পন্থাতে [পরস্পরের সাথে বন্দোবস্ত করে] অভিনয় দ্বারা বিক্ষোভ দমন সম্ভব।

শ্রমিক-বিক্ষোভ কালে ঘটনার পরিস্থিতি জেনে ও বুঝে ঘটনা স্থলে কর্তৃপক্ষের আসা উচিত। সেখানে উপস্থিত হয়ে কি করা হবে—তা' পূর্বাহ্নে ভেবে রাখলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে হয় না। ম্যানেজারের সেখানে অবমাননা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেখানে তাঁর স্বয়ং না যাওয়াই উচিত। কারণ ম্যানেজার হৃতমান হলে সেখানে তাঁর পক্ষে কাজ করতে অসুবিধা হবে। ঐরূপ দুর্ঘটনা দৈবক্রমে ঘটে গেলে অপরাধীদের ক্ষমা করলে চলবে না। অবস্থা অনুকূল হলে ম্যানেজার স্বয়ং ঘটনা স্থলে আসবেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁর দ্রুত উপস্থিতি দ্বারা শ্রমিক-বিক্ষোভ সহজে এড়ানো যেতে পারে।

(৯) এদেশে বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্মান অগ্রগণ্য [ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী] হওয়ায় বয়স্ক অধস্তন কর্মীদের প্রতি হুকুম প্রদানে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এদের উপর স্বল্পবয়স্ক তদারকি

কর্মীদের রূঢ় বাক্য প্রয়োগ সাধারণ অসংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনে। কয়েক ক্ষেত্রে সেবর অফিসার শ্রেণীর কর্মীরা পদমর্যাদাতে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমকক্ষ হলেও তাঁরা ম্যানেজারের হুকুম বা নির্দেশ পাঠান। এ'ক্ষেত্রে তাঁদের প্রথমে বিভাগীয় কর্তাদের কক্ষে স্বয়ং গমন করে উহা তাঁদেরকে জানানো ভালো। পরে অবশ্য তাঁদের কাউকে নিজের অফিসে আলোচনার্থে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। তবে ঐ আমন্ত্রণ জানাতে চাপরাশী না পাঠিয়ে কোনও দায়িত্বশীল করনিককে সেখানে পাঠানো ভালো। কিন্তু বারে বারে এইরূপ আমন্ত্রণ তাঁরা আদেশ বুঝে একদিন উহা প্রত্যাখ্যান করবেন। এ অবস্থাতে পরস্পরের মধ্যে অহেতুক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। ইংবাজি 'প্লীজ' ও 'রিকোয়েস্টেড' এবং হিন্দিতে 'সেলাম দিয়া' প্রভৃতি যে আদেশেরই নামান্তর তা তাঁরা ভালো রূপেই বুঝেন। ঐ সকল নির্দেশ মামুলি না হলে ম্যানেজারের স্বয়ং তাঁদেরকে তা জানানো উচিত। হুকুম একটু কায়দা করে তাদেরকে আপ্ [up] করে দিতে হবে। যথা, 'আরে! তোমার মত উপযুক্ত লোক এটা পারবে না? এ কি হতে পারে নাকি, অ্যাঁ?'

[পুরাতন শ্রমিকসঙ্ঘগুলির সাথে ঘন ঘন বৈঠকে বসতে ক্ষতি নেই। কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ পারস্পরিক বুঝাপড়াতে উভয়ের মধ্যে একটা সমঝোতা এসে গিয়ে থাকে। কিন্তু নূতন শ্রমিক সঙ্ঘগুলির সাথে ঘন ঘন বৈঠকে বসা অনুচিত হবে। কারণ নূতন শ্রমিক-সঙ্ঘ পূর্বসঙ্ঘকে অপদস্থ করে শ্রমিকদের খুশি করতে অকারণে সমস্যা সৃষ্টি করে। পূর্ব শ্রমিক-সঙ্ঘ যে মনোভাব নিয়ে যেথান হতে কার্য শুরু করেছে সেইখান হতে সেই মনোভাব নিয়ে তারা এক্সপ্লয়টেসন শুরু করে। শ্রমিকদের অধিকতর খুশি করতে

তাদের সম্মুখে পূর্ব সজ্ঞ অপেক্ষা ভালো কার্যের একটা ফিরিস্তি রাখতে তাদেরকে ব্যগ্র হতে দেখা যায়।

. [যে ন্যায্য সুবিধা কাউকে একদিন দিতে বাধ্য হতে হবে তা তাকে সত্বর প্রদান করা উচিত। টালবাহনাতে বা দীর্ঘসূত্রতাতে সময় অপচয় কবলে অযথা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয। ফলে, তাদের অসন্তোষ ও তৎসহ দাবি উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। আজ যাহা হয কিছু পেলেই তাবা খুশি। কাল সংগ্রামে নামলে তারা ঢেব বেশি চাইবে। সংগ্রাম এড়ানোর জন্যই মানুষ স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকে। কারুর ভয় একবার ভাঙলে প্রশাসনিক ক্ষতি অসামান্য।]

বহু ব্যক্তিব বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন [ঠগ বাছতে গ্রাম উজাড] সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপনার্থে স্বল্প কযেক জনকে বেছে কঠোর শাস্তি প্রদান কবলে বাকি লোক সংযত হয। উহা এমন ভাবে করতে হবে যাতে কোনও সংস্থা না ভাবে যে তাদের পিছনে লাগা হচ্ছে। কয়েক জনকে বেছে বেছে কিংবা [বিশেষজ্ঞ বাদে] ব্যাপক ভাবে বহু ব্যক্তিকে অন্যত্র বদলি করে ওদের ঐ অপদল ভেঙে দেওয়া ভালো। বহু প্রশাসক এক দুর্বৃত্তের সাহায্যে অপব দুর্বৃত্তকে দমন করে পরে ঐ প্রথমটির সাহায্যে শেষেবটিকে [কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলা] দমন করেন। একই সাথে বহু ফ্রণ্টে লডাই করা কখনও কাম্য নয়। এ জন্যে একদলকে দমন কালে অপর দলকে আস্কারা দেওয়া হয়। বেনামা পত্রগুলি অবহেলা না করে উহাদের যাচাই করা উচিত।

(১০) পুলিশের ম্যাক্সিমাম অ্যাকশন ফায়ারিং [গুলিবর্ষণ] —কিন্তু আর্মির মিনিমাম অ্যাকশন ফায়ারিং। অনুরূপ ভাবে লক আউট

[তালা বন্ধ] ঘোষণা মিল মালিকদের চরম সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে মালিকরা কতদূর ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত তা ম্যানেজারদের পূর্বাহ্ণে জেনে সেই অনুযায়ী মিটমাট না করে তালাবন্ধ ঘোষণা করতে হবে। ঐ চরম ব্যবস্থা গ্রহণ কালে [সরকারী লেবর কমিশনের সম্মতি ক্রমে] পুলিশকে শান্তি রক্ষার্থে সেখানে মজুত রাখা ভালো। 'লক আউট' এবং 'ক্লোস আপ'-এ প্রভেদ আছে। তৈরি মাল বিক্রয়ে অপারক হলে কিংবা কাঁচা মালের অভাবে লোকসান হলে—উহা এড়াতে উহা [নোটিশ প্রদানান্তে] বন্ধ করা হলে উহাকে ক্লোস্ আপ বলা হয়। বে-আইনি স্ট্রাইকেতে লক-আউট ঘোষণা করা হয়। বহু প্রশাসক বিক্ষোভের পরের দিনে ফ্যাকটরিতে দুই দিন বন্ধের নোটিশ টাঙিয়ে রাখেন। এই দুই দিনের ব্যবধানে উত্তেজনা কমলে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক শান্তিরক্ষা বণ্ডে সই করিয়ে ভিতরে ঢুকান। বলা বাহুল্য, হঠাৎ আসা উত্তেজনা নূতন করে জন্মানো সময় সাপেক্ষ। স্ট্রাইক ঘটে গেলে উহা অবশ্য মিটমাটের চেষ্টা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় সরকারি লেবর কমিশনারকে জানানো চাই।

(১১) দক্ষ প্রশাসক অধস্তনদিকে তাদের উর্ধ্বতনদের হুকুম শুনতে নিশ্চয়ই বাধ্য করবেন, কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে উর্ধ্বতনদের অন্যায় আদেশ ও উৎপীড়ন হতেও রক্ষা করবেন। এ বিষয়ে উর্ধ্বতনদিগকে আড়ালে চেম্বারে ডেকে সতর্ক করা উচিত। অধস্তন কর্মীরা উর্ধ্বতনদের বিরুদ্ধে অভিযোগমুখর হলে ডিসিপ্লিনের নামে তাদেরকে দাবড়ানো হয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ অভিযোগ এড়িয়ে গেলে স্ট্রাইক আদি অঘটন ঘটে। মানুষের আত্মসম্মান বোধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা উচিত। আত্মসম্মানী ব্যক্তিদের

সামান্য বিরূপতা দেখালে তারা মরমে মরে যায়। এতে এদেরকে মন-মরা [অতি-দুঃখিত] বুঝলে তখুনি তাদেরকে ছুতায়-নাতায় ডেকে মিষ্টি ভাষা শুনাতে হবে। কারণ অশান্ত মনে ভালো কাজ তো হয়ই না, উপরন্তু ঐ কারণে তারা ফ্যাকটরিতে দৈবদুর্ঘটনাও ঘটাতে পারে।

(১২) উচ্চপদী কর্মী মাত্রেরই ব্যক্তিগত ভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করা চাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে ম্যানেজারের পরামর্শ গ্রহণের অপেক্ষাতে থাকা অফিসার জনোচিত কাজ নয়। তাদের প্রত্যেককে এক-এক জন বিকল্প ম্যানেজার রূপে নিজেদের তৈরি করতে হবে। তদারকি অফিসারগণ মধ্যে মধ্যে শ্রমিকদের সাহায্যকারী রূপে তাদের কাজে নিজেরাও সাথে সাথে হাত লাগালে ফল সর্বোত্তম। কোনও শ্রমিক বা ভৃত্যকে একটি টেবিল বহন করতে বলে ঐ টেবিলের এক কোণে আলতো ভাবেও হাত লাগালে তার সুফল সুদূর-প্রসারী হয়। সময় সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে না এসে শুধু হুকুম চালানো অনুচিত। অধুনা মাত্র সাহায্যকারী রূপে শ্রমিক বা ভৃত্য নিয়োগ করা চলে—এক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেককে শ্রমিক রূপে কাজ করতে হবে। নিজেরা হাতে-কলমে কাজ না শিখে বা তা না করে তদারকি কর্মী হলে শ্রমিকদের সুবিধা ও অসুবিধা বুঝতে এবং তাদের ফাঁকি বুঝতে ও ধরতে তাঁরা সক্ষম হবেন না। কারুর গরহাজিরাতে তদারকি কর্মীগণ [কুটির-শিল্পে মালিক বা ম্যানেজার স্বয়ং] তাদের স্থানে কাজ করলে শ্রদ্ধায় ও লজ্জাতে শ্রমিকরা পারত পক্ষে কর্মে অনুপস্থিত হয় না।

(১৩) কোনও একটি রিপোর্ট তথা প্রতিবেদন জরুরি না হলে তাতে দস্তখত না দিয়ে বা তাতে দস্তখত দিয়ে উহা দুই-চার দিন চেপে

রাখা ভালো। কারণ, পরে মনে হতে পারে যে ওটার কিছু বা পুরো অদল-বদল করা উচিত। প্রশাসক মাত্রেই ঐরূপ অনুভূতি প্রায়ই বোধ করেন।

প্রশাসকদের পেশাদারী তথা প্রফেশন্যাল ইনস্টিঙক্টের অধিকারী হতে হবে। ঐ বিশেষ ইনস্টিঙক্ট সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা হয়েছে। ম্যানেজারগণ ম্যানেজারীকে চাকুরি না মনে করে উহা তাঁদের প্রফেশন মনে করলে আত্মরক্ষার সহায়ক ঐ ইনস্টিঙক্টের অধিকারী হন। প্রশাসক স্তূপীকৃত ফাইল ও কাগজ-পত্র মামুলি বুঝে হেড্ ক্লার্কের নির্দেশ মত সই করে চলেছেন। এনডর্সমেণ্ট্ যা কিছু তা ফাইল পড়ে হেড্ ক্লার্কই লিখেন। ঐ এনডর্সমেণ্টের নীচে তিনি নির্বিবাদে উহা না পড়ে সই করছেন। হঠাৎ অন্তরের আবেদনে তিনি সই করা একটি মাত্র পত্র টেনে তুলে তা পড়ার সাথে তাঁর চক্ষুস্থির। অপরের বাক্যে বিশ্বাস করে ঐ পত্রে সই করাতে তাঁর চাকুরি লোপ এবং কারাবাস পর্যন্ত হতে পারতো। কিন্তু অতো পত্রের মধ্যে ঐ এক টি মাত্র পত্র হঠাৎ তাঁর দেখতে ইচ্ছে হলো কেন? উহার কোনও ব্যাখ্যা এঁরা নিজেই খুঁজে পান না। এর পর ঐ পত্রগুচ্ছের প্রতিটি পত্র খুঁটিয়ে পড়ে ও বুঝে তিনি দেখেন যে সেইগুলিতে কোনও ভুল এনডর্সমেণ্ট নেই। অবশ্য এইখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, উহা শতকরা কতো ভাগ সত্য হয়? প্রস্থানোদ্যত হেডক্লার্কের তাড়াহুড়া লক্ষ্য করে কিংবা তার মনোভাব সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে মুখে ফুটাতে প্রশাসকদের ঐ বিষয়ে সন্দেহ আসে কি? কিন্তু বহু ক্ষেত্রে ঐ ভুল হেড ক্লার্কদের ইচ্ছাকৃত না হয়ে মাত্র ভুলের কারণেও হয়। কারুর পক্ষে নিজে অতো কাজ করা সম্ভব নয় এবং উহা খুঁটিয়ে করতে হলে অন্য অন্য জরুরি কাজের ক্ষতি হয়।

এ'কারণে ফাইলে প্রেরণ-স্থানের, নাম দেখে ও বুঝে সাবধান হওয়া উচিত। ঐ ইনষ্টিঙক্টের উপর ভরসা না রেখে জরুরি কাগজ পৃথক রেখে তা খুঁটিয়ে পড়ে তবে তাতে সই করা উচিত হবে। সম্ভব হলে কোনও কাগজ না পড়ে সই করা উচিত নয়। উহাতে সই করার সাথে সকল দায়িত্ব প্রশাসকদের উপর বর্তিয়ে থাকে। রাজা কর্ণেন পশ্যতি—এই বাক্য অধুনা অচল।

প্রশাসন সম্পর্কিত ছল-চাতুরী ও [সর্বনাশা] রীতিনীতি সৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলে উহার সাহায্যে বহু বিপত্তি এড়ানো যায়। বাক্‌চাতুর্য [জাগলারি অফ ওআর্ড্‌স্] ও বাক্ প্রয়োগ তথা সাজেস্‌শন ও ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা প্রশাসকগণ কয়েক ক্ষেত্রে নিজেরাই অপরাধীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েন। এ সম্বন্ধে কোনও এক মহাদক্ষ উচ্চপদী প্রশাসকের বিকৃত ধারণা প্রসূত কয়েকটি অগ্রহণীয় মতবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। ঐগুলিকে কর্মজীবনে উন্নতি সাধনের দশটি প্রকল্প বা টেন কম্যাণ্ডমেণ্ট রূপে উনি বিশ্বাস করতেন। বলা বাহুল্য, বিষ স্বল্প মাত্রাতে উপকারী হলেও অতি মাত্রাতে উহা ক্ষতিকর হয়। প্রশাসকদের এই বিষ বা নীতি সাবধানে নাড়া-চাড়া করা উচিত। অন্যথায় তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের উপকারের বদলে অপকার হবে।

(১) কারুর উপকার না করে সুবিধা মাত্র তার অপকার করো। যে ডুবছে তাকে আরও ডুবাও। উপকার করতে ব্যস্ত মানুষ ম্যানিয়াগ্রস্ত উপকার-রোগী। তাদের কাছে উপকার করা এক বাতিক। কিন্তু উপকারের কোনও শেষ নেই। আজ কারুর একটি উপকার করলে কাল সে অপর এক উপকার চাইবে। পরে উপকার করা বন্ধ করা মাত্র সে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু সুযোগ মাত্র অপকার করলে ঐ ব্যক্তি তোমার গোলাম হয়ে থাকবে। উপকার করে তাকে দিয়ে যা করানো যায় নি, অপকারের ভয়ে সে তার দ্বিগুণ কাজ করে দেবে। প্রতিদানে সে মাত্র এই-টুকু চাইবে যে দয়া করে তুমি যেন তার অপকার না করো।

বহু ব্যক্তির ধারণা যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে যেমন উহা সুদে-আসলে ফিরত আসে, তেমনি কারুর উপকার করলে তার প্রত্যুপকারও একদিন পাওয়া যায়। আজ কাল শুধু হাতে টাকা কর্জ দিলে উহা চাওয়া মাত্র বন্ধু শত্রু হয়। উপরন্তু টাকা যার কাছে থাকে তারা তারই কথা কয়। প্রত্যুপকারের আশায় লোকে অন্যের উপকার করে থাকে। কিন্তু, উপকার—'যখন করেছো তখন করেছো। এখন উহা তাঁবাদি।' এই পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতার স্থান নেই। এই বিষয়ে মানুষ সদা বিস্মরণশীল। অতএব উপকার না করে উপ-কারের আশাতে বা ছলনাতে ভুলিয়ে ঐ স্বভাব-অকৃতজ্ঞ মানুষদের নিকট হতে দোঁড়ে-মুসে কাজ আদায় করো। কিংবা ব্যবসায়িক লেনদেনের ভিত্তিতে এক হাতে উপকার করে অপর হাতে প্রত্যু-পকার আদায় করো। কেউ বারে বারে উপকার নিতে এলে তার ঐ বিরক্তিকর আকিঞ্চন বন্ধ করতে [নিস্প্রয়োজনে] তার নিকট পাল্‌টা উপকার চাও। এই ভাবে সহজে তাদেরকে এড়ানো যায়। প্রত্যুপকারের আশাতে পুত্র-কন্যাকে চাকুরি দিলে উহা জামিনের কাজ করবে।

(২) কাউকে খোসামোদ করতে হলে কার্যোদ্ধারের অব্যবহিত পূর্বে কিংবা ঠিক প্রমোশনের সময়ে সময়ে খোসামোদ শুরু করা উচিত। বৎসরের পর বৎসর অনাবিল খোসামোদ কাউকে করা

যায় না। ঐ খোসামোদে স্বল্পকালীন ছেদ পড়লে পূর্বেকার সকল খোসামোদ ব্যর্থ হয়, তথা উহা পচে যায়। ফ্রেণ্ডশিপ টু বি রিনিউড কণ্টিনিউয়্যালি। অতএব অসময়ে সাধ্যাতীত এনার্জি নষ্ট করা নিরর্থক।

(৩) কেউ কৈফিয়ৎ চাইলে উহা চুড়ান্ত রূপে [চুটিয়ে] রাখা-ঢাকা না করে পেশ করতে হবে। অন্যায় হয়েছে বা 'মাফ করুন'— ইহা প্রশাসন ক্ষেত্রে বলার অর্থ পানিসমেণ্ট্। কারণ প্রশাসনে দয়া, মায়া বা ক্ষমার স্থান নেই। এখানে কর্তৃপক্ষকে বলতে হবে যে, 'আমার বিদ্যাবুদ্ধি মত ঠিক কাজই করেছি। [ওর চাইতে ভালো কাজ আমি জানি না।] এবার হতে ঐ ক্ষেত্রে কি করতে হবে তা আমাকে আপনারা বলে দিন।' ঐ বিষয়ে কোনও উর্ধ্বতন অফিসারকে জড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিলে আরও ভালো। অধস্তনদের অগোচরে তাদের উপর দোষারোপ করেও বহু কৈফিয়ৎ উপরে পাঠানো যায়। অধস্তনদের ছোট-খাটো সাজা দিয়ে কেহ কেহ নিজেদের দোষ স্খালন করেন।

প্রশাসকদের প্রতিবেদনে কর্তৃপক্ষ সকল সময়ে তাদের অধীন কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বন করেন নি। ঐগুলির কাগজপত্র সাবধানে আপন হেপাজতে রাখতে হবে। পরে অন্য কারণে কার্যে অবনতি ঘটলে কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলতে হবে যে কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতিবেদন মত কাজ করেন নি কিংবা ওদেরকে তাঁরা তদনুযায়ী সাজা দেন নি। অতএব এজন্যে এখন তাঁকে দায়ী করা তাদের অনুচিত হবে, ইত্যাদি। দুর্ঘটনা বা বিক্ষোভের সম্ভাবনা নেই বলে রিপোর্ট দেওয়া অপেক্ষা উহার সম্ভাবনার বিষয়ই বলা ভালো। কারণ, তাহলে হঠাৎ ঐগুলি ঘটে গেলে

কর্তৃপক্ষ বলতে পারবেন না যে ঐ সম্বন্ধে তিনি খবর রাখেন নি কেন ?

ক্ষমা করবে কিন্তু ভুলবে না। ফরগিভ্ বাট্ নট ফরগেট। বলং বলং বাহু বলং। একলা চলো রে নীতি সর্বোত্তম। অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ো না। কিন্তু দীনতম ব্যক্তিদেরও পরামর্শ শুনো। বহু ব্যক্তির মতামত শুনলে একজনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। ওদের পরস্পর বিরোধী মতামত হতে মনোমত একটি মত খুঁজে পাওয়া যায়। অপাত্র সুপাত্র ভেদ না রেখে একটি সমর্থনকারী দল গড়া ভালো। যাকে কলমে মারবে তাকে মুখে কিছু বলবে না। পূর্বাহ্নে তাকে মনোভাব জানালে সে কাউণ্টার ব্যবস্থা নিতে পারে। বিরোধীয় দলের অস্তিত্ব বুঝলে ধীরে ধীরে বদলি দ্বারা উহা ভেঙে দেবে। শত্রু ক্ষুদ্র বলে অসতর্ক হয়ো না। শত্রুর শেষ না রাখাই ভালো। শক্তিমান শত্রুকে সুযোগ না আসা পর্যন্ত সমীহ করবে। মনে রাখবে যে প্রশাসকদের নানা কারণে বন্ধু অপেক্ষা শত্রু বেশি জন্মে। কাউকে জব্দ করতে হলে তাকে প্রথমে বাড়তে দিতে হবে। কিংবা তার সাথে বন্ধুত্ব করে তার দুর্বলতা জানতে হবে। এতে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৪) যদি বুঝা যায় যে কারুর তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সম্ভাবনা আছে, তাহলে তার অভিযোগ পাঠানোর পূর্বে তুমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে দেবে। তার অভিযোগ পৌছুনোর পূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট তোমায় সত্য-মিথ্যা অভিযোগ পৌছুনো চাই। [অ্যাটাক্ ইজ দি বেস্ট ডিফেন্স।] ফলে, তখন তাকে আক্রমণের বিষয় ভুলে আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত হতে হয়।

(৫) অপরচিউনিটি তথা সুযোগ-সুবিধা কোনও সময়ে মিস্ করা উচিত নয়। কারণ, মানুষের জীবনে সুযোগ খুব বেশি আসে না। ঐ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার না করলে উন্নতির আশা নেই। কোনও দীর্ঘসূত্রতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য না করে এবং বিবেকের কথা না ভেবে ঐ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করা উচিত।

[নিজেদের রিপোর্টে উর্ধ্বতনদের সম্মতি সূচক একটি দস্তখত রাখা ভালো। ব্যস্ততার মধ্যে কাগজ পেশ করলে দস্তখত সহজে পাওয়া যায়। বহু প্রশাসকের কাছে ডুকলম লেখা আদায় করা শক্ত। কিন্তু টাইপড্ কাগজে দস্তখত দিতে তাঁরা সকল সময় দক্ষ।]

(৬) উর্ধ্বতনদের বিশ্বাস করে প্রাণঘাতী স্বীকারোক্তি করবে না। উর্ধ্বতনদের এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে বিশ্বাস নেই। তারা ছাড়া পেলেই সুযোগ মত ছোবল মারে। ক্ষমতাসীন উর্ধ্বতন ব্যক্তি, রাজকুল ও স্ত্রীষু বিশ্বাসং নৈব নৈব চ। এদের বুঝতে দিতে হবে যে আমরা তাদের অনুগত, বশংবদ এবং তাদের উপর আমাদের অঢেল বিশ্বাস। ভুলেও নিজেদের ভুলভ্রান্তি, কর্তব্যচ্যুতি বা অপরাধ স্বীকার করবে না। উর্ধ্বতনদের দুর্বলতা কোথায় ও তা কতটুকু তা জানতে হবে এবং তাদের শত্রুদের নামধাম টুকে রাখতে হবে। অধস্তন, উর্ধ্বতন এবং সহকর্মী পশ্চাৎ হতে ছুরিকাঘাত করলে মুহূর্তে প্রত্যাঘাত হানতে হবে।

কেউ অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাকে ব্যস্ত থাকার অজুহাতে পরে আসতে বলবে। এর পর বই পড়ে বা খোঁজ করে উত্তর দিলে নিজের সম্মান অক্ষুন্ন থাকে। নিজে কাজ না জানলে বা কোনও জটিল বিষয় না বুঝলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ঐ বিষয়ে পাকাপোক্ত এক অধীন কর্মীর নিকট পাঠিয়ে দিতে হবে।

(৭) কোনও নারীর সাথে একাকী দেখা সাক্ষাৎ করা বিপজ্জনক। অধীনদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা সর্বাগ্রে কাম্য। অচেনা পথে ও স্থানে যেতে হলে বহুবার ভাবো ও খোঁজ-খবর করো। কারুর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ো না। মানুষ ঠকে তখনই যখন সে কারুকে ভালোবেসে ফেলে। মিষ্টভাষী দক্ষমন্য ব্যক্তিদের মধ্যে অধিক ঠগী থাকে। মানুষ মাত্রকেই অসদুদ্দেশ্যে আগত বুঝে অনুধাবন করো। কারুর সততা ও আনুগত্যে তিলমাত্র সন্দেহ হলে তাকে তখুনি বিদায় দাও। জয়েন করার পর কিছুকাল নরম থেকে কাজ বুঝে, জেনে ও শিখে নিও। পরে সুবিধা মত নিজ মূর্তি ধরা যেতে পারে। দোষী নির্দোষ নির্বিশেষে বিবাদী উভয় পক্ষকে সাজা দিয়ে ঝামেলা এড়াও। [আমার মতে ইহা অনুচিত।]

(৮) মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারা মাত্র প্রতিহত করা যায়। মিথ্যা মামলা সত্য ডিফেন্স দ্বারা প্রতিহত হয় না। মিথ্যা সাক্ষীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য মাত্র তোমাকে রক্ষা করতে পারে। তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হলে মিথ্যা কাউণ্টার মামলা দায়ের করো। আদালতে উভয় পক্ষ আসামী না হলে ঐ মামলা মিটে না। সদা সত্যবাদী বন্ধুরা সত্য ব'লে বিপদ ঘটায়। কিন্তু মিথ্যা বলতে প্রস্তুত বন্ধুরা মিথ্যা ব'লে বন্ধুকে বাঁচায়। এই ক্লিকের জগতে পরস্পরের বিপদে মিথ্যা বলতে প্রস্তুত একটি দল রাখো। [অধুনা পেশাদারী মিথ্যা সাক্ষীর অভাব নেই।] সত্যবাদীকে ক্ষমা করে সত্য ভাষণে উৎসাহ দিও। নিজ স্বার্থ না থাকলে চুলচেরা বিচার করো।

(৯) সব কাজ নিজে না জানলেও অপরকে দিয়ে তা করিয়ে নিজের নামে তা চালানো যায়। অবশ্য ঐগুলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপযোগী করে কিছুটা এডিট্ করে নিতে হবে এবং ঐগুলি বুঝে তার

মধ্যে কিছু নিজের আইডিয়াও ঢুকাতে হবে। বাস্তবতা বিবর্জিত হলেও কর্তৃপক্ষের পছন্দ মত পক্ষে বা বিপক্ষে প্রতিবেদন তৈরি করবে। যারা উহা বুঝেও গ্রহণ করে দায়িত্ব ও পাপ তাদের। স্বয়ং কাজ না জেনে ও বুঝে শুধু হুমকি দিয়ে টেবিল চাপড়ে কাজ আদায় করা যায়। এখানে কি করে, কি ভাবে ও কম সময়ে কাজ করানোর চিন্তা অবাস্তর। শুধু অধীন কর্মীদিগকে চীৎকার করে টেবিল চাপড়ে বলতে হবে যে 'ঐ কাজ আমি এখুনি চাই-ই। তা তোমরা যে ভাবে পারো করো।' কাজের সময় তাদের মিষ্টি বাক্য বলাও ভালো। 'আরে! তোমার মত দক্ষ লোক এটা নিশ্চয়ই পারবে'—ইত্যাদি বচনে অভিভূত করলে তারা অন্যায়ভাবেও তা করে দেয়। অথচ ঐ অন্যায়ের জন্য প্রশাসকের কোনও দায়-দায়িত্ব থাকে না।

[টেবিল চাপড়ানি প্রশাসনের কুফল সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। প্রথম দিকে উহাতে ভালো কাজ হলেও শেষ পর্যন্ত উহা সর্বনাশ আনে। তদারকি ডেসট্রাকটিভ্ তথা ধ্বংসমূলক না হয়ে উহা ইনসট্রাকটিভ্ তথা গঠন ও উপদেশমূলক হওয়া উচিত। প্রতিটি ক্ষণে খিঁচুলে দোষ-ত্রুটি কেহ ভয়ে নজরে আনে না।]

কারুকে তাঁর প্রতিবেদন তথা রিপোর্ট পাল্টে লিখাতে হলে বিরক্তির স্বরে বলতে হবে—'উঁহু। আমার নিজের ও উঁচু মহলের ধারণা অন্যরূপ। ঐ রিপোর্ট তোমার ঠিক নয়। কেউ না কেউ তোমাকে মিস্‌লিড্ করেছে। যাও! এবার এটা ঠিক করে লিখে আনো।' এইটুকু শুনে ঐ ব্যক্তি প্রতিবেদন না পাল্টালে প্রশাসকের মনোভাব বুঝে কাজ করার মনোবৃত্তি সম্পন্ন এক কর্মীকে ডেকে তাকে বলতে হবে—'এর দ্বারা ঠিক কাজ হয় না। ও কিছু কাজ শেখে নি। এই তদন্তঠিক ভাবে তুমি করো। অফিসে বসে আমি ঠিক ঠিক খবর পাই।

কিন্তু উনি সরজমিন তদন্তে তা পান না।' ঐ বুদ্ধিমান শেষোক্ত অফিসার তখন কর্তৃপক্ষের মন বুঝে অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিবেদন পেশ করবে। কিন্তু প্রশাসকের পক্ষে তাঁর মনের প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের কাছে কখনও খেলো হওয়া উচিত হবে না। ওদের ধারণা থাকা চাই যে তুমি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল বুঝে এ ব্যাপারে ভিন্ন রিপোর্ট চাইলে।

[সুবিধা গ্রহণার্থে কারুর কাছে কারুর নাম করার কালে তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব বা শত্রুতা সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। দুই ভাই-এর মধ্যেও বহু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হৃদ্যতা থাকে না। ঊর্ধ্বতনদের পারস্পরিক কলহ কিরূপ বং কে কার উপরে কি কারণে বিরূপ তা জেনে একজনের বিরুদ্ধে অপর জনের সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে আত্মরক্ষার্থে বিপক্ষ পক্ষীয়ের সাহায্য গ্রহণে দোষ নেই।]

[স্ট্যাটিস্টিক্স তৈরিতে বাছাবাছি করে একটিকে এড়িয়ে অন্যটিকে বাড়িয়ে অনুকূল তথ্যটিকে রেখে প্রতিকূল তথ্যটিকে বাদ দিয়ে সাজাবার ও বসাবার কায়দাতে উহাকে খুশি মত কোনও কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে ব্যবহার করা যায়।]

(১০) নিজেদের কলমে যাঁরা মরেন তাঁদেরকে কেউ বাঁচাতে পারে না। অধীন কর্মীর প্রতিবেদনে দস্তখত থাকলে উহা তোমারই সম্মতি সূচক হুকুমনামা। তাই লিখিত আদেশে নিজেকে না জড়িয়ে মৌখিক আদেশ দাও। উহা সুবিধা মত স্বীকার বা অস্বীকার করা যায়। হাওয়া বুঝে মন্তব্য প্রকাশের জন্য উপর তলার মতামত লক্ষ্যণীয়। অধীন কর্মীদের প্রতিবেদনে বা ফাইলে--অ্যাস্ প্রপোজড্, এপ্রুভড্, সিন্, ডিসকাসড, ডু অ্যাস্ পার ডিসকাসন্, নো অবজেকশন, আই এগ্রি প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র বাক্য লিখে বড় বড় বিভাগ চালানো যায়।

এতে বিপদ হলে বলা যায় যে ডিসকাসনেতে উনি ভুল তথ্য বলেছেন। 'অমুক মে লাইক টু সি' লিখে আরও উর্ধ্বতনের দস্তখত তাতে নিয়ে তাঁকেও এতে জড়িয়ে রাখা যায়। অধুনা শিল্পপতিগণ এক্ষেত্রে 'কোহী বাত নেহি' বা 'নথী কর দেও'—মাত্র এই দুইটি বাক্যের সাহায্যে নিজেদের দায়িত্ব এড়ান। শত্রু-মন্য কর্মীকে বদলি না করে নিজের তাঁবে রাখা ভালো।

[বহু প্রশাসক পরস্পরকে সাহায্য করে একজন অন্যজনকে উপরে টেনে তুলার প্রতিশ্রুতিতে দল গড়েন। অর্থাৎ ১নং উপরে উঠলে তিনি ২ নংকে এবং ২ নং উপরে উঠলে তিনি ৩ নংকে উপরে টানবেন।]

কারুর সাথে কার্য উদ্ধারার্থে সাক্ষাতের প্রয়োজন হলে প্রথম সাক্ষাতের দিনে উহার উত্থাপন করা উচিত নয়। এতে ঐ ব্যক্তির মনে হবে যে মাত্র উপকার পাবার জন্যে এতদিন পরে উনি তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। এই ক্ষেত্রে কয়েকবার নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁর সাথে দেখা করে শুধু শুভেচ্ছা জানিয়ে আলাপ ঝালিয়ে নিতে হবে। এর বেশ কয়েকদিন পর কথাচ্ছলে প্রকৃত প্রয়োজনের বিষয় তাঁকে জানানো যেতে পারে। ফুলের মালা এবং আহারে ও উপহারে ভুলে না—এমন ব্যক্তি আজও বিরল। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে মিটিং-এ প্রিসাইড করিয়ে সেইস্থানে বা হোটেলে খাইয়ে খুশি করা যায়।

উপরোক্ত তথ্য উল্লেখে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, প্রশাসকগণ ঐ সকল অপকার্য হতে বিরত থাকবেন। আমার আশা এই যে উপরোক্ত কু-দৃষ্টান্ত তাঁরা গ্রহণ না করে উহা দের হতে তাঁরা সাবধান হবেন। ভুল পথে চিন্তাধারা প্রবাহিত হওয়াতে ঐরূপ ভ্রান্ত মতের সৃষ্টি হয়। কেউ সুযোগ-সন্ধানী না হলে ঐরূপ পাপাবর্তে তাঁরা পড়েন না। কূটনীতিতে মাত্রাজ্ঞান হারানো অনুচিত।

১৮

প্রশিক্ষণ

সাধারণতঃ কর্মীদিগকে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহে ভর্তি করে সেই স্থানের উপযোগী কর্ম তাদের শিখিয়ে নেওয়া হয়। এদের জন্য সুসংহত শিল্প-বিদ্যালয়ও এদেশে আছে। কিন্তু সেখানে এদের প্রবণতা পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই। আমার মতে এই প্রবণতা শুধু পরীক্ষা করে জানলে হবে না। প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং বিবিধ ব্যবস্থা ও অভ্যাস দ্বারা প্রবণতা এদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে এনে দিতে হবে। বহু পদপ্রার্থী অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মত অলস প্রকৃতির হয়ে থাকে। তারা বহুক্ষণ অনাবিল ভাবে কর্ম করতে অক্ষম। অভ্যাস দ্বারা এদের স্বাভাবিক অলসতা দূর করা সম্ভব। বহু ব্যক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় দৈহিক ও মানসিক কর্ম-তালের অভাব দেখা যায়। দ্রুতগতি মেসিনের উপযোগী দ্রুত কর্ম-তাল তথা রিথিম্ তাদের না থাকাতে তারা অধিক উৎপাদনে অক্ষম হয়। দ্রুত দৈহিক কর্মতালের অভাবে এরা সেখানে দৈব দুর্ঘটনাতে পতিত হয়। কিন্তু এই কম কর্মতাল সম্পন্ন এবং জাত-অলস কর্মীদের চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা কোথাও নেই। বিকলাঙ্গ, উন্মাদ, নির্বোধ ও অপরাধীদের চিকিৎসার মত এই অলস ব্যক্তিদের অলসতা বিদূরণের জন্য ফ্যাকটরি-কাম-হসপিট্যাল স্থাপন করা উচিত। এইরূপ এক প্রতিষ্ঠান একমাত্র আমিই এদেশে স্থাপন করে উৎসাহ ব্যঞ্জক সুফল লাভ করেছি। আমার স্ব-বাটীতে স্থাপিত এই ফ্যাকটরি-কাম্-[cum) হস্‌পিট্যালে পরীক্ষিত নিম্নোক্ত ফলাফল আশাপ্রদ।

(১) আমার নিজস্ব ছয়টি টেপলুম প্রথমে একটি লাইন শ্যাফটের সাহায্যে একটি দশ হর্স পাওয়ার মোটরের দ্বারা চালানো হতো। কিন্তু প্রত্যেকটি টেপলুম এতে একই ভাবে একই [দ্রুত] গতিতে চলে। প্রতিটি কর্মীর মানসিক ও দৈহিক কর্মতাল একই গতির হয় না। কারুর কর্মতাল দ্রুতগতি, কারুর বা উহা কম গতির হয়। উহাতে তাহারা ঐ সকল মেসিনে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। এতে অপেক্ষাকৃত কর্মালস ব্যক্তিরা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে কর্মত্যাগ করে পালাতে থাকে।

উপরোক্ত ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে উদ্ধার পাবার জন্যে আমি এই প্রতিষ্ঠানে লাইন শ্যাফট ব্যবস্থা উঠিয়ে দিই। আমি দশ হর্স পাওয়ার মোটর অপসারণ করে প্রত্যেকটি টেপ্লুম একটি করে এক হর্স পাওয়ারের মোটরের সাহায্যে পৃথক পৃথক ভাবে চালাবার ব্যবস্থা করি। পরে এক-একজন শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক দৈহিক কর্মতাল অনুযায়ী তাদের জন্য নির্দিষ্ট লুমের মোটরের গতি রেগুলেটর ও স্টার্টারের সাহায্যে কমাই। এতে ঐ সকল অলস প্রকৃতির কর্মীরা সহজে উহাতে কাজ-কর্ম করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাতে প্রথমে [মেসিনকে কম গতি সম্পন্ন করাতে] অধিক সংখ্যক দ্রব্যোৎপাদন ব্যাহত হতে থাকে। কিন্তু আমি কয়দিন অন্তর মোটরের গতি ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তাতে ওদেরকে অভ্যস্ত করে দিতে থাকি। এইরূপে তিনমাস অভ্যাস করার পর ওদের স্বল্পগতি কর্মতাল ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা দ্রুতগতি কর্মতালে পরিণত হয়। এর পর এরা এইভাবে লাইন শ্যাফট যুক্ত মেসিন সমূহে দ্রুতগতিতে কার্য করতে সক্ষম সকল শ্রমিকে পরিণত হয়।

[পৃথক মোটর রাখলে সুবিধা এই যে, একটি

বিকল হলে প্রতিটি যন্ত্র নিস্তব্ধ হয় না। ছোট গৃহশিল্পে ইহার উপকারিতা আছে। উপরন্তু পৃথক মোটর ক্ষণে ক্ষণে বিশ্রাম পাওয়ায় ভালো থাকে।]

(২) পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমি কয়েক জন কর্মালস যুবককে আমার এই ফ্যাকটরিতে ভর্তি করি। কাঠুরেরা সারাদিন কাঠ কাটতে পারে বা জলবাহী সারাদিন জল তুলতে পারে। কিন্তু এরা ওদের মত অনাবিল ভাবে অধিকক্ষণ পরিশ্রম করতে পারে না। অপরাধী ব্যক্তিদের মত এদের এনার্জি তুবড়ির ফোয়ারার মত ভীম বেগে এসে স্বল্পক্ষণ পরে নিঃশেষিত হয়ে যায়। এইজন্য এদেরকে আমি প্রথম সপ্তাহে মাত্র দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট কাজ করতে দিয়েছি। এমনি ভাবে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ মিনিট করে এদের শ্রমকাল বাড়িয়ে দিই। এই ভাবে এদের কর্ম-অলসতা দূর হওয়াতে পরে এরা আট ঘণ্টা কাল অনাবিল পরিশ্রম অনায়াসে করতে পেরে স্বাভাবিক মানুষ হয়।

বিঃ দ্রঃ—এই সকল শিক্ষার্থী তথা অলস রোগীদের দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল। এদের কারুর মধ্যে ভাইটামিন-এর এবং হরমনের অভাব ছিল। উপযুক্ত ব্যবহার, উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজনীয় বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা [সাজেস্‌শন] এদের মানসিক চিকিৎসা করা সম্ভব। এদের জন্য নানা প্রকার উৎসাহ ব্যঞ্জক বোনাসের [প্রোডাকশন ও হাজিরি বোনাস] ব্যবস্থা করা হয়। এদের কারুর কারুর জন্য উপযুক্ত প্রোটিন খাদ্যেরও আমি ব্যবস্থা করি। এখানে প্রযুক্ত বহুবিধ পদ্ধতির মধ্যে মাত্র দুইটি পদ্ধতি উপরে বিবৃত করা হলো।

উপরে ফ্যাকটরি-কাম্‌-হসপিট্যাল সম্পর্কিত শিক্ষা পদ্ধতির বিষয়

বলা হয়েছে। অবশ্য ঐরূপ চিকিৎসার সাথে তাদেরকে কারিগরি শিক্ষাও আমাকে দিতে হয়েছে। এক্ষণে সহজ মানুষদের শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে বিবৃত করবো। কেউ শুনে, কেউ দেখে, কেউ পড়ে, কেউ বা ঠকে শেখে। লেবরেটরিতে বহুকাল কর্মরত বেয়ারারাও বিজ্ঞান পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করে তাদের পাশ করিয়ে থাকে। শিক্ষা প্রদান কালে উপদেশ প্রদান, অনুযোগ এবং বকাবকি করার রীতি আছে। কোনও কোনও মিস্ত্রি এজন্য শিক্ষার্থীকে মারধরও করে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী তাদের সহিত ব্যবহার করতে হবে। এজন্যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের শিক্ষার্থে ঠাণ্ডা মেজাজের সহনশীল প্রবীণ মিস্ত্রিদের নিয়োগ করা ভালো। অসদ ব্যবহারে অনভ্যস্ত শিক্ষার্থীদের ভীত ও অপমানিত করলে তাদের মন দ্বিধা বিভক্ত হয়। মনের রোষ প্রদমিত করে এরা অসুস্থমনা হয়ে উঠে এবং এজন্যে তারা একাগ্রচিত্ত হতে পারে না। প্রায় দেখা যায় যে বারে বারে অসাফল্যের পর সফল হওয়া শিক্ষার্থীরা শ্রেষ্ঠ শাসক বা শিল্পী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

[বাল্যে এক সভাতে 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দবাবুকে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে বলতে শুনেছিলাম—'আমিও প্রথম জীবনে কবিতা লিখতাম এবং ঐ কাব্য-প্রতিভা চার বৎসরের মধ্যে খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ কবিতার খাতা-খানি এক্ষণে হারিয়ে গিয়েছে।' ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজ হলের ঐ মিটিঙে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে তাঁকে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন —'রামানন্দবাবুর কবি-প্রতিষ্ঠা অর্জনে মাত্র চার বৎসর লাগাতে তাঁর খাতাখানি পর্যন্ত হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাকে ঐ সুনাম অর্জনে

জীবনের চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা করতে হলো ব'লে আজ আমি সফল।' উপরোক্ত কারণে কারুর কোনও বিষয় শিখতে বা তাতে অভ্যস্ত হতে দেরি হলে অধীর হবার কারণ নেই। ধীরে ধীরে শিক্ষাতে বহু ভুল-ভ্রান্তি ও খুঁটিনাটি বিষয় শিক্ষার্থীর নজরে আসে। ঐগুলি তাড়াতাড়ি শিখলে তাদের নজর এড়াতো। শিক্ষণ কালে ঐ বিষয়ে তার মনকে প্রথমে তৈরি করে নিতে হবে।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আরও তথ্য পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত করা হবে। এক্ষণে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, উদ্যোগ-শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য উৎপাদন নয়। নাগরিকদের কর্ম-সংস্থান করাও উহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এইজন্য লাভ কম হলেও কোনও প্রতিষ্ঠানকে উঠিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। সরকারী কোনও উদ্যোগে লোকসান হলেও তার এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ভালো ভাবে সমাধা হয়ে থাকে।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ২৩, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্তৃক মুদ্রিত